শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত

প্রথম খণ্ড

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী-কথিত

শ্রীরমণ প্রকাশনী

—: প্রাপ্তিস্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশান

গ্লোব লাইব্রেরী
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরমণ প্রকাশনী
শ্রীমতী অসীমা বসু
ডি বি ৮১ সল্টলেক
সেক্টর-১
কলিকাতা-৬৪

মুদ্রক :
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সংসারের তাপদগ্ধ মনুষদের
করকমলে অর্পণ করলাম

—গগন.

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত

"তুমিই সেই। আমি তো তুমিই। একমাত্র তিনি আছেন বলেই তো আমি, তুমি। একমাত্র আমিই সব বা একমাত্র তুমিই সব।'

আনন্দময়ী মা পরমতত্ত্ব সরল ভাষায় বলছেন সুষমান্বিত করে। জ্ঞানের এমন নির্মল ও স্থির দৃষ্টি একমাত্র উপনিষদ-রচয়িতা ঋষিদের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। মহর্ষি। মহাকবি। আনন্দময়ী মা-ও দেখেছেন জেনেছেন প্রকাশ করেছেন। সেই অর্থে আনন্দময়ী মা-ও সত্যদ্রষ্টা। মহাকবি।

উপনিষদে আছে :

'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।

তিনিই তোমার আত্মস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি। সেই আমিই আমাদের এই আমির সারসত্তাস্বরূপ। আমরা সেই আমির ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই জানতে পারি না। সুতরাং সবকিছুই আমাদের জানতে হবে ব্রহ্মের ভিতর দিয়ে। এই ব্রহ্মানুভূতি ব্রহ্মবিদ্যাই হলো উপনিষদের বিষয়বস্তু। আর এই তত্ত্বমসি বাক্য উপনিষদের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য। মহাবাক্য।

শ্রীশ্রীমা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের সেই তত্ত্বমসি বাক্যের আজ আবার পুনরুক্তি করলেন। সুন্দর করে। সুষমান্বিত বিন্যাসে। যিনি সত্য তাঁকে সহজ করে সরল করে সকলেরই আপন করে দেখাচ্ছেন। মা যে সর্বদর্শী। সর্বানন্দী। সর্বানুভূ।

মা আনন্দময়ী নিয়ে এসেছেন আনন্দের বার্তা। আমাদের, অমরত্বের অমৃততত্ত্বের দেব মানবের বিজয় বীরত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। জীবনে ভগবানকে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের খাঁটি মনুষ্যত্ব। পাশব জীবন ও সাধনা নিয়ে তার যাত্রারম্ভ, কিন্তু দিব্য ভাগবত জীবন লাভই তার শেষ গন্তব্যস্থান।

'জগৎ ভাবময়। আনন্দময়। সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্তি। আনন্দের

মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগ্রত করে তুলতে পারো, দেখবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র একই খেলা চলছে। আনন্দের খেলা। ঈশ্বর যে আনন্দময়। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়। তাইতো বুঝতে পারে না প্রকৃত তত্ত্ব।'

এ তো সেই উপনিষদের কথা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সেই একই তত্ত্ববস্তু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে হয়েছে অভিহিত। কোথাও ব্রহ্ম। কোথাও আত্মা। কোথাও ভগবান। কোথাও-বা পুরুষ আনন্দ বা রস। অভিধাগুলি নিজ নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা অভিধেয় বস্তুর স্বরূপই প্রকাশ করছে। ব্রহ্মে কারণত্ব। আত্মায় জগৎ কর্তৃত্ব। ভগবানে ঐশ্বর্য-বত্তা এবং পুরুষ, আনন্দ বা রসে রসবত্তাই মুখ্যভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

ব্যাসদেবের সংশয় দূর করবার জন্য শ্রুতিগণ যা বলেছিলেন, 'রসো বৈ সঃ।' ব্রহ্ম অখণ্ডরস স্বরূপ। তিনি সর্বব্যাপী পরমানন্দ। সর্বত্র তাঁর প্রসারিত প্রসন্নতা! রস বা আনন্দই তত্ত্বের পরম ও চরম স্বরূপ। আনন্দই যাঁর ভাব আনন্দই যাঁর উপাদান, আনন্দেই যিনি অবস্থিত, যিনি জগতের আনন্দলীলা করবার জন্য আনন্দঘন মূর্তি ধারণ করেছেন, তিনিই তো আনন্দময়ী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। তাঁরই নাম আনন্দ। আনন্দরূপেই তাঁকে আমরা খুঁজবো। উপাসনা করবো। আনন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। আনন্দই সৃষ্টির রহস্য। আনন্দই জন্মের মূল। আনন্দ আছে বলেই তো সবকিছু বর্তমান। আনন্দই জন্মের অন্ত। সৃষ্টির বিলয়।

এই জগৎ যখন সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি, কল্পনা করা হচ্ছে আনন্দ নিকেতনরূপে তখন শোক ব্যথা দুঃখ কিরূপে এলো?

সরল ভাষায় সহজ করে আনন্দময়ী মা বলছেন :

'তোমরা তো অভাবের স্বভাবে আছ। তোমরা যা কিছু নিয়ে আছ সবই অস্থায়ী। তাই দুঃখ পাও। যা থাকে না তাই নিয়ে থাকাই হচ্ছে অভাবের স্বভাব। দুঃখ পাবে না কেন? সুযোগ পেলেই তো তোমরা মালিক হয়ে বস। মালিক না হয়ে মালী হও। তবেই আর ইহসংসারে দুঃখ পাবে না।'

এবারে মা একটি গল্প ফাঁদলেন :

কুটির বেঁধে সাধন-ভজন করেন এক সাধু। তাঁর আহার ছিল অতি সামান্য। এক ছটাক চালের ভাত। তাও একবেলা। দিন যায় রাত আসে। আবার রাত্রি অবসানে দিনের হয় আগমন। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরও

র আসে। এইভাবে ভগবানের নাম নিয়ে সাধুটি বেশ আছেন। তাঁর
চার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হলো এক পথিক। ক্রমে-ক্রমে ভক্ত হয়ে পড়লো
াকটি। তারপর হঠাৎ একদিন এসে আশ্রয় নিলো সাধুটির চরণে। তিনি
ীন ভক্তকে আশ্রয় দিলেন সত্য কিন্তু মনে-মনে চিন্তান্বিত হলেন ওর আহারের
ষয়ে। ভাবলেন ভক্তটি নিশ্চয়ই ওঁর সামান্য আহারের উপর ভাগ বসাবে।
দিকে ভক্তটি কিন্তু নিজ আহার সম্বন্ধে সাধুটিকে কিছুই বললো না। সাধুটি
ন চাল ধুয়ে জল ফেলতে লাগলেন সে অঞ্জলিভরে পান করলো সেই জল।
সামান্য আহারেই তৃপ্ত হয়ে ভক্তটি সাধুসেবায় রত হয়ে রইলো। সাধুটি
ও বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলেন না। কিছুদিন পর আবার
কজন ভক্ত এসে সাধুটির চরণে আশ্রয় নিলো। এবার সাধুজী বিচলিত হলেন।
ন-মনে ভাবলেন একজন তো জল খেয়ে আছে, কিন্তু এটি নিশ্চয়ই শুধু জল
ন করে থাকবে না। নিশ্চয়ই চালে ভাগ বসাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! দ্বিতীয়
ক্তটিও তাঁর আহারে ভাগ বসালো না। ভাতের ফ্যান দিয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তি
লো। আব নীরবে সেবা করতে লাগলো সাধুটিকে।

এবারে চৈতন্য হলো সাধুটির। ভুল ভাঙ্গলো। মনের সংশয় দূর হলো।
ুভব করলেন, ভগবানই সবকিছু করেন। যখন যাকে যে কাজে পাঠান তাকে
ুপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি তিনিই দিয়ে দেন। মানুষ নিজেকে মালিক মনে করে
শান্তিতে ভোগে। দুঃখ পায়।

অবশেষে সাধুটি আশ্রিত দুজনকে নিয়ে লোকালয় ছেড়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে
াবানের আরাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। মনের সংশয় অশান্তি দূরীভূত হলো।

আনন্দময়ী মা বললেন :

'যাঁকে জানলে সবকিছুই জানা যায় তাঁকেই পাওয়ার চেষ্টা করা আর কি।'
'জানা আর পাওয়া দুই তো এক নয়। আমরা অধ্যবসায়ের বলে
জানতে পারি। কিন্তু বস্তু প্রাপ্তি করায় রুচি বা ভাব। ভক্ত ভাবের
খে ভগবানকে দর্শন করেন। পরমপুরুষকে ভজন করবার জন্যই মানব জীবন,
থা আমরা জানলেও রুচি আমাদের ভজায় সংসার। সুতরাং যে রুচি ও
ব তত্ত্বের পরম ও চরম স্বরূপকে লাভ করায়, সেই ভাবই আমাদের
নীয়।'

তাইতো আনন্দময়ী মা বলছেন :

'এই বিশুদ্ধ ভাব জাগাতে হলে একটা পথ অবলম্বন করে থাকতে হ সে ভাবটা দ্বৈতভাবেরই হোক কি অদ্বৈতভাবেরই হোক তাতে কিছু যায় আ না। 'আমিই সব'—'আমিই সব' বা 'তুমিই সব'—'তুমিই সব' এইরকম এক ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এইভাবে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে তং আর দুটি নেই। 'আমি' আছে অথবা 'তুমি' আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তং সব লয় পায়। এই হলো ব্রহ্মের অনুভূতি। আর একেই বলা হয় 'ভগব লাভ করা।'

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ঋষিগণ সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য জানবার জ একদিন যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজ আনন্দময়ী মা-ও সেই সনাতন মহ সত্যকে বর্তমান কালের ভাষায় ব্যক্ত করছেন। দেবতাদের চিন্তা ঈশ্বে চিন্তা দুর্বল মানবের ভাষায় প্রকাশ করছেন, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে আনন্দময়ী মা'র আত্মোপলব্ধি নিঃসৃত বাণীও যে সেই উপনিষদের ঋষিদে বাণী, যা বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষেরই উপজীব্য। তাইতো মা আনন্দময়ী হলে 'বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা'।

গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুদিন। সামান্য লেখাপড়াও শিখেছিলেন শুধু নাম দস্তখত করতে পারতেন। তা'ও বা ক'দিন। বেদ উপনিষদ পুর প্রভৃতি ধর্মপুস্তক কিছুই পড়েন নি। তাছাড়া ধর্মপুস্তক একটু শুনলেই কেমন হ যেতেন। নিজে কোনো বই পড়া নিজ হাতে কিছু লেখা বালিকা বয়স থে তাঁর অভ্যাস ছিল না। তবুও তাঁকে উচ্চ জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত দেখা যায়।

মায়ের কর্ম তো নেই, শুধুই লীলা এবং সেই লীলার ক্ষেত্রও বহু বিচিত্র এ অপরিমেয়। তাঁর লীলাসহচর কেবল মানুষ নয়। কত দেবদেবী, ক অশরীরী আত্মা, আবার কত মনুষ্যেতর প্রাণী। সঙ্কল্প মনের ধর্ম। মনেরও যে ঊর্ধে। ইচ্ছা করে মা কিছু বলেনও না, করেনও না। মা বলেন, হয়ে যায়। আবার কখনও বলেন, এই শরীর আগেও যা, এখনও তা, পরে তা। তোমরা যখন যে যা ভাবো, যে যা বলো, এ শরীর তাই।'

নির্লোভ অনাসক্ত ভগবৎপরায়ণ জীবনচর্চার ফলশ্রুতিরূপে বিপিনবিহারী ও ক্ষদাসুন্দরী পেয়েছিলেন মহাশক্তিরূপিণী কন্যা নির্মলাসুন্দরীকে। বিপিন-হারী পিতৃভূমি বিদ্যাকূট পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন এসে ত্রিপুরা জেলার ওড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। প্রথম সন্তান জন্মের পর সেই যে তিনি ঘর ছাড়া া ছাড়া হয়েছিলেন আর ফিরলেন ঠিক কন্যাটির মৃত্যুর পর। ভিন্ন এক শ। পরিধানে গেরুয়া বসন। মুখে হরিনাম। মেতে আছেন হরিসংকীর্তনে। াগ্যভাব। খেওড়া গ্রাম মুগ্ধ হলো বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের নাম গানে।

আর মোক্ষদাসুন্দরী! অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী। বিবাহের পর য়ক বছরের মধ্যে তাঁর একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। ম কন্যা সর্বমঙ্গলা এসেছিল অপরূপ রূপলাবণ্য নিয়ে। জন্মের কয়েকমাস ই চলে গেল সে জননীর কোল শূন্য করে। আবার স্বামীও হলেন নিরুদ্দেশ। তু তিনি বিচলিত হলেন না। ভগবৎ বিশ্বাস তাঁকে সহনশীলতা ও অসীম ধৈর্য য়েছিল। গৃহদেবতা নারায়ণ-শীলাকে অবলম্বন করেই দিন অতিবাহিত করতে ালেন। এমন ঠাকুর-সেবা যে স্বয়ং ঠাকুর এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও লন। একবার স্বয়ং নারায়ণ এসে বলেছিলেন, 'হরির লুট দিবি না! হরির দে।' স্বভাবজাত এই সহজ আস্তিক্যবোধ মোক্ষদাসুন্দরীর দৃষ্টি খুলে য়েছিল। সুখে-দুঃখে তিনি সমভাবেই দেখলেন শ্রীভগবানের কল্যাণহস্ত।

আর তাঁর শাশুড়ী ঠাকুরাণী! তিনিও বৈষয়িক নন। ভাবজগতেরই ষ। পূজা দিতে গেছেন কসবা কালীবাড়িতে। কসবার কালী খুবই গ্রত। অনেক দিনের মানত ছিল।

পরের দিন ভোরবেলা এসে পৌঁছুলেন কসবা থেকে। গ্রামের লোকের থে গিয়েছিলেন। নৌকা করে। ঘরে পৌঁছেই ডাকতে লাগলেন ছেলেকে, ওরে ও বিপিন! বিপিন শোন!

—কি মা!

—ওরে আমি কি বলতে কি বলে এলাম মা কালীকে।

মৃদু হেসে বিপিনবিহারী বললেন, কি বলেছ মা?

—মা কালীকে কোথায় বলবো বিপিনের যেন একটি ছেলে হয়, তা নয়, া এলাম—এবারে যেন বিপিনের একটি মেয়ে হয়। মা কালীর দিকে িয়ে আমি সব ভুলে গেলাম। কি আমার মন! ও আমার কপাল!

প্রত্যুত্তরে বিপিনবিহারী বললেন, মা, ভগবানের রহস্য সামান্য মানুষ কি র বুঝবে বলো? তুমি ভুল করোনি। ঠিকই প্রার্থনা জানিয়েছ। এতো দূর

থেকে এলে, বসো। বিশ্রাম করো।

বৃদ্ধা এবারে ভাবানন্দে অশ্রু বিসর্জন করে বলতে লাগলেন, যা বলো বলো এ বউ আমাদের সতীলক্ষ্মী। গরীবের ঘর তাই। নইলে এমন ব ক'জনে পায়? তাহলে দশভুজা ভগবতীই আমাদের ঘরে আসছেন। গরীবে ঘর, এখন কি খেতে দেবে তাই ভাবো। শুধু কীর্তন করলেই হবে না। ভা ভাল খেতেও তো দিতে হবে মাকে।

তারপর দু'হাত জোড় করে ভগবতীর উদ্দেশে প্রণাম করে বৃদ্ধা বললে মা ভগবতী জগদম্বা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বিপিনবিহারী হাসিমুখে বললেন, কেন শুধু শুধু উপচারের কথাই ভাব মা? দেখো আমি ভক্তি দিয়েই মাকে কেমন খুশি রাখি।

এই হলেন পিতামহী, পিতৃদেব ও মাতৃদেবী। সকলেই দিব্যভাবের ভাবুক

*

এমন ভগবৎভাবের গৃহ না হলে কি আর এমন মেয়ে জন্মায়! বিশা অট্টালিকা নয়। ছোট গৃহ। ছোট সংসার। অভাব আছে। অভাব বোধ নেই শান্তির সংসার। সংসার নয়, যেন ঋষির আশ্রম। বাসের যোগ্য দু'খানি চা ঘর। ছোট উঠান। তুলসীমঞ্চ। ঘরে আছেন জাগ্রত বিগ্রহ। শালগ্রাম শীলা

আপনভোলা অনাসক্ত বিপিনবিহারী গুন-গুন করে গাইছেন,—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

রাত্রি শেষ প্রহর। ভোর হতে তখনও তিন দণ্ড বাকী। হঠাৎ মোক্ষদ সুন্দরীর ব্যথা উঠল। সবকিছু প্রস্তুত ছিল। উঠোনে আঁতুড়ঘর তৈ করা হয়েছিল। প্রতিবেশিনীরা তাঁকে ধরে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। ধা এলো। পূর্বেই বলা ছিল। বিপিনবিহারীর কীর্তন বন্ধ হলো না। অবিরা চলতে লাগলো।

হঠাৎ ধাই বলে উঠল, ওগো তোমরা সব দেখে যাও। এমন মেয়ে আ জীবনে দেখিনি। জন্মেই হাসছে। এ সামান্য মেয়ে নয় গো! এ সাক্ষ ভগবতী!

একে একে এলেন প্রতিবেশিনীরা। স্বামী। শাশুড়ী ঠাকুরাণী। সকলে আনন্দিত হলেন। মুগ্ধ হলেন পবিত্র শিশুর হাসিমাখা মুখপদ্ম দর্শন করে।

আবির্ভূতা হলেন বিশ্বের জননী আনন্দময়ী মা খেওড়া গ্রামের এক দরি ব্রাহ্মণের কুটিরে। পৃথিবীর মাটিতে। মানবলোকে।

বাংলা ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি।

জননী মোক্ষদাসুন্দরী আদর করে নাম রাখলেন নির্মলাসুন্দরী। অপরূপা এই মেয়েটিকে পল্লীবাসীরাও ভালবেসে নাম রাখলেন, বিমলা, কমলা, গঙ্গাগঙ্গা, দাক্ষায়ণী, তীর্থবাসিনী।

ভোরের বেলা মোক্ষদাসুন্দরী মেয়েকে তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেওয়ান। তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে লাজমধুর কণ্ঠে আদর করতে থাকেন, 'ওরে আমার সোনা মানিক মেয়ে রে—' মাতৃস্নেহসুধা পান করে শিশু আশ্বস্ত হয়। তার মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে বাণীহীন তৃপ্তির এক স্পষ্ট ছবি।

এইভাবে ছোট্ট শিশুর জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনারাজি জননীর জীবন-সঙ্গীতে সৃষ্টি করে চলে নূতন নূতন রাগের। নবজাতক নির্মল হাসির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র গৃহকে করে তোলে পরিপূর্ণ। নিঃসঙ্গ মাতার প্রতিটি মুহূর্তকে করে তোলে কর্মময়। মধুময় করে তোলে তার জীবনপলকে।

দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের যোগাযোগ শৈশবকাল থেকেই। বৃদ্ধা আত্মীয়ার সাথে চান্‌লাতে পাগলা শিব দেখতে এসেছে নির্মলা। বৃদ্ধা হলেন বিপিনবিহারীর দিদিমা। সাথে গ্রামের লোকও কয়েকজন আছেন। চান্‌লার শিব খুবই জাগ্রত। দূর দূরান্ত থেকে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন এখানে প্রচুর লোক। সর্বদাই লোক সমাগম হয়। সেদিনও ছিল খুব ভীড়। ছোট্ট মেয়ে নির্মলাকে মন্দিরের বাইরে বসিয়ে রেখে সকলে গেছেন মন্দিরের অভ্যন্তরে। শিব দেখতে। কিন্তু কোথায় শিব! শিব তো মন্দিরে নেই। আশ্চর্যান্বিত হলেন মন্দিরের পুরোহিত। মহান্ত। ব্যাকুল হয়ে উঠলো দর্শকের মন। কোথায় গেলেন শিব! কোথায় শিব! সমস্বরে সকলেই চীৎকার করে ছোটাছুটি করতে লাগলো। পরমুহূর্তেই এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পেলো সকলে।

—ওগো, তোমরা সব দেখে যাও। এ কাদের বাড়ির মেয়ে গো! এ দেবী না মানবী! বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো এক গ্রামের বধূ। সত্যিই সকলে দেখলেন শিব ঠাকুর অধিষ্ঠান হয়েছেন ছোট্ট মেয়ে নির্মলার পাশে। সকলেই

প্রাণভরে দেখলেন শিবঠাকুরকে আর ঐ সরলা কমলা হাস্যময়ী খেওড়া গ্রামের ছোট্ট মেয়ে নির্মলাকে। মেয়েটি মৃদু-মৃদু হাসছে পাগলা শিবের পাগলামী দেখে। মন্দিরের প্রস্তরীভূত শিব নয়, এ যেন জটাজুটশোভিত ধবল রজতগিরি সদৃশ প্রশান্ত মনোহর মূর্তি ধারণ করে স্বয়ং উমাপতি উমার সন্নিকটে বিরাজিত হয়েছেন।

বৃদ্ধা ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন নাতনীকে। দাঁতহীন মুখ দেখে তার কোমল গাল স্পর্শ করে আদর করতে লাগলেন। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। পুরোহিত আর মহান্ত বিহ্বল কণ্ঠে শিব স্তোত্র শুরু করে দিলেন। দেবালয়ের মিলিত মানুষেরা অভিভূত হলেন এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে। বলাবলি করতে লাগলেন গ্রামের মানুষেরা, আমরা ভাগ্যবান তাই হরগৌরীর মিলন দর্শন করলাম। এ মেয়ে সামান্যা নয়। এ নিশ্চয় ভগবতীর অংশ।

এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলো কন্যার পিতামাতা।

প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে কীর্তনে এসেছে ছোট্ট মেয়ে নির্মলা। কীর্তন শুরু হতেই ঘুমে ঢুলু ঢুলু। যেন ভাব হয়েছে। মহাশিশুর মহাভাব। মোক্ষদাসুন্দরী বললেন, ওরে ও নির্মলা! ঘুমাস কেন? কীর্তন শোন।

চোখের পাতা দুটি খুলে মৃদু মৃদু হাসে নির্মলা। কিন্তু আবার ঐ ভাব। তবুও শেষ পর্যন্ত থাকা চাই। কীর্তন শেষ না হলে উঠবে না সে। কীর্তন শোনা নয় এ যেন দেবতার পায়ের নুপুরধ্বনি শোনা।

অনেকদিন পর স্কুলে এসেছে নির্মলা। সেদিন আবার স্কুল ইন্সপেক্টর এসেছেন স্কুল পরিদর্শন করতে। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়লো ফুটফুটে অপরূপা ছোট্ট মেয়ে নির্মলার প্রতি। একটি পদ্য মুখস্থ বলতে বললেন। নিভু́ল কবিতা বল্লো নির্মলা। শিশুর সুমিষ্ট কণ্ঠের ত্রুটিহীন কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন ইন্সপেক্টর। গর্বিত হলেন গুরুমহাশয়। আশ্চর্য হলেন পিতামাতা। এমন সোজা-বোকা বুদ্ধিহীন মেয়েটার বুদ্ধি জোগায় কে? মায়ের সব-ই 'আপ্‌সে আপ্‌' হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে মা বলছেন তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'একটা তামাসা এই যে, এই শরীর পড়িতও না, কিন্তু মাস্টারের কাছে পড়া দিবার সময় সব ঠিক-ঠিক হইয়া যাইত। অপরের কাছে আবার তেমন পারিতাম না। আর একবার একটা কাণ্ড হইল। একবার বই খুলিয়া একটু দেখিয়াই একটি পদ্য মুখস্থ হইয়া গেল। কি করিয়া কি হইত কিছুই বলিতে

পারি না। ইন্সপেক্টর আসিয়াছে স্কুল দেখিতে। বই খুলিয়া দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই পদ্যটাই এই শরীরকে বলিতে বলিল। এই শরীর ফট ফট করিয়া তাহা বলিয়া ফেলিল।

স্কুলে খুব কম গিয়াছি, কারণ স্কুল দূরে ছিল। তাহার উপর ছোট ভাইদের কিছুদিন ধরিয়া অসুখও চলিয়াছে। এইসব নানা কারণেই এ-শরীরের স্কুলে যাওয়া প্রায়ই হয় নাই।

একবার এই শরীরকে অ আ পড়াইয়া দিল, আর কি জানি, কেমন করিয়া তাহাতেই লিখিয়া ফেলিলাম। সেইদিনই ক খ পড়া দিয়া দিল। পরদিন তাহাও শিখিয়া ফেলিলাম। এইভাবেই সব কেমন করিয়া হইয়া যাইত।

তোমাদের কাছে কি বলিব! যেমন আসনমুদ্রাগুলি আপনা-আপনি হইয়া গিয়াছে তেমনি পড়াগুলি কি নামতাগুলি সবই এইভাবে আপনা-আপনি হইয়া গিয়াছে। যিনি শিক্ষক তিনি স্কুলের নামের জন্য আমাদের কয়েকজন মেয়েকে ক খ ক্লাশ হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই নিম্ন প্রাইমারী ক্লাশে তুলিয়া দিলেন। এই শরীর তো স্কুলে প্রায়ই যাইত না। অনেকদিন পর স্কুলে গিয়া দেখি মেয়েরা অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষকটি আমাকে সকলের সমান রাখিবার জন্য, তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা যেখানে পড়িতেছে, আমাকেও সেই পড়া দিয়া দিলেন। ভগার ইচ্ছা দ্যাখো, পড়াগুলি ঠিক-ঠিক যেন কিভাবে হইয়া যাইত।

ছোট্ট শিশু জিজ্ঞেস করে পিতাকে। পিতা বিপিনবিহারী সর্বদাই যে নামগানে বিভোর। তাইতো শিশুর মনে জাগে এ প্রশ্ন।

—আচ্ছা বাবা, হরিনাম করলে কি হয়?

হেসে হেসে বিপিনবিহারী বলেন, নাম করলে যে হরিকে দেখা যায় মা।

—হরি খুব বড় নাকি বাবা?

—হ্যাঁগো, খু-উ-ব বড়ো।

এবার ছোট্ট মেয়ে সামনের মাঠটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এই মাঠের মতো বড়ো?

প্রত্যুত্তরে হাসতে-হাসতে বিপিনবিহারী বললেন, এর চেয়ে অ-নে-ক বড়ো। তুই তাঁকে ডাক না, তবেই দেখতে পাবি তিনি কত বড়ো।

পাঁচ বছরের শিশুও পিতার কথাকে সত্য মনে করে চিন্তা করতে থাকে হরিকে। সহসা নীরব হয়ে যায় শিশু। হরিনামের তরঙ্গ তখন তার দেহ মন আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই অপরূপ হরিনামের ধ্বনি-সঙ্গীত

মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মতো তার অন্তরকে যে স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত করে দেয়। ফুলের মতো হেসে ওঠে অন্তর। মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে সে আবার প্রবেশ করে তার স্বপ্নলোকে। পিতৃদেব সেদিন নির্মল শিশুর অন্তরে যে হরিনামের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তাই একদিন মহা মহীরূহে পরিণত হয়েছিল।

জীবন দুলে চলে, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো, অতি গুরুভার ছন্দে। তার মন্দ মন্থর গতিতে শিশু যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। দিনে দিনে শিশু বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বদাই উদাস অনাসক্ত ভাব। জননী মোক্ষদাসুন্দরী চিন্তিত হয়, সোজা-বোকা মেয়ে। এ মেয়ের উপায় হবে কি।

মায়ের মন্তব্য শুনে নির্মলা মৃদু-মৃদু হাসে। একদিন এক কলসী জল পুকুর থেকে নিয়ে কাঁখে করে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে মাকে ডেকে বলে, তোমরা যে সকলে আমাকে সোজা বলো এই তো আমি বাঁকা হয়েছি।

সকলেই হেসে ওঠেন বোকা-মেয়ের বোকামি দেখে।

একদিন একটি পাথরের বাটি ধুয়ে আনতে বলে মোক্ষদাসুন্দরী মেয়ে নির্মলাকে বললেন, পারিস তো বাটিটি ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিস।

নির্মলা মৃদু হেসে বাটিটি হাতে নিয়ে চললো পুকুরঘাটে। পথে এসে সব ভুলে গেল। আবার ঐ উদাস ভাব। তারপর গাছের সঙ্গে সরল মনে কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্কতাবশতঃ বাটিটা ভেঙ্গে গেল। বাটি ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে গেল সে। মনে পড়লো ভাঙ্গা বাটি নিয়ে যাওয়ার কথা। অবশেষে ভাঙ্গা বাটিটা কুড়িয়ে নিয়ে জননী মোক্ষদাসুন্দরীর সামনে এসে উপস্থিত হলো। জননীর তো চক্ষুস্থির, বলে উঠলেন, ওরে এ কি এনেছিস!

—কেন মা, তুমি যে ভাঙ্গা বাটি কুড়িয়ে আনতে বলেছিলে।

সোজা-বোকা মেয়ে নির্মলার কথা শুনে আর হাসি চাপতে পারলেন না মোক্ষদাসুন্দরী।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীপূজা সবে সম্পন্ন হয়েছে। মোক্ষদা-সুন্দরী মেয়েকে ডেকে বললেন, ওরে ও নির্মলা, ঠাকুর-প্রণাম করে যা।

প্রণাম করে বল, ঠাকুর তুমি আমার মঙ্গল করো।

ঠাকুরের সামনে এসে বালিকা মেয়ের হঠাৎ ভাবাবেশ হলো। সব ভুলে গেল সে। বিহ্বল কণ্ঠে বললো, ঠাকুর তোমার যাতে আনন্দ হয় তাই করো।

বিস্মিত হলেন জননী মোক্ষদাসুন্দরী। সংসারের অচল অবস্থা। তার উপর তিনটি সন্তানের অকাল-মৃত্যুতে জননী মোক্ষদাসুন্দরী শোকমগ্না। কিন্তু প্রতিবেশীরা কোনোদিন শোকাকুল জননীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পায়নি। হাস্যময়ী নির্মলা জননীকে পুত্রশোক থেকেও ভুলিয়ে রেখেছে। আনন্দের আধার আনন্দময়ী। জননীর মনোজগতে ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছে!

এই প্রসঙ্গে মা বলছেন :

'এই শরীরটার জননী যদি কখনও কান্নার উপক্রম করতেন, তখনই এই শরীরটাও চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিতো এবং তার ফলে শরীরটার জননী বাধ্য হয়ে নিজে শান্ত হতেন এবং এই শরীরটার কান্নাকেও থামাতেন।'

বয়সে বালিকা হলেও সে যে পূর্ণজ্ঞানী। তাই এই বয়সেও সে ভাবস্থ হয়। ভাব সমাধি। প্রেমোৎসুকা কৃষ্ণ-বিহ্বলা গোপিনীদের যে ভাব হতো সেই ভাব। মহাভাব। শ্রীমতীর ভাব। রাধা ভাব।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে থাকে। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়। পিতা-মাতা নিদ্রামগ্ন। ঘুমিয়ে পড়েছে সমস্ত গ্রাম। নিস্তব্ধ চতুর্দিক।

দূর গ্রাম থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে কীর্তনের সুমধুর সুর। সুরধ্বনি নয়। সুমধুর সঙ্গীতের সুরও নয়। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর। বাঁশের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর। যে সুর শুনে একদিন কুলবধূ আঁচলে চোখ মুছতো। পথ চলতে-চলতে পথিক পথও যেতো ভুলে। কলসীর জল ফেলে কুলবধূ আবার যেতো জল আনতে। সেই সুরের মর্মান্তিক করুণা ও বিলাপ শুনে মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুও চাইতো না ঘুমাতে। সেই সুর আজ শুনেছে বালিকা মেয়ে নির্মলা। এ যে ঘুম ভাঙার সুর কুল ভাঙার সুর। এ সুরে আছে এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস। তাইতো তার চোখেও ঘুম নেই।

এইভাবে গভীর রজনীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বালিকা মেয়ে নির্মলা ভাবস্থ হয়ে থাকতো যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হয়।

এই প্রসঙ্গে মা বলেছেন :

'এই সব ভাব ধরা বড় মুশকিল। এই মহান ভাবের খেলা যাহার মধ্যে আপনি-আপনি হইয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যেও কখনো-কখনো লৌকিক ভাবের আভাস পাওয়া যায়। কারণ লৌকিক অলৌকিক যুগপৎ দুই ভাবের খেলাই যে তাহার মধ্যে হইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক গতিতে এমন সুন্দর এই যে হাত-পা সমস্ত লইয়া যেন মহাপ্রকৃতি খেলা করিতেছে। সামান্য একটু ইচ্ছা থাকিলেও মহানুভাবের খেলা তাহার মধ্যে হইতে পারে না।'

মা আবার বলছেন :

'ছাখো, এই শরীরটার কি রকম হইত জানো? জল দেখিয়া, আগুন দেখিয়া বা বাতাসের সঙ্গে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যাইত। যেন এই শরীরটাই নদীর ঢেউ বা আগুনের মূর্তি অথবা বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অতি সামান্যভাবে মাটির সঙ্গে পায়ের স্পর্শ আছে, সেই অবস্থার শরীরটা বাতাসের মতো এদিক-ওদিক চলিতেছে কিন্তু পড়িয়া যায় না। তাহার কারণ শরীরটা বাতাসের মতো হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। এইরকম নদীতে নৌকায় গেলে শরীরের গতি এমন হইয়া যাইত যে নদীর জলে মিশিয়া যাইতে চাহিত। সেইভাবেই শরীরে এমন একটা অস্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ হইত যে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিত না। আপনা হইতেই সে-ভাবটা আবার থামিয়া যাইত। নতুবা কাহারও ধরিয়া রাখিবার শক্তি হইত না।

এই মহান ভাবের খেলা যাহার মধ্যে হইয়া যায়, তাহার মধ্যে যুগপৎ সব ভাব সব সময়েই খেলিয়া যাইতে পারে। তাহাদের শরীর পঞ্চভূতের দেখা বটে, আবার সবই অতীন্দ্রিয়ের লীলা লইয়া যাইতেছে। অতীন্দ্রিয় না হইলে দুইটি ভাব যুগপৎ এক আধারে প্রকাশ পাইতে পারে না।'

আর একটি নতুন দিন!

আলো আঁধারের ছন্দে এমন নিখুঁতভাবে গাঁথা, যেন মনে হয় আলো আঁধারের ছন্দ থেকেই তার উৎপত্তি। সেই নতুন দিনের আলোয় আলোকিত

হয়ে ওঠে কিশোরী মেয়ে নির্মলার জীবন। তাঁর জীবনে স্বামীরূপে এলেন ভোলানাথ। তখন তাঁর বয়স তেরো বৎসর। ১৩১৫ সালের ২৫শে মাঘ ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর তৃতীয় পুত্র শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে শুভ বিবাহ ক্রিয়া হলো সম্পন্ন। 'ভোলানাথ' নামটি অবশ্য শ্রীশ্রীমায়েরই দেওয়া।

এমন যে ধার্মিক পরিবার তাদেরও জমি বিক্রি করে মেয়ে বিয়ে দিতে হয়েছিল! একবার এক সাধু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা স্বয়ং যে ঘরে এলেন সে ঘরেও এত কষ্ট!

প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে মা বললেন, কষ্টই তো তাদের কাছে কষ্ট পেয়েছে।

এবারে শুরু হলো নির্মলাসুন্দরীর গার্হস্থ্য-জীবনের কুলবধূর ভূমিকা। বিয়ের পর শ্বশুর মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন। শাশুড়ী আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। অকস্মাৎ স্বামীও কর্মচ্যুত হলেন। সুতরাং নির্মলার বধূ-জীবনের শিক্ষানবিশী চলতে লাগলো ভাসুর রেবতীমোহনের অন্তঃপুরে। রেবতীমোহন তখন ঢাকা জগন্নাথগঞ্জ লাইনে শ্রীপুর, নরুদী প্রভৃতি স্থানে স্টেশন মাস্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রেবতীমোহনের সংসারে ভ্রাতৃজায়ারূপে দীর্ঘ চার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্মলাসুন্দরী ভবিষ্যতের আনন্দময়ী মা রইলেন লুকিয়ে। স্টেশন সংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টারে। বধূত্বের অভিনয় হতো সর্বাঙ্গসুন্দর। কুলবধূর পালনীয় সকল নিয়ম ও আচার পালন করতো সে মহানন্দে।

কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে ভাবাবেশের জন্য নববধূ ঢলে পড়তো উনোনের পাশেই। উনোনে চড়ানো ডাল তরকারী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সকলে মনে করলো, ঘুম। বউ ভীষণ ঘুমায়। পরে মাঝে-মাঝেই যখন এরূপ ভাবের আবেশ হতে লাগলো, তখন সকলে মনে করলেন এ এক রকমের রোগ! ওষুধেরও ব্যবস্থা হলো। কিন্তু রোগের আসল মূলটি যেখানে, ততদূর পর্যন্ত কোনোরকম ওষুধের ক্রিয়াই পৌঁছলো না। ফলে রোগ দিনে-দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সাধারণ মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়লো না। এ যে সামান্যা কুলবধূ নয়, ভাগবতী তনু, জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণা হয়েছেন ধূলির ধরণীতে। এ যে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা!

তাইতো একা ঘরে স্বামী নবপরিণীতা বধূর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন তিনি অলৌকিকভাবে যোগাসনে বসে আছেন। যখনই নববধূর কাছে আসবার চেষ্টা করতেন তখনই বোধ করতেন কি একটা অস্পষ্ট অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান

যেন উভয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মতো রয়েছে দণ্ডায়মান।

ভোলানাথের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের আচরণ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মা বলেছেন :

'ভোলানাথের পারিবারিক জীবনে এই শরীরের প্রতি তাহার কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহা লইয়াও অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকে। বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া ভিতরের ভাব ধরা বড় শক্ত। তোমাদিগকে একদিনের ঘটনা বলিতেছি। একদিন কুশারী মহাশয়ের বাড়ীতে (ভোলানাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি) কুশারী মহাশয়, ভোলানাথ এবং এই শরীরটা বসিয়া গল্প করিতেছে। এমন সময় এই শরীর ভোলানাথকে বলিল, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শুই। এই বলিয়া ভোলানাথের কোলে শুইতে গেলাম। ভোলানাথ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া দুই হাত দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু এই শরীর যেখানে শুইবে বলিয়াছিল সেখানেই মাটির উপর শুইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া কুশারী মহাশয় একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ভোলানাথকে ঐরূপ ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোলানাথ বলিল, বিবাহের পর হইতে সমস্ত জীবনই এইরূপ চলিয়াছে। আপনারা দেখিতেছেন এ আমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে আমার সেরূপ হয় নাই। আমি দেবী-জ্ঞানেই ইহাকে দেখিয়া আসিতেছি। এবং সেইরূপ ব্যবহার করিতেছি।'

নির্মলা এখন অষ্টগ্রামে। স্বামীর কর্মস্থলে। হঠাৎ ভাসুর মারা গেলেন। তাই চলে এলেন অষ্টগ্রামে। নিজের সংসারে আবদ্ধ হতে নয়, এ যেন বিশ্বজননী এলেন বিশ্বের ঘরে।

এই অষ্টগ্রামেই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ভাবের আবেশ হয় লোক-সম্মুখে।

মায়ের নিজের ভাষায় :

'প্রকৃতভাবে নাম আরম্ভ হইল, যখন ভোলানাথ বিবাহের পর এই শরীরকে লইয়া অষ্টগ্রাম গেল। ...ছোটবেলায় তুলসীগাছের যত্ন করিতে শেখা হইয়াছিল। এহ শরীরের মা-ই তাহা শিখাইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিয়াও একটি তুলসীমঞ্চ করা হইল। সেখানে ফুল বাতি দিয়া এমন করিয়া রাখা হইত যে লোকে ঐখানে আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিত। এই তুলসীমঞ্চ দেখিয়াই এখানে কীর্তনের বন্দোবস্ত হয়। অন্য জায়গা হইতে কীর্তনের দল বাতি ও

খোল-করতাল লইয়া রাত্রিবেলায় গান করিতে আসিত এবং আসিয়াই ঐ তুলসীতলায় কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিত। .....যখন কীর্তন আরম্ভ হয় তখন এই শরীর এক রোগিণীর সেবায় ছিল। কিন্তু ঐ কীর্তন শুনিতে-শুনিতে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেল। তখন আর লজ্জা-সরমের কোনো প্রশ্নই নাই। ইহার পূর্বে কিন্তু এই শরীর লম্বা ঘোমটা দিয়া খুব সাবধানের সহিত চলিত। এই শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে ইহার 'ফিট' হইয়াছে। তাহারা এই শরীরকে উঠাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।'

এই ঘটনার পর থেকেই শ্রীশ্রীমা নিয়মিতভাবে 'নাম' করতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়ঃ

'কীর্তনে এই ভাব হওয়ার পর হইতেই নিয়মমতো হরিনাম চলিতে লাগিল। ইহার পূর্বে যে নাম করা হইত তাহা মাঝে-মাঝে হইত। প্রত্যহ নিয়মমতো করা হইত না।'

গ্রামের বধূ নির্মলার ভাব-সমাধির কথা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। অষ্টগ্রামের ধনী মানুষ ক্ষেত্রবাবু ভাব-বিহ্বলা নির্মলার অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবী বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন হরকুমার রায়, তুই শুধু আমার মা নয়। তুই জগজ্জননী!

হরকুমার রায় হলেন অষ্টগ্রামের শ্রীজয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের শ্যালক। সরল প্রাণের মানুষ। ভগবৎ ভাবের উন্মাদ। হরকুমারই প্রথম নির্মলার সুপ্ত মাতৃভাবকে তুলেছিল জাগিয়ে। 'মা' ডাকের মাধুর্য প্রথম উপলব্ধি করেছিল নির্মলা হরকুমারের 'মা' ডাকের মধ্য দিয়ে।

এইভাবে অষ্টগ্রামের লীলা সাঙ্গ করে নির্মলা এলেন বাজিতপুরে। ভোলানাথ সেটেলমেণ্টের চাকুরী করেন। বদলি হয়ে এসেছেন।

আজকাল প্রায়ই ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে যায় নির্মলা। ভাব-সমাধি হয়। কীর্তনে, নামগানে। কোথাও হরিনাম কৃষ্ণনাম হলেই হলো। গোপাঙ্গনাদের মতো আনন্দ-বিহ্বলা হয়ে যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে তার শরীরে তখন চলতে থাকে সাধন ভজনের নানারকমের খেলা। নানারকমের মুদ্রা। দিনের বেলা সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন আর রাত্রিকালে শয়নকক্ষের এক কোণে বসে-বসে শুরু করেন নানারকমের অদ্ভুত আসন মুদ্রা ও পূজা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবশ্য সবকিছু হয়ে যায়। ভোলানাথ সেই ঘরে বসে-বসে বিস্ময়-

বিস্ফারিত নেত্রে এই খেলা দেখে অভিভূত হয়ে যান। মাঝে-মাঝে তাঁর বিস্ময় আতঙ্কে পরিণত হয়।

সুজাতা খুবই অসুস্থ। সুজাতা হলো শ্রীভূদেবচন্দ্র বসুর ছোট মেয়ে। গৃহে নামগান হবে। কৃষ্ণনাম। লোকসমাগম হয়েছে। নির্মলা ভূদেববাবুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর খুবই প্রিয়। ছেলেমেয়েরাও নির্মলা ভিন্ন কিছু জানে না। অসুস্থ মেয়ের বিছানায় বসে আছে নির্মলা। কীর্তন শুরু হয়েছে। কৃষ্ণনামে মুখরিত চতুর্দিক কৃষ্ণনাম ধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে নির্মলার অন্তর। সেই সুমধুর নামধ্বনি তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভাবের আবেশ হলো। শরীরের অবস্থা হলো অস্বাভাবিক। হঠাৎ বিছানা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো। ছুটে এলো সকলে। সকলেই অভিভূত হলো নির্মলার দেহলতিকার অলৌকিক রূপ দর্শন করে। এমন রূপ তো দেবী ভগবতীরই কল্পনা করা হয়। এ তো কোনও মানবীর রূপ নয়! আত্মানুভূতির শুভ্র আলোক-ছটায় তখন তার মানবীরূপ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হয়েছিল রূপান্তরিত। চিন্তিত হলেন ভোলানাথ। উপস্থিত সকলেই। কিন্তু কীর্তন বন্ধ করা হলো না। সুতরাং কিছু সময় পর আবার নির্মলা ফিরে এলো লৌকিক জগতে। পরমব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মশক্তিতে। জীবজগতে। পরমাত্মা থেকে আত্মাতে। ধীরে ধীরে উন্মীলিত হলো তাঁর চোখের পাতা দুটি। আশ্বস্ত হলেন সকলে। কিন্তু এই ঘটনার কথা প্রচারিত হলো সমস্ত বাজিতপুর গ্রামে। সাধারণ মানুষেরা এই অবস্থাকে ভূত প্রেত বা ক্ষুদ্র অশুভ দেবতার আবেশ বলে প্রচার করলো। প্রতিবেশিনীরা নির্মলার সাথে মেলামেশাও বন্ধ করে দিলো। ভয়ে। অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

পরবর্তী জীবনে মা বলেছিলেন :

'বাজিতপুরের এই অবস্থা হওয়ার পূর্বে আমাকে প্রত্যেকেই খুব ভালবাসিত। সর্বদাই আমার কাছে আসিত। কিন্তু এই অবস্থা আরম্ভ হইলে আমাকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া সকলে আমার নিকট আসা বন্ধ করিল। ভালই হইল। আমি একান্ত পাইয়া আপন মনে বসিয়া ভাবিতাম। সবই যেন ঠিক-ঠিক মতো হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে ভোলানাথ বাধ্য হয়ে দুই একজন ওঝাকে দিয়ে প্রতিকারের

ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোনোই ফল হলো না। বরং ওঝারাই ভয় পেয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো।

তখন আবার ভোলানাথই ব্যাকুল হৃদয়ে নির্মলার কাছে প্রার্থনা জানালো, ওগো যাতে এরা সুস্থ হয় তাই করো। তারপর নির্মলার প্রসন্ন দৃষ্টিতে তারা সুস্থ হয়ে সরে পড়ে।

সংবাদ পৌঁছলো নির্মলার পিত্রালয়ে। বিদ্যাকুটে। বিপিনবিহারী এতদিনে ফিরে এসেছেন স্বগ্রামে। মোক্ষদাসুন্দরী বিচলিত হলেন। কোলে তাঁর ছেলে মাখন। নির্মলার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। বিপিনবিহারী বোঝালেন স্ত্রীকে। এসব সাধারণ মানুষের বুঝবার জিনিষ নয়। আমি আজই নামগানের ব্যবস্থা করছি, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বললেন :

'ভোলানাথ এ শরীরের পিতামাতার নিকট চিঠি লিখিল। এই শরীরের মা কিন্তু দেখা করিতে আসিল না। সে ভাবিল, এই ভাব যদি ধর্মপথের সহায়ক হইয়া থাকে, তবে সে গিয়া ইহাতে বাধা দিয়া কি কোনো অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিবে? এই সব চিন্তা করিয়াই সে রোগের কথা শুনিয়াও এই শরীরকে দেখিতে আসিল না।'

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর আশ্রয় করে যেসব খেলা চললো সেই প্রসঙ্গে মা বলেছেন :

'যেসব অবস্থা শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত তাহা বলা যায় না। কখনও বসিয়া আছি। চোখ দুইটি এমন হইয়া উঠিল যে লোকে দেখিলে ভয় পায়। মুখের ভাব সুন্দর কিন্তু কেমন যেন অন্য একরকম হইয়া গেল। হাতও নানাভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। কনুইটা এই স্থানে, মাথাটা এইভাবে থাকিবে এইরকম ভিতর হইতেই আসিতেছে। আর শরীরও সেই রকম হইয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে—হয় কেন? শরীরের অঙ্গভঙ্গীর ক্রিয়াগুলি দেখিলে তো ভয়ই হয়। ইহার কারণ কি জানো? ষট্চক্র প্রভৃতি তোমরা কত কী বলো না, কিন্তু এই শরীর বলে সমস্ত শরীরেরই অনেক গ্রন্থি আছে। এই রকম ক্রিয়াদি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক-এক স্থানে গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেছে। তোমরা বলো চক্ষু দিয়া ত্রাটক করে। এই শরীর বলে সর্ব শরীর নিয়াও এইভাবে ত্রাটকের ক্রিয়া হইয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায়—নানা

অঙ্গসংস্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে-সঙ্গেই শ্বাসের ক্রিয়াও সেইভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সে এক চমৎকার অবস্থা। সবই আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। হঠযোগ রাজযোগ আরও কি সব তোমরা বলো যে সবই এই শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যে আছে ততক্ষণ স্তর বা সিঁড়িও আছে।'

আবার এই সকল ক্রিয়ার ক্রম সম্বন্ধে মা বলছেন :

'এর পরের অবস্থা কি রকম জানো? যেমন তোমরা লিফ্‌ট না কি বলো, তাইতে উপরে ওঠো। যেমন দোতলা তেতলায় উঠিয়া তুমি লিফ্‌টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ, দেখিলে লিফ্‌ট উপরে উঠিয়া যাইতেছে, তখন তোমার আর কোনো ক্রিয়া নাই। উপর নীচে সব তখন তোমার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে। দরকার মতো স্বভাবতঃ যাতায়াত হয়, সেজন্য তোমার আর চেষ্টা করিতে হয় না। অথবা উপর নীচই তোমার কাছে আর থাকে না—ইহাও বলিতে পারো।

বেশ দেখিতাম ক্রিয়াগুলি আরম্ভ হইল ; এক একটি করিয়া হইয়া গেল, আবার মুখ দিয়া বাহির হইল 'ব্যস্ এখন যাই'—এই বলিয়া ক্রিয়া বন্ধ হইল। যেন ক্রিয়াগুলিই 'এখন যাই' বলিয়া ক্রিয়া বন্ধ হইয়া শরীর সাংসারিক কাজে নিযুক্ত হইতে চলিল। অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য এই জাতীয় ক্রিয়া বন্ধ আর কি ! এমন সুন্দর প্রকাশ।

সাধকদের কি হয় জানো? যেন এক-একটা অবস্থা হইয়া যাইতেছে। আবার নূতন একটা আসিতেছে, এইভাবে তাহাদের ক্রমোন্নতি হয়। কিন্তু এই শরীরটা অন্য রকম। তাই ওলটপালট দেখা যায়, এসব ধারার কিছু ঠিক থাকে না। একবার হয়তো তোমাদের দৃষ্টিতে একটা উচ্চস্তরে ক্রিয়া শরীরের মধ্যে খেলিয়া গেল, আবার হয়তো একটা সাধারণ ভাবেই শরীরের মধ্যে খেলিতেছে। উপর নীচ বলিয়া তো এ শরীরে কিছু নাই। তোমাদের যখন যাহা দরকার তাহা এই শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া যাইতেছে।'

বাজিতপুরে আর একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। বাজিতপুরে সাব-রেজিষ্ট্রারের মায়ের গুরুদেব ছিলেন একজন শক্তির উপাসক। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের তখনকার অবস্থার কথা শুনে বলেছিলেন ইচ্ছা করলে তিনি মাকে ভগবৎ সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন। তিনি স্বয়ং বগলাসিদ্ধ। অবশেষে সেই

গুরুদেবের ইচ্ছানুসারেই ভোলানাথ একদিন তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এলেন।

সেই ঘটনা বর্ণনা করছেন মা তাঁরে নিজের ভাষায়ঃ

তিনি কথা বলিতে-বলিতে বলিলেন যে তাঁর বগলাসিদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে এই শরীর অতি তেজের সহিত বলিল, কি বগলাসিদ্ধি হইয়াছে? এবং কখন ইনি কি কি কাজ করিতে গিয়া বিফল হইয়াছেন তাহা একটির পর একটি করিয়া জোরে-জোরে এই মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সেই গুরুদেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভোলানাথও এই শরীরকে চুপ করিতে বলিল। কিন্তু এই দেহ হইতে যাহা প্রকাশ হইবার তাহা তো হবেই। অবশেষে সেই গুরুদেবই এই শরীরের কাছে বলিতে বাধ্য হইলেন ওঁর বগলাসিদ্ধি হয় নাই। এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কি-কি করিতে হইবে তাহা এই শরীরের কাছে জানিতে চাহিলেন। আবার মজাও এমন তাঁহার জিজ্ঞাসার সঙ্গে-সঙ্গে এই শরীর হইতে বগলাসিদ্ধিলাভের মন্ত্র ও পূজার বিধি সবই বলা হইয়া গেল।'

—ভাল করে একবার দেখুন তো?

কালীকচ্ছের ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর কাছে নির্মলাকে নিয়ে এসেছেন ভোলানাথ।

—এ কি উন্মাদ না স্নায়ুবিকার? রাতে একফোঁটা ঘুম নেই। কখনও ঘরের মেঝেতে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনও আবার উপুড় হয়ে প্রণামের ভাবে থাকে আর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ওঁ ওঁ শব্দ। এভাবে চলেছে দিনের পর দিন। লোকের কথায় তো অনেক কিছুই করলাম কিন্তু কিছুই হলো না। এখন একবার দেখুন।

মহেন্দ্র নন্দী দেখলেন। ভাল করে দেখলেন নির্মলাকে। দিব্যদ্রষ্টা ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দী বুঝলেন রোগের মূল কোথায়।

ভোলানাথকে বললেন, এসব খুব উচ্চ অবস্থা। ব্যারাম নয়। যাকে তাকে দেখাবেন না।

এরপর ভোলানাথ আর কাউকে দেখাতেন না।

বাজিতপুরেই শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা হয়ে গেল অলৌকিকভাবে। বাংলা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাস। ঝুলন পূর্ণিমার দিন। লোকাচার অনুযায়ী নয়। এই দৈবী প্রভাবের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্‌শক্তিও হলো রহিত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৌন হয়ে গেলেন। এক অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে দিন অতিক্রান্ত হতে লাগলো।

এই সব দেখে মায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ মামাতো ভাই নিশিকান্ত ভট্টাচার্য ভোলানাথকে বললেন, এ সব কি হচ্ছে? তুমি কিছু বলতে পারো না? দীক্ষাদি হলো না, কিছু না।

অকস্মাৎ মায়ের ভাবের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়ে গেল। মা বলে উঠলেন, কি বলবে রে? কি বলবে?

নিশিবাবু শ্রীশ্রীমায়ের ঐ ভয়ঙ্কর দিব্যরূপ দর্শন করে ভয়ে কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন এবং সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হলো, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

ভোলানাথও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

মাতৃবাণী স্ফুরিত হলো, মহাদেবী!

অকস্মাৎ জানকীবাবু সেখানে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে?

তাঁকেও শ্রীশ্রীমা বললেন, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

এই প্রসঙ্গে মা বলছেন:

'আত্মীয়দের স্ত্রীভাব, ভগিনীভাব তাই তাঁহাদের নিকট স্ত্রীলিঙ্গ বাহির হইয়াছে। তাঁহাদেরই ভাব অনুযায়ী। বাস্তবিক কিন্তু "নারায়ণ' শব্দই ঠিকভাবে বাহির হইয়াছিল। আর 'মহাদেবী' শব্দটা বাহির হওয়ার কারণ, যখনই কোনো দেবী বা দেবতার পূজা হয়, পূজক তখন তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যায়। এ শরীর তখন মহাদেবীর পূজা করিতেছিল। তাই ঐরূপ শব্দ বাহির হইয়াছে। পূজা অর্থ বাহ্যিক পূজা নয়। দীক্ষার পর হইতে সেই ভাবের কতকগুলি ক্রিয়া হইয়া যাইত।'

দীক্ষার কথা বলতে গিয়ে মা আবার বলছেন:

'এই শরীরের দীক্ষা হয় ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলনযাত্রা দেখিতে

ঐদিন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অনেকেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথেরও খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শরীর যেভাবে ঘরের মেঝে লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়া আছে, উহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে-দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন, দীক্ষা লইতে যেরূপ যজ্ঞ ও পূজা করিতে হয়, তাহা আপনা-আপনিই এই শরীর হইতে হইয়া গেল। যজ্ঞস্থলী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ারী। ফুল ফল জল ইত্যাদি প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান। যদিও ইহা কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু উহা যে সবই সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দীক্ষামন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থলীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং দীক্ষামন্ত্রের উপর পূজা ও আহুতি হইল। এইভাবে বিধিপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তাহার পর কর ঘুরাইয়া যখন দীক্ষামন্ত্র জপ আরম্ভ হইল তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে এই শরীর জপ করিতেছে। এ শরীর তো কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ উহা ইহাকে দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনা-আপনি কর ঘুরিয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি সব উলটপালট হইয়া যাইতেছে। পরে দেহের আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনা-আপনিই জপ হইয়া যাইত। এইভাবে শরীরের দীক্ষা হইয়া গেল।

সাধনার কথা যে বলা হয়, এই শরীর কাহার নিকট হইতে সাধন পাইল? কে ইহাকে পথ বলিয়া দিলো? দীক্ষা তো নিজেই নিজেকে দিলো। পূজা, মন্ত্রজপ যাহা কিছু হইল, সবই তো নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া ইহাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। এই শরীরের সাধন সম্বন্ধে তো অনেকবার বলা হইয়াছে যে ইহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। সবই তো জানা আছে।'

আবার শান্তভাবে মা বলছেন:

'এসব কথা-বলাটা এসে গেল। এসব কথা যে কত সত্য, প্রত্যক্ষ ও গভীর তা সাধারণের বোঝা মহা মুশকিল। এইসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হওয়াটা তো স্বাভাবিক, কারণ তারা তো বুঝবে না এবং জানেও না। যার ভিতর যতটুকু শক্তি তিনি তো সেইরূপেই প্রকাশ আছেন কিনা? বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইটাই

যে স্বাভাবিক। সর্বরূপে ও ভাবে এ যে সেই।'

গুরু সম্বন্ধে মা বলেন :

'এ শরীর তো সর্বদাই বলে যে ছোটবেলায় এ শরীরের গুরু ছিলেন বাপ-মা। পরে যখন বিবাহ দিলেন তখন বাপ-মা-ই বলিয়া দিলেন যে স্বামী গুরু। কাজেই বিবাহের পর স্বামীই গুরু হইলেন। তাহার পর জগতে যা কিছু সকলেই এ শরীরের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পারি যে আত্মাই গুরু অথবা এই শরীরই এই শরীরের গুরু।'

দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতি ধীরে ধীরে ওঠে আর নামে। সীমাহীন মহাসমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতন দিন আসে রাত্রি যায়, অনিবার্য ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা। সপ্তাহ শেষ হয় মাস চলে যায় আবার আসে নূতন সপ্তাহ, নূতন দিন। ভোলানাথ দীক্ষা নিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে। ১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৩০৯ সন। ভাবাতীতা মহাভাবরূপিণী মহামায়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ থেকে বীজমন্ত্র হলো উচ্চারিত। মা ভোলানাথকে বললেন সেই মন্ত্র। ভোলানাথ সেই মন্ত্র গ্রহণ করলেন। ভোলানাথ সর্বান্তঃকরণে 'দেবী' বলে গ্রহণ করলেন নিজ স্ত্রী নির্মলাকে।

মা-ও ভোলানাথকে দেখলেন বালগোপালরূপে। পরস্পরের প্রতি দেবতা-ভাব ছিল তাঁদের দাম্পত্যজীবনের বিশেষত্ব।

১৯২৪ সাল। শ্রীশ্রীমা এখন ঢাকায় শাহবাগে।

ভোলানাথ চাকুরীর সন্ধানে এসেছেন ঢাকায়। সঙ্গে স্ত্রী নির্মলাও আছেন। অনেক চেষ্টার পর চাকুরীর সন্ধান যখন মিললো না, তখন ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু স্ত্রী বাধা দিলেন বললেন আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে। অগত্যা ভোলানাথ মেনে নিলেন স্ত্রীর শ্রীমুখের কথা। আরও তিনদিন রইলেন ঢাকায়। অলৌকিক ব্যাপার, ঠিক তিন দিনের দিন ১৩৩১ সালের (বাংলা) ৩রা বৈশাখ, শাহবাগে নবাবদের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজে নিযুক্ত হলেন ভোলানাথ। রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষ, মৃণালিনী দেবী ও প্রফুল্ল ঘোষের একান্ত চেষ্টায় এই চাকরী জুটলো ভোলানাথের। শাহবাগের প্রকাণ্ড বাগানের

এক অংশে থাকবার ব্যবস্থা হলো। শ্রীশ্রীমায়ের মানসোপযোগী স্থান হলো এই শাহবাগের বাগানবাড়ি। শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় শাহবাগের বাগান বাড়িতেই গড়ে উঠলো মাতৃমণ্ডলী। আর এই শাহবাগে অবস্থানকালেই শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতির নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। শ্রীশ্রীমায়ের নাম পূর্ববঙ্গের ঘরে-ঘরে প্রচারিত হলো। মূর্তিমতী আনন্দরূপিণীরূপে প্রকাশিতা হলেন মা! শাহবাগের শ্রীশ্রীমা হলেন জগতের জননী। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা হিরণবালা ঘোষ মাকে খুবই ভালবাসতেন।

তিনি বলছেন ঃ

'ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি। প্রায় প্রতিদিন বাগানে সেই বউটিকে দেখতে যেতাম। বৈকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে কতক্ষণে সেই সময়টা আসবে তাই আমি অস্থির হতাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলতেন, বাড়িতে থেকে কি ধর্ম হয় না? রোজই সেখানে কি? ধর্ম মনে করে যেতাম তা মনে হয় না। কিন্তু একদিন সেই বউটিকে না দেখলে প্রাণ অস্থির হতো। বাগানে যাবার জন্য ব্যাকুল হতাম। কেবলই মনে হতো, ঐ যে শাহবাগের সেই বউটি। আমার ভালবাসাও যেন ক্রমশঃ সেই বউটির দিকেই যেতে লাগলো।

শাহবাগে অবস্থানকালে মায়ের অলৌকিক শক্তির যে বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল, সিদ্ধেশ্বরী স্থানলীলা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজিতপুরেই মা স্বপ্নে 'সিদ্ধেশ্বরী গাছ' দেখেছিলেন। ভোলানাথের বন্ধু স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত বাউলচন্দ্র বসাকই প্রথম শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথকে সিদ্ধেশ্বরী নিয়ে যান। সেখানে একটি প্রাচীন কালীমন্দির ও একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ থেকে কোনো সময়ে একটি জ্যোতি বেরিয়ে কালীমূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল। মায়ের খেয়াল অনুযায়ী ভোলানাথ ও মা আটদিন সিদ্ধেশ্বরী স্থানে বাস করেন। তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

মা বলছেন ঃ

'আটদিনের দিন ভোরে ভয়ানক বৃষ্টি। এই শরীর ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া বাহিরে গেল। কোথায় কি রাস্তা কিছুই জানি না, একেবারে উত্তরদিকে চলিলাম। শেষে নির্দিষ্ট স্থানে শরীরটা দাঁড়াইল। তিনবার প্রদক্ষিণের মতো হইল। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া, কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং মুখ হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইতে লাগিল। বসিয়াই হাতখানি চাপিয়া রাখিলাম।

আশ্চর্যের বিষয় এক-একটা মাটির পর্দা সরিয়া যাইতেছে, আর হাতটা অবাধে ঢুকিয়া যাইতেছে। এইভাবে যখন বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকিয়া গিয়াছে তখন ভোলানাথ এই শরীরটা ধরিয়া ফেলিলেন এবং হাতখানি বাহির করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অল্প-অল্প গরম জল লাল রঙের হইয়া উঠিতে লাগিল।'

পরে মায়ের নির্দেশে ঐ স্থানে একটি বাঁশ দিয়া ঘেরা ইটের বেদী তৈরী করা হয়। এইভাবে সিদ্ধেশ্বরীর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি কেন্দ্র করে রহস্যময়ী মায়ের নানা রহস্যের খেলা শুরু হলো। কালক্রমে ঢাকার রমনার আশ্রমটিও প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই সিদ্ধেশ্বরীতেই ভাইজীর কণ্ঠ থেকে অকস্মাৎ একদিন নিঃসৃত হলো 'আনন্দময়ী মা' নাম। যিনি জগতের আনন্দলীলা করবার জন্য আনন্দঘন মূর্তি ধারণ করেছেন, তিনিই তো আনন্দময়ী!

ভাইজী ভোলানাথকে বললেন, বাবা আজ হতে আমরা শুধু 'মা' বলে ডাকবো না, বলবো 'আনন্দময়ী মা'। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। শাহবাগের 'সেই বউটি', ঢাকার মা, মানুষ কালী, শ্রীশ্রীমা হলেন 'আনন্দময়ী মা'।

মা স্থিরদৃষ্টিতে ভাইজীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সমাধিস্থ হলেন। পরে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন ভাইজীকে, সিদ্ধেশ্বরী না গেলে, এই শরীরের নামকরণই বা কি করে হতো?

ভাইজী হলেন শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, আই এস ও. কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি দিল্লী থেকে ঢাকায় বদলী হয়ে এসে অকস্মাৎ মায়ের সংস্পর্শে আসেন। মায়ের লোকপাবনলীলা ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সর্বপ্রথমে তিনিই প্রচার করেন। 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থ তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

জ্যোতিষচন্দ্রের সন্তানভাব। বাৎসল্যরস। মায়ের উপর শিশুরমতো একান্ত নির্ভরতা। মায়ের নামে আত্মহারা তন্ময়তা। মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস। একদিকে ছিল কর্মজীবনের বন্ধন, অপরদিকে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা। কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মায়ের চরণে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ। সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হলো 'মৌনানন্দ পর্বত।'

ভাইজী নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন নিজের মনের অবস্থা:

'আমার মন প্রাণ তাঁহার (মায়ের) চরণে যুগল আশ্রয় করিয়া দিবানিশি পড়িয়া থাকে। এক-এক সময় বোধ হয়, তাঁহার চিন্তা স্থগিত হইলে আমার জীবনের ধারাও শেষ হইয়া যাইবে।...তাঁহার বিশ্বতোমুখী বাৎসল্য

স্বতঃস্ফুরিত হইয়া আমাকে যেন অসহায় শিশুর মতো সকল রকমে জড়াইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার স্নেহবেষ্টন হইতে দূরে যাইবার সামর্থ্য বা ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।'

ভাইজীর জীবনে মাতৃসঙ্গের অধ্যায় ছিল সংক্ষিপ্ত। মাত্র বারো তেরো বছর। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন অতি নিকটে এবং নিবিড়ভাবে। মাতৃসঙ্গের চরম পরিণতি ফুটে উঠছিল। তাঁর-জীবন-সায়াহ্নে দুটি ঘটনার মাধ্যমে—কৈলাসতীর্থ যাত্রা এবং আলমোড়াতে মহাপ্রয়াণ।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কোলে লীলা-সম্বরণ করেন। তিরোধানের সময় তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন ভোলানাথ:

'শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্বে আমাকে বলিল, বাবা দেখলেন তো, ওই সংসারে কেহ কারো নয়। একমাত্র শ্রীশ্রীমা-ই সত্য। তাহার পর 'মা' 'মা' বলিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া হরিরামকে ডাকিয়া বলিল, শোনো *We are all one*, মা আমি এক, বাবা আমি এক। তাহার পর তোমাদের মা'র দিকে চাহিয়া মা-মা ডাকিতে ডাকিতে ধীরে ধীরে লীলা সাঙ্গ করিল।

দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে ভাইজী একজনকে ডেকে লিখে রাখতে বলেছিলেন, আমরা সকলেই এক। মাকে যে অন্তরে-বাইরে সর্বত্র দেখতে পাচ্চি। কি আনন্দ! কি সুন্দর!'

—তুই এতদিন কোথায় ছিলি? হাসি-হাসি মুখে মা বলছেন আদরিণী দেবীকে। সিভিল সার্জন ডাক্তার শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে।—এখন এই শরীর দিয়া সব কাজগুলি ঠিকমতো হয় না, তাই সাহায্য করবার জন্য ভগা তোমাকে নিয়া আসিয়াছেন। কথা কয়টি বলে মা আবার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ডাক্তার শশাঙ্কমোহনের প্রিয় কন্যা, 'খুকুনী'—আদরিণী দেবীই হলেন মাতৃ-সন্তানগণের 'দিদি'। দিদির সৌভাগ্য মহিমা তাঁর মাতৃদত্ত নামের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে—'গুরুপ্রিয়া'।

এই গুরুপ্রিয়া দেবীই 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' গ্রন্থের রচয়িতা। মায়ের অলৌকিক জীবনের সর্ববিধ ছোট বড় ঘটনার অন্তরালে ছায়ার মতো আত্মগোপন করেছিলেন সর্ব প্রয়োজনে খুকুনীদিদিরূপে। মায়ের সঙ্গিনীশিষ্যা

ভক্তিমতী সেবিকারূপে। আর এই শশাঙ্কমোহনই হলেন ভবিষ্যতের স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি। সে সময় আনন্দময়ী মাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় যে অল্প-সংখ্যক ভক্তমণ্ডলী আনন্দচক্র গড়ে তুলেছিলেন ডাক্তার শশাঙ্কমোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিক্রমপুর সাঁমসিদ্ধির জমিদার শ্রীনিশিকান্ত মিত্র, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল শ্রীযুত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় দেওঘর বালানন্দ আশ্রমের স্বনামধন্য পুরুষ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী), শিক্ষক শ্রীবাউলচন্দ্র বসাক, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল শ্রীপ্রমথনাথ বসু, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ননীবাবু এবং রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশ ঘোষের সমস্ত পরিবারটি।

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে প্রথম আলাপের পর গুরুপ্রিয়া দেবী বলছেন :

'নেশা লাগিয়াছে। পরদিবস পুনরায় গেলাম। দেখিলাম। কথা শুনিলাম। চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আর প্রাণ টিকে না। রোজই যখন হয় একবার করিয়া মা'র কাছে যাই। সেই সময়টুকুর প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন রাত বসিয়া থাকি। এক-একদিন হঠাৎ মাকে দেখিবার জন্য মন এত চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, সেদিনের মধ্যে দুইবারও গিয়া উপস্থিত হইতাম। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে গিয়া মাকে সাহায্য করি। পরিবেশনে সাহায্য করি। আমাকে পাইয়া মা'র খুব আনন্দ।

নিজের অবস্থার কথাও আমার কাছে অনেক বলিতেন—আমার মতো প্রায় সর্বদার সঙ্গী ও কথা শুনিবার মতো লোক এখনও জোটে নাই। তাই যেন মহা আনন্দে প্রাণ খুলিয়া কত কথাই না বলিতেন। আমিও মুগ্ধ হইতাম, প্রত্যহ কোনো প্রকারে বাসায় গিয়া কিছুক্ষণ কাটাইবার পর চলিয়া আসিতাম।'

সিদ্ধেশ্বরী স্থানে ঘর উঠবার অনতিকাল পরেই মা গেলেন বৈদ্যনাথধামে। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সান্নিধ্যে। বালানন্দ ব্রহ্মচারী আনন্দময়ী মাকে খুবই স্নেহ করতেন। বৈদ্যনাথধামের লীলা সাঙ্গ করে মা আবার ফিরে এলেন ঢাকায়। পবিত্র নামকীর্তনে ঢাকার দিঙ্‌মণ্ডল হয়ে উঠলো মুখরিত। এক অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে মা নামগান করতেন। আবার কখনও-কখনও ভাবে বিভোর হয়ে প্রহরের পর প্রহর পড়ে থাকতেন। একটা তন্ময়তা ভাব। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢল-ঢল। শ্রী[illegible] ব। সে সময় তাঁর মুখশ্রী দেবীভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

কখনও আবার বসে বসে ধীরে সুমধুর কণ্ঠে নাম করতে থাকেন :

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

বার বার শুধু এইটুকুই গাইতে লাগলেন। কি সে সুর! কি মধুর ধ্বনি! শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এইভাবে ঢাকায় ভক্ত ও ভগবানের লীলাখেলা চললো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছরও ঘুরে এলো। এ খেলা তো নতুন নয়! যুগে-যুগে চলেছে এ লীলা-রহস্যের খেলা। অকস্মাৎ একদিন মা বললেন, 'তোমরা এই শরীরটাকে ছেড়ে দাও। এই শরীর আজই ঢাকা ছেড়ে চলে যাবে। বাধা দিলে শরীর ত্যাগ করেই চলে যাবো।'

অবশেষে সত্যি-সত্যিই ভক্ত-সন্তানদের চোখের জলে ভাসিয়ে হঠাৎ একদিন মা ঢাকা ত্যাগ করলেন। কোথায় যাবেন? কতদিনের জন্য? কিছুই বললেন না। সবই যে মায়ের খেয়াল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে একদিন শ্রীশ্রীমা ভোলানাথ ও ভাইজীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অনির্দিষ্ট অভিযানে। কাটিহার গোরখপুর লখ্‌নৌ হয়ে পৌছলেন দেরাদুন। শহরের অনতিদূরে রায়পুর গ্রামের শিবমন্দিরের কাছে এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। তারপর চললো অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের অধ্যায়। লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হলো উত্তর ভারতে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মা গেলেন উত্তর কাশীতে। আবার একদিন ভোলানাথ ও কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে উত্তর কাশীতে রেখে ভাইজীসহ ফিরে এলেন দেরাদুনে। দেরাদুনের আনন্দচক মন্দিরে বাস করতে লাগলেন। সৎসঙ্গের আয়োজন হলো। ভাইজী রচিত মাতৃসঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠলো দেরাদুনের আকাশ বাতাস। দিকে-দিকে 'আনন্দময়ী মা' নাম ধ্বনিত হতে লাগলো উত্তর ভারতের গ্রাম শহর নগর মন্দিরে-মন্দিরে। মাতৃকৃপা লাভ করলেন কমলা নেহেরু। তাঁরই ইচ্ছানুসারে রাজপুরে দুর্গামন্দিরে মায়ের উপস্থিতিতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। কমলা নেহেরুই মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু ও ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আনন্দময়ী মা'র বিভূতি-লীলার কথা প্রচার করেন। বিদেশেও তিনি প্রচার করেছিলেন 'আনন্দময়ী মা' নাম ও তাঁর অলৌকিক বিভূতি-লীলা-কাহিনী।

জ্ঞানমার্গে ভক্তিপথে কর্মযোগে সমাধিযোগে মা আনন্দময়ীর স্বচ্ছন্দ অনুভবজাত সিদ্ধান্ত অনেক প্রাচীন ও প্রবীণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

ঢাকায় দার্শনিক সম্মেলন। বড় বড় দার্শনিক ও অধ্যাপকরা সমবেত হয়েছেন। সম্মেলন শেষে দার্শনিকবৃন্দ ও অধ্যাপকমণ্ডলী এসে উপস্থিত হলেন শাহবাগের বাগানবাড়ীতে। আনন্দময়ী মাকে দর্শন করবেন ও শ্রীমুখের কথা শুনবেন। অভাবনীয় ছিল সে দৃশ্য। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন দার্শনিক ও অধ্যাপকরা। লেখাপড়া না জানা শাহবাগের সেই বউটি—অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ নির্মলা—'ঢাকার মা' প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছেন।

দার্শনিক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, মা, আপনি দর্শন পড়েছেন?

—কেন বাবা? মৃদু কণ্ঠে মা বললেন।

—আপনাকে আমরা যে সব প্রশ্ন করি তার যে সব উত্তর আপনি দিচ্ছেন, সেগুলি আমাদের দর্শন-গ্রন্থরাজির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এটা কি করে হয়? বললেন মহেন্দ্রনাথ সরকার। মা তো নিজেও অবাক। কি করে জুটছে এতো কথা! বেদ বেদান্ত পুরাণ পুঁথি কিছুই তো পড়া হয়নি। তবে? মা তো আর শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত নন। এ তো আত্মোপলব্ধির সত্য জ্যোতি প্রকাশ। পাণ্ডিত্য নয়। স্বচ্ছ অনুভবজাত সিদ্ধান্ত।

ধীর কণ্ঠে মা এই কথাই প্রকাশ করলেন :

'বাবা, একটা বিরাট গ্রন্থ আছে। সব রকম জ্ঞানই তার অন্তর্গত। সেই গ্রন্থের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তাঁর কাছে তোমাদের বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কিছুই অজানা থাকে না।'

এবারে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার উপলব্ধি করলেন আনন্দময়ী মা'র কথার মর্মার্থ। আর তাঁকে বাজাতে ইচ্ছা করলেন না। পরীক্ষা নয়, জানবার ইচ্ছা নিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, শুধু জিজ্ঞাসা নয়, ধরে বসলেন।

বাজিতপুরে অবস্থানকালে একদিন ভাবাবস্থায় যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন রাখলেন, আপনার মুখ থেকে সেদিন কি বের হয়েছিল?

মা কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বললেন :

'এ শরীরের বলিতে কি? এ শরীর তো নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু বলে নাই, যাহা বাহির হইবার, তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে।'

কিন্তু ডাক্তার সরকারও নাছোড়বান্দা। অকস্মাৎ মায়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর

ও রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো।

ধীরকণ্ঠে বললেন :

'এই শরীরের মুখ দিয়া তখন বাহির হইয়াছিল—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।'

পরমুহূর্তে মায়ের শরীরের ভাবান্তর ঘটলো। মা শয্যাগ্রহণ করলেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভোলানাথ বললেন, কেন বলিলে ? তুমি তো নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলে।

মা বললেন, 'এ শরীর তো কিছু নিজে ইচ্ছা করিয়া করে না। বোধ হয় সময় হইয়াছে, তাই এইভাবে হইল।'

—মা তুমি কি ? কেহ বলে তুমি অবতার, কেহ বলে তুমি আবেশ। কেহ বলে তুমি সাধিকা। সিদ্ধজীব। আমি সত্য সত্যই জানিতে ইচ্ছা করি তুমি কি ? প্রশ্ন করছেন দয়ানন্দ স্বামী। ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের প্রচারক।

আনন্দময়ী মা প্রত্যুত্তরে বললেন, তুমি কি মনে করো বাবাজী ? তুমি যাহা মনে করো আমি তাহাই।

মা বলেন :

'এ শরীরটা একটা যন্ত্র। যে যেমন আঘাত করবে সেইরূপ শব্দ পাবে।'

আবার বলছেন :

'এ শরীরটা তো একটা পুতুল। তোরা যেমন খেলাতে চাস, এ তেমনিতর খেলতে থাকে।'

শ্রীশ্রী মা আবার ভক্তবৃন্দসমাবৃত হয়ে উপনিষদের কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে বলছেন। ব্রহ্মানুভূতি কি ? ব্রহ্মের অনুভূতি মানেই ভগবান লাভ করা। কথাতে প্রকাশ করা যায় না। কথার মধ্যে এলেই খণ্ড হয়ে যায়। ভাষা তো ভাসা-ই। সেইজন্য বলা হয় জীব হলে শিব হওয়া যায় না। জীব ভাবটা কিরূপ, না মাঠের মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘর করার মতো। মাঠ তো পড়েই আছে। বেড়া দিয়ে ঘর করলেও, ঐ ঘরের মধ্যেও মাঠ বাইরেও মাঠ। আবার বেড়া ভেঙ্গে দিলে যে মাঠ সেই মাঠই। তাই বলি লাভালাভ বলে কিছু নেই।

জীব তো স্বরূপতঃ ভগবান। শুধু বন্ধনের জন্য তাকে জীব বলা হয়। বন্ধনটি খুলে গেলে সে যে ভগবান সেই ভগবানই থাকে। সেইজন্য আবার বলা হয় যে, যত জীব তত শিব! এই জীবভাবকে নদীর তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে আরও সহজ করে সরল করে কাব্যায়িত করে বলছেন, নদীর জলে ঢেউ ওঠে। এই ঢেউগুলি জীব আর জল হলো ভগবান। ঢেউ কিন্তু জলে ওঠে এবং প্রকৃতপক্ষে তা জল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই রকম জীবের স্থিতি ভগবানে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই ভগবানই। তবে আমাদের ভেদবুদ্ধি আছে বলে আমরা ঢেউকে জল থেকে আলাদা ভাবি। তা না হলে ঢেউ আর জলের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। সেইরকম জীব ও ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই।'

আমাদের অজ্ঞানতাই সৃষ্টি করছে প্রভেদ। আরও বিশদ করে মা বলছেন:

'মানুষের মধ্যেও একত্ব অসীমত্ব ও অব্যক্তভাব আছে। আমরা পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করলাম তার সব কিছুই প্রকাশ করে বলতে পারি না। এতেই মনের অসীমত্ব প্রকাশ পায়। আবার এই অসীমত্বের মধ্যেও একত্ব আছে। যেমন আমরা একটা একটা করে কথা বলি। এক অক্ষর এক অক্ষর করে লিখি। এক পা এক পা করে হাঁটি। এক-এক গ্রাস করে খাই। এগুলো একত্বের লক্ষণ।

আবার দ্যাখো, আমাদের মধ্যে অব্যক্ত ভাবও আছে। ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা কি বলি?—ফুলটি সুন্দর।

সুন্দর বললেই সবকিছু বলা হলো না। কিন্তু কেমন সুন্দর তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রকাশ করবার চেষ্টা করে আমরা অনেক কথাই বলে ফেলি। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ করতে পারি না। কিছু থেকে যায় অব্যক্ত। কাজেই জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ আছে। তাই জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। এছাড়া জীবের মধ্যে আরেকটি জিনিষ আছে যাকে আমরা বলি আনন্দ। জীব স্বভাবতঃই চায় আনন্দ! তার ভিতর এই আনন্দ আছে বলেই তো সে চাইছে? নইলে চাইতো না। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবের মধ্যেই আছে। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যেতে চায় না।

তারাও চায় শান্তি। আরাম। মানুষও সেইরকম ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত হয়ে শান্তির স্থল আনন্দের আকার ভগবানকে খোঁজ করে। ত্রিতাপ থেকে রক্ষা পেতে হলে অন্য তাপের সাহায্য নিতে হয়। তাপ দিয়েই জয় করতে হয় তাপকে। তাকেই বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকেই এ শরীরটা বলে তপস্যা করা।

সংসারে তাপ ভোগ করতে যে রকম কষ্ট, প্রথম-প্রথম ভগবানের নাম নিতেও সেইরকমই কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও এই কষ্ট দিয়েই ত্রিতাপ থেকে হওয়া যায় মুক্ত। কাজেই চাই চেষ্টা। চাই কর্ম। চাই ধৈর্য।

পশুপক্ষীর মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোনও গরজ নেই। শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে এই চেষ্টা, এই গরজ। জীবকে ভগবান অজ্ঞানের পরদা দিয়ে ঢাকলেও আবার জ্ঞানের দরজাও রেখে দিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে পরমবস্তু পেতে হলে, ভগবানকে লাভ করতে হলে উঠতে হবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের উপরে। যতক্ষণ জ্ঞান আছে ততক্ষণ অজ্ঞানও আছে। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি আছে। তখনও পাওয়া যাবে না ব্রহ্মকে। যখন লয় হয়ে যাবে সমস্ত ভেদজ্ঞান তখনই পাওয়া যাবে ব্রহ্মকে।'

এখন এই ব্রহ্মের স্বরূপটি কি?

সহজ করে বলছেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

মায়ের ভাষায়ঃ

'ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই এসে পড়ে অভাব। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন খণ্ড। তবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে বলা হয় সৎ চিৎ আনন্দ। তিনি আছেন তাই সৎ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। আর এই সৎ-এর জ্ঞান হলেই তিনি আনন্দ। সত্য বস্তু জানলেই আনন্দ। তাই সৎ চিৎ আনন্দ। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ ও নিরানন্দের ঊর্ধে।

ব্রহ্মকে কেউ বলেন আনন্দ। কেউ বলেন জ্যোতিঃ। কেউ বলেন রূপ। শাস্ত্র বলেন সচ্চিদানন্দ। শাস্ত্র বলেছে কতটুকু? শাস্ত্র কিরূপ? না ছাদে উঠবার সিঁড়ির মতো। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠলে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তার বর্ণনা শাস্ত্রে নেই। কারণ যে একবার ছাদে উঠেছে সে তো নিজেই সব দেখছে। যা দেখছে তার বর্ণনার দরকার নেই। পথের বর্ণনার দরকার। শাস্ত্রেও তাই আছে। তাই শাস্ত্রে তাঁকে বলে

সচ্চিদানন্দ। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা-ই বটেন, আবার তিনি তারও উর্ধে।

এই যে দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যায় এগুলিও সত্য। সবই সত্য আবার সবই মিথ্যা। এগুলি হলো সিঁড়ির ধাপ। এগুলি জীবের নানা অবস্থা। নানা ভাব। যখন যে ভাবে থাকা যায়, সেই অবস্থায় তা সত্য। পরে তা থেকে উর্ধে উঠলে ঐ ভাবেরও হয় লয়। একেবারে যে লয় হয় তা নয়। যেমন নীচের সিঁড়ি থেকে উপরের সিঁড়িতে ওঠা। নীচের সিঁড়ি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু যে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে তা না থাকারই মতো। এসব ভাবও ঠিক ঐরকম।

ভাবের রাজ্যে আমরা যখন থাকি তখন সব দেব-দেবী আমাদের কাছে সত্য। এই ভাবের রাজ্য ছেড়ে আমরা যখন সত্যের রাজ্যে যাই, তখন ভাব আমাদের মধ্যে লয় হয়ে যায়। দেব-দেবীরাও হয়ে যান মিথ্যা। আমাদে কাছে মিথ্যা হয় বলে যে সকলের কাছেই মিথ্যা হয়ে যায় এমন নয়। ত থেকেই যায়। এই অর্থে আবার দেব-দেবীও সত্য।

তাই বলি, ব্রহ্ম খণ্ড ও অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি, আবার অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন, আবার অখণ্ডতেও তি আছেন পূর্ণভাবে। যেমন আমার আঙুল স্পর্শ করলেও আমাকে স্প করা হয় অথচ আমি আঙুল নই। আমার কাপড় স্পর্শ করলেও আমাকে স্প করা হলো অথচ আমি কাপড় নই। আমার অংশ যেমন আমি, আমার সমগ্রও আমি। এক হয়েও তিনি বহু আবার বহু হয়েও তিনি এক। এটাই তাঁ লীলা। একটি বালুকণাতেও তিনি যে ভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেইভাবে পূর্ণ। আবার অখণ্ডতেও সেইভাবে পূর্ণ।

দুই ভাব তাতে সর্বদাই বর্তমান রয়েছে। বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন. আবার সেই প্রকাশ থেকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র আছেন। মানুষ ও স্বরূপে ব্রহ্ম যুগপৎ এই দুই ভাবই লাভ করতে পারে। যে জীবন সত্যই ভগবদ্জীব হতে চায় তাকে এইভাবের সমন্বয় সাধন করতেই হবে। ব্রহ্মের উপর উপলব্ধি করতে না পারলে সাধকের পাওয়া হয় না পূর্ণকে। যাত্রা হয় না শেষ।

তবে ইতর জন্তু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের মধ্যে আছে এ বিশেষ শক্তি যা দ্বারা সে পারে পূর্ণতা লাভ করতে। মানুষ তাকে বলে যার হয়েছে মনের হুঁশ। যার মনের হুঁশ হয়নি, যে সর্বদা বিষয়-বাসনা তন্ময় হয়ে থাকে, তাকে মানুষ বলে না। সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীও নয়। তা কোনোদিনই হবে না পূর্ণসিদ্ধি। পূর্ণানুভূতি।

যে মানুষ বহুকে একেরই বহুরূপ বলে দেখতে পারবে, সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। মৃত্যুকেও অমরত্ব ও অমৃতত্বে পরিবর্তিত করে মানবপ্রকৃতিকে তার দিব্যজ্যোতির ও চৈতন্যের প্রকাশক্ষেত্র করে তুলতে হবে সক্ষম। তিনিই তো হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ।'

এই ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ কেমন ?

সুন্দর একটি উপমা দিয়ে মা বলছেন :

'ঠিক যেন ভিজা কলসী। দূর হতে দেখলে জলে ভরা মনে হয়। কারণ জল ভরা কলসীই ভিজা দেখায়। সেই রকম ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা আনন্দ নহে। আনন্দ নিরানন্দের বাইরের এক অবস্থা। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

এই যে বহু বিচিত্র জগৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জগতের নিয়ন্তা কে ? বিশ্বাতীত এক পরম সত্য। এমন এক সত্তা যিনি জগতের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে থেকে নিজেকে করছেন রূপায়িত। ব্যক্তিরূপে উঠেছেন ফুটে। জ্যোতির্ময় এই প্রকাশের সূচনাকে আর্যঋষিরা পূজা করেছেন উষারূপে। এর পূর্ণতাকেই তাঁরা দেখেছিলেন সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদরূপে। ইনিই বিশ্বের সকল বোধ ও সকল চেতনাকে তুলছেন ফুটিয়ে। পরিচালিত করেছেন সকল বস্তুকে। ইনিই বিশ্ব সংসারের নিয়ন্তা। সচ্চিদানন্দ বিশ্বের অন্তরালে থেকে ইনি রয়েছেন চিরজাগ্রত।

এই চিরজাগ্রত বিশ্বাতীত পরম সত্যকেই শ্রীশ্রীমা বলছেন, 'নারায়ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।'

তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় না বাক্য দিয়ে। তিনি যে অবাঙ্মনসগোচর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। শিব ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি, প্রকৃতি এবং পুরুষ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এক। অভেদ। তাঁরা দুই নন।

তিনিই জগৎপিতা, পরম পিতা। আবার তিনিই জগৎমাতা, বিশ্বজননী। তাঁতে বিশ্ব, বিশ্বে তিনি।

আরও বিস্তারিত করা যাক।

চরম অবস্থায় তাঁতে ও বিশ্বে কোনোই ভেদ থাকে না। উভয়ই এক। সাধক সাধন পথে অগ্রসর হয়ে জ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্ত হলে বিশ্বের সঙ্গে আত্মার এবং আত্মার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধটি কি তা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারেন। যাঁরা প্রথম অবস্থায় বিবেকের পথে অগ্রসর হন তাঁদের বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন হলে তাঁরা নিজেকে বিশ্ব থেকে পৃথক বলেই অনুভব করে থাকেন। সাংখ্যের প্রকৃতি থেকে পুরুষের এবং বেদান্তের মায়া থেকে ব্রহ্মের বিবেক প্রসিদ্ধই আছে। বিশ্ব প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত সুতরাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান তাতে সন্দেহ নেই। পুরুষ অথবা আত্মা বদ্ধ অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকে। দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলে বিশ্ব থেকে নিজের পৃথক সত্তা উপলব্ধি করতে পারা যায় না। যখন আত্মা নিজের অপ্রাকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে বিশ্বাতীত চিৎস্বরূপ।

কিন্তু এই অবস্থায় সে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে তার বিশ্বাতীত স্বরূপেই স্থিতি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। পূর্ণত্বের আস্বাদন তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। পূর্ণ সত্তা অদ্বয়। তাতে প্রকৃতিও আছে পুরুষও আছে অথচ উভয়ের দ্বৈতভাব নেই। পূর্ণে প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর ভেদ বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থায় উপনীত হতে হলে যেমন পুরুষকে শুদ্ধরূপে জানতে হয়, তেমনি প্রকৃতিকেও তার নিজ স্বরূপে চিনতে হয়। তখন এই উভয়ই যে এক মহাসত্তার অবয়ব তা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। তারপর এই অঙ্গাঙ্গিভাব অথবা অবয়ব অবয়বিভাব থাকে না। একমাত্র পরমসত্তাই নিজের অখণ্ড প্রকাশে নিজের নিকট ভেসে ওঠে। এই অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে পুরুষ অথবা আত্মা এবং প্রকৃতি অর্থাৎ অনাত্মা বা মায়া অভিন্নরূপেই আত্মপ্রকাশ করে।

তাইতো সাম্যভাবের উদয় হলে বিশ্ব ও আত্মার পরস্পর ভেদ কেটে যায়। সাকার ও নিরাকার অভিন্ন প্রতিভাসে অদ্বয়রূপে ওঠে ফুটে। বিশ্বেও আত্মা আছে আবার আত্মাতেও বিশ্ব আছে, এই দর্শন যোগ্যপুরুষেই হয়। যোগ্যতার বিকাশ অধিক হলে বিশ্বও থাকে না আত্মাও থাকে না। উভয়ই অভিন্ন সত্তারূপে করে আত্মপ্রকাশ। এই-ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মানুভূতি। স্বয়ং প্রকাশ। পূর্ণ সত্তা।

কেমন করে লাভ করা যাবে এই ব্রহ্মকে? এই পরম পিতা কে? শ্রীভগবান নারায়ণ কে?

ব্রহ্ম তো লাভের বস্তু। উপলব্ধির বিষয়।

আনন্দময়ী মা বলে,—'কৃপা হলে'।

কৃপার 'কৃ' অংশে যদি ফাঁকি না থাকে তাহলে।

মা বলছেন :

'পাওয়াটা' আপনিই হয়ে যায়। চাওয়া মানেই পাওয়া। দুটো আলাদা জিনিষ নয়। চাইতে জানা চাই। চাওয়া হওয়া চাই আন্তরিক। পাবোই এই বিশ্বাস আন্তরিক এবং দৃঢ় হওয়া দরকার। তা না হলে ফল হয় না। পাথর ঘষতে-ঘষতে আগুন জ্বলে। কবে জ্বলবে কেউ পারে না বলতে। কিন্তু ঘষাটা চলতে থাকলে একদিন না একদিন জ্বলবেই। তেমনি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জল মিলবেই একদিন না একদিন। 'আগুন জ্বলবেই, জল মিলবেই'—এ-ভরসা নিঃসন্দেহ চিত্তে রাখতে হবে। তবেই কৃপার আবির্ভাব সুনিশ্চিত।'

চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা সাধনার বলেই ব্রহ্মলাভ হয়। যোগসাধনা।

সাধক আত্মযোগবলে পরমপুরুষকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে করেন উপলব্ধি। সব কিছুই অবশ্য কৃপাসাপেক্ষ। চরম অবস্থায় তাঁতে ও বিশ্বে কোনোই ভেদ থাকে না। উভয় এক।

তাইতো আনন্দময়ী মা বলেন :

'কেবল শিশুর মতো চাই বিশ্বাস। অভ্যাসের দ্বারা গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ভিত্তি। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনায় সত্যিকার ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি প্রকাশ পান ফলস্বরূপে।

ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তাহলে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তিনি তো হাত বাড়িয়েই আছেন। তোমরা একবার হাতটি ধরলেই তিনি কৃতার্থ।

ব্যাকুলতার সঙ্গে-সঙ্গেই আসে ভাবাবেগ। ভাবাবেগের সাথে-সাথেই ভাবোন্মাদনা। আর সেই ভাবোন্মাদনাই সাধনার চরম অবস্থা।'

সাধনার চরম অবস্থা সম্বন্ধে মা বলছেন আরও বিশদ করে :

'চিত্ত সমাধান কতকটা শুষ্ক কাঠে আগুন জ্বালানোর মতো। ভিজা কাঠ হতে জল শুকিয়ে গেলে যেমন ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলতে থাকে, সেই রকম উপাসনার ঐকান্তিকতায় বাসনা কামনার রস যখন চিত্ত থেকে যায় কমে, তখন চিত্ত হয়ে পড়ে হালকা। সেই অবস্থাকে বলে ভাবশুদ্ধি। এই অবস্থাতেই জন্মে ভাবোন্মাদনা।

এর পরের ভূমি ভাব সমাধান। যেমন পোড়ানো কাঠ কয়লা। একই

সত্তার এক অখণ্ডভাবের তন্ময়তায় শরীর অবশ হয়ে পড়ে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা সাধক জড়ভাবে সময় অতিক্রান্ত করে দেয়, অথচ অন্তরের গুহায় ভাবপ্রবাহ চলতে থাকে অক্ষুণ্ণভাবে। যেমন একটি আধারে আয়তনের বেশী জল ঢালতে গেলে তা পূর্ণ হয়ে অতিরিক্ত জল উপচিয়ে পড়ে যায়, তেমনি অখণ্ডভাবের দ্যোতনায় চিত্ত ছাপিয়ে তার ভাবাবেগ বিশ্বময় বিরাট স্বরূপে বিগলিত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ভূমির নাম ব্যক্ত সমাধান। যেমন জলন্ত কয়লা। ভিতরে একাকার অগ্নিদীপ্তি। জীব এই অবস্থায় এক সত্তাতে বিরাজ করে স্থির ভাবে। পূর্ণ সমাধান অবস্থায় সাধকের সগুণ নির্গুণের দ্বন্দ্ব চলে যায়। যেমন জলন্ত কয়লার ভস্মের আগুন। সাধক এই অবস্থায় এক অনির্বচনীয় ভাবে স্থির হয়ে যায়। অন্তরে বাইরে থাকে না কোনও ভেদাভেদ। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ অবস্থা। সকল ভাবের স্পন্দন এই অবস্থায় হয়ে পড়ে অস্তমিত।'

সাধক দিনের পর দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকেন।

সমাধি কাকে বলে?

শ্রীশ্রীমা আরও সহজ করে বলছেন:

'সর্বপ্রকার কর্ম ও ভাবের পূর্ণ সমাধানের নাম সমাধি। জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত অবস্থা। তোমরা যাকে বলো সবিকল্প। তাও ঐ শেষ অবস্থায় পৌঁছবার জন্য। উহাও সাধনা জানবে। প্রথমতঃ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের যে কোন একটি তত্ত্ব, বস্তু বা বিচার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সেটিকে নিয়েই দেহ জমে যায়। তারপর এই লক্ষ্যটি সর্বময় হয়ে অহং জ্ঞানকে ক্রমশঃ একে লয় করে একই সত্তায় করে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অবস্থা যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখন এর শেষ পরিণতিতে সেই একক সত্তাটিও কোথায় হয়ে যায় বিলীন। তখন কি থাকে বা না থাকে তা বুঝবার কোনো ভাষা বা অনুভূতি আর থাকে না। যেমন প্রদীপ জলছে। কেমন জ্বলছে—না স্থির নির্বাত দীপ শিখাবৎ।'

প্রকৃতিই মায়া। মহামায়া। যোগমায়া। মহামায়া শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা ইচ্ছারূপা শক্তি। যোগমায়া মানেই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্তাত্মা। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিও তাই। আর মায়ী হলেন মহেশ্বর। প্রকৃতির সাধ্য নেই পুরুষ ছাড়া কাজ করে। তাই তো পুরুষ এবং প্রকৃতি। মায়া এবং মায়ী!

'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তুমহেশ্বরম্।'

আবার এই প্রকৃতিই মায়ারূপে জগৎ সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে। সংসার বন্ধনই মায়ার বন্ধন। মায়া মানুষের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। এই সংসারে নিবদ্ধ থেকে মানুষ সুখের অন্বেষণ করছে। পতঙ্গ যেমন বার বার ধাবিত হয় অগ্নির দিকে, মানুষও তেমনি বার বার সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে সুখের আশায়। শান্তি পাওয়ার আকাঙ্খায় ব্যর্থ হয়ে আবার যাত্রা করছে নূতন উৎসাহে। অবশেষে প্রতারিত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করছে।

এই তো মায়া।

কেমন করে অতিক্রম করবে এই মায়ার বন্ধন? এ তো আর সহজ কথা নয়। জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক মানুষ তো জানেই যে সে বন্দী।

তাই আনন্দময়ী মা বলেন:

'—বন্ধন জ্বালা অসহ্য হলেই মুক্তির পথ পাওয়া যায়। মায়ার বন্ধন টুটে যায়।'

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন শ্রীশ্রীমা।

'এক ছিল রাজা। সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। দেশ জুড়ে ছিল তাঁর সুনাম। আর ক্রোশ জুড়ে ছিল তাঁর সোনার রাজপুরী। তবুও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। মানসিক অশান্তি নিয়ে দিনাতিপাত করছিলেন।

লোকমুখে শুনলেন গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায়। তাই তিনি খোঁজ করতে লাগলেন কুলগুরুর। এতদিন কুলগুরুর কোনোই খোঁজ ছিল না। গুরু অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। রাজা স্মরণ করেছেন জেনে খুবই আনন্দিত হলেন। গুরু এসে রাজাকে আশ্বাস দিলেন মন্ত্র নিয়ে জপতপ করলেই শান্তি পাওয়া যাবে। তারপর শুভদিন দেখে রাজাকে দিলেন মন্ত্র। এই উপলক্ষে গুরুর আর্থিক অবস্থাও ফিরে গেল।

দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছর ঘুরে এলো। রাজা নিয়মিত জপতপ করছেন। কিন্তু কোথায় শান্তি? শান্তি পাচ্ছেন না রাজা। আবার ডাক পড়লো গুরুর। রাজা বললেন গুরুকে, আপনার কথামতো মন্ত্র নিয়েছি। যথারীতি জপতপ করছি, কিন্তু শান্তি তো পাচ্ছি না। আপনাকে সাতদিন সময় দিলাম। যদি এর মধ্যে শান্তির পথ বলে দিতে পারেন তবেই নিস্তার। নইলে আপনার পরিবারস্থ সকলেরই প্রাণদণ্ড হবে।

মহা সমস্যায় পড়লেন গুরু। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না। আহার নিদ্রা বন্ধ হলো। আসন্ন মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

গুরুর ছিল একটিমাত্র পুত্রসন্তান। সেও মূর্খ। লেখাপড়ায় মন ছিল না। সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। শুধু আহারের সময় বাড়ী ফিরতো। এদিকে একদিন-একদিন করে ছয়দিন অতিক্রান্ত হলো। সাতদিনের দিন গুরুর বাড়ীতে আর রান্না খাওয়ার লক্ষণই দেখা গেল না। দুশ্চিন্তায় গুরু ও তাঁর স্ত্রী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রইলেন। ছেলেটি বাড়ী ফিরে দেখে রান্না খাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। বাপ-মা চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

অবশেষে বাপ-মার নিকট থেকে সবকিছু শুনে মহানন্দে নৃত্য করতে লাগলো। তারপর হাসতে হাসতে বললো, এইজন্য তোমাদের এত দুশ্চিন্তা। এতদিন আমায় বলোনি কেন? যাই হোক আমি আগামীকাল রাজাকে শান্তির পথ বলে দেবো।

ছেলের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে গুরু ও গুরুপত্নী আহারাদি করলেন। তবুও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। পাগল ছেলে যে!

রাত্রি অবসানে দিবসের হলো আগমন। এলো সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। গুরু মূর্খ ছেলের হাত ধরে রাজবাড়ীতে এসে হাজির হলেন। তারপর রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজ পুত্রকে দেখিয়ে বললেন, মহারাজ আমার এই পুত্রই আপনাকে শান্তির পথ বলে দেবে।

এবারে রাজা বিদ্রূপের হাসি হেসে গুরুপুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন,

পারবে? পারবে আমাকে বলে দিতে শান্তির পথ? না হলে কি শান্তি পাবে জানো নিশ্চয়?

প্রত্যুত্তরে গুরুপুত্র নির্ভয়ে বললো, হ্যাঁ মহারাজ, আমি পারবো আপনাকে শান্তির পথ বলে দিতে। তবে আপনাকে আমার কথা মতো এখনই একটা কাজ করতে হবে।

রাজা গুরুপুত্রের সাহস ও সরলতা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বললেন, বেশ—বেশ, বলো তোমার অভিরুচি। আমি তোমার নির্দেশিত কাজ করতে এখনই প্রস্তুত। কোনোরকম আপত্তিও করবো না।

অবশেষে রাজা কৌতূহলবশতঃ গুরুপুত্রের নির্দেশমতো গোপনে পিতা-পুত্রের সাথে নিকটস্থ এক জঙ্গলে প্রবেশ করলেন।

এবারে গুরুপুত্র নিজ পিতা ও রাজাকে বৃক্ষের সাথে বেঁধে নিজে অন্য একটি বৃক্ষে উঠে আনন্দে গান করতে লাগলো।

রাজা এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে, আর বন্ধন জ্বালায় অস্থির হয়ে গুরুপুত্রকে আদেশ করলেন বন্ধন মুক্ত করতে। কিন্তু গুরুপুত্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আরও দ্বিগুণ স্বরে গান করতে লাগলো।

রাজা তখন আদেশ করলেন গুরুকে বন্ধন মুক্ত করবার জন্যে।

প্রত্যুত্তরে গুরু বললেন, মহারাজ আমি নিজেই যে আবদ্ধ, আপনাকে কিরূপে মুক্ত করবো।

রাজা এই অভাবনীয় ব্যাপারের সম্মুখীন হয়ে রাগে দুঃখে ও অপমানে অধীর হয়ে মুক্ত হওয়ার চিন্তা করতে লাগলেন। অকস্মাৎ দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, তাইতো বন্ধনের মধ্যে থেকে আমি শান্তির আশা করি কি করে? আর যিনি নিজেই বদ্ধ, তিনিই বা আমাকে কেমন করে মুক্ত করবেন? আমি রাজত্ব করে, বিষয়জালে আবদ্ধ হয়ে শান্তির আশা করছি! মুক্তি কামনা করছি! আমার মতো মূর্খ কে?

এবারে রাজা ধীর কণ্ঠে গুরুপুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! তুমি মূর্খ হলেও জ্ঞানী। অশেষ ধন্যবাদ তোমায়। এখন আমি শান্তির পথ দেখতে পেয়েছি। তুমি আমায় এই সাময়িক বন্ধন থেকে মুক্ত করো!

গুরুপুত্র মৃদু হেসে বৃক্ষ থেকে অবতরণ করে পিতা ও রাজাকে মুক্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

রাজা আনন্দিত চিত্তে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। আর সংসারে ফিরলেন না। রাজ্য ও সংসার ত্যাগ

করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। যাত্রা করলেন তাঁরই সন্ধানে, যাঁকে জানলে সবকিছু জানা যায়, আর যাঁকে পেলে সবকিছু পাওয়া যায়।'

আনন্দময়ী মা বলেন :

'এই মুক্তি লাভের জন্য সকলকে সংসার ছেড়ে জঙ্গলে যেতে বলছি না। এই সংসারে থেকেই সংসার ত্যাগ করতে হয়।

সংসার তাদের কাছেই তাপময়, যারা সং কে সার করেছে। আর যারা জানে আমরা সং সেজে আছি মাত্র। আমাদের প্রকৃত রূপ এটা নয়। সংসার তাদের তাপ দিতে পারে না। ত্রিতাপ জ্বালা এড়াবার জন্যই তপস্যা করতে হয়। তপস্যা মানে আমি তো বলি—তাপ+সহা। এক তাপ দিয়েই আর এক তাপ নষ্ট করা যায়।

শুদ্ধ বন্ধন নিলেই অশুদ্ধ বন্ধন কেটে যায়। পরে সবই চলে যায়, সব বস্তুতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সন্তান সন্ততি সকলের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করো। এই জগৎ যে ঈশ্বর পূর্ণ। তোমার দুর্বল মনের উপর স্থাপিত জগতের ধারণা ত্যাগ করো। তাহলেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হবে। মুক্তি পাওয়া যাবে। অখণ্ড শান্তি লাভ করতে পারবে।'

আরও সরল করে মা বলছেন :

'যতক্ষণ বন্ধনের জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে ততক্ষণ বন্ধন আছে। এই বুদ্ধি চলে গেলে কর্মবন্ধনও দূর হয়। সবই তো ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে। তা অনুভব করতে পারলেই মুক্তি।'

ঈশ্বর দেখতে কেমন? সাকার না নিরাকার? সগুণ না নির্গুণ?

মা বলছেন :

• 'সাকার মানে কি? —না স্বয়ং স্ব-ক্রিয়ারূপে যে আকারান্বিত সেই

সাকার। আকার মানে আ-কার। স্বয়ংই কার্যরূপে আকারেও আছে। আর নিরাকার মানে? কার নাই অর্থাৎ কার্য নাই যেখানে। অতএব তার আকার নাই। আবার নীর মানে জল! এই জলকে যেখানেই রাখো সেই আকারই ধারণ করে। নিজের কোনও আকার নাই। আবার বরফ কি? বরফে কি আছে? সেই জলই আছে। কিন্তু বরফের আকার আছে। কাজেই আকার নিরাকার বলে কিছু নেই। আকারও তিনি আবার নিরাকারও তিনি। তিনি রূপ ধরুন না ধরুন যা' তাই। সেই স্থিতিতে ঐ ভিন্ন আর কিছুই নাই—যা'—তা' জগৎ দৃষ্টিতেও দেখলে তো, আসলে কি পেলে, দেখো। যেখানে তুমি আকার রূপেতে পেলে, নিরাকার রূপে পেলে। আবার তাকেই এই চিন্তায় ধরা যায় না, সেটাও তুমি পাবেই। এর ভিতরে যে সকাম সগুণ রূপেতে প্রকাশিত নিত্য যিনি আছেন। আবার নিরাকার নির্গুণ গুণ অগুণের কোনোই প্রশ্ন নাই। শুদ্ধ অদ্বৈত। তোমরা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বলো না। শুদ্ধা দ্বৈত যেখানে-সেখানে কোনো রূপ গুণ ভাব অভাব কোনো প্রশ্ন দাঁড়ায় না। যদি বলো এইটাই তিনি, এটাও তিনি। তবে ও'র মধ্যে রয়ে গেলে 'ও' আলাদা মেনে নিলে। সে, ও আর কোনো প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে একমাত্র। যেখানে নির্গুণ ব্রহ্ম, গুণাগুণের প্রশ্ন নাই সেখানে একমাত্র আত্মা। দেখো, যেখানে স্বগুণ, আকার রূপেতে মানছে। একাগ্র সেই আকার রূপেতে এখানে আর অরূপের কথা দাঁড়াবে না—। এই একটা স্থিতি। সেখানে সগুণও বটে, নির্গুণও বটে। সেখানেও একটা স্থিতি। চিন্তা করে বের করা যায় না—সেই যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সেও একটা স্থিতি। আবার যে বৈদিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির দিক দিয়ে এলো এই যে বলা হলো সব সেই স্থিতিতে সেই সেখানে পূর্ণ। পূর্ণের থেকে পূর্ণ গেলেও পূর্ণই থাকে। বাদ দিয়ে কিন্তু নয় সম্পূর্ণ নয়, বাদাবাদী তাঁর মধ্যেই। যে লাইনেই যে চলুক রকমারী ভিন্ন মাত্র। সবটার মধ্যেই মন্ত্র আছে। ভাব আছে। ত্যাগ আছে। গ্রহণ আছে। পাবে কি? —সেই নিজেকেই তো। নিজ কে?-প্রভু দাস, পূর্ণ অংশ, আত্মা যে যে লাইনে চলো স্বয়ং তাঁকেই পাওয়া নিজেকে পাওয়া।

দেখো, স্বয়ং ভগবান যেখানে মান্‌লে সেখানে ভগবৎ শক্তি। ভগবতী—ভগবান—স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ হিসাবে দেখছ তো। স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের প্রশ্ন তো থাকে না। সে স্থানও তো আছে, আবার আলাদা-আলাদা করে পাওয়া যায় সে স্থানও আছে। কুমারী কারো অধীন নয়—সে স্বয়ং সেই ঐ শক্তিরূপিণী। শক্তিই যেখানে মান্‌লে সেখানে কি, না সত্তা রূপেতে। স্বরূপা এবং অরূপা, শুধু

শক্তিই তাঁর এক রূপ, এও কিন্তু। যেখানে ভাব আর ক্রিয়ার প্রকাশ সেখানেই রূপের প্রকাশ—এও। আবার শক্তিরূপেই যদি বলি স্বয়ং ভগবতী। তাঁর যে অনন্ত শক্তির প্রকাশ রয়েছে। আবার মহাশক্তি যা মূল সৃষ্টি স্থিতি লয়। বৃক্ষের মতো শাখা-প্রশাখা। মূল থেকে সেরূপ শাখা-প্রশাখা।···কত দেব দেবী সেই শক্তির নানা প্রকাশ। শিবের শিবত্ব, নির্বিকার সব মানে মৃত্যুর মৃত্যু যেখানে সেখানে অমৃত নাম শিব। সৃষ্টি স্থিতি লয় যেখানটায় পাচ্ছ, সৃষ্টি রূপেতে সেই হচ্ছে স্থিতি রূপেতে সেই স্বয়ং মহাবিষ্ণুর দিক যা বলো, আলাদা-আলাদা স্থান হিসাবে স্বয়ং সেই সেইরূপ। প্রকাশ নানাভাবে এবং অরূপে। একেতে অন্য সবই বিভিন্নেতে সেই এক দেখো। যেমন একরূপ দেখলে অন্যরূপ দেখতে পাও না।

কিন্তু এক এক রূপেতেই সর্ব, সর্বরূপেতেই সেই এক। শূন্যেতে পূর্ণ। পূর্ণেতে সেই শূন্য। রকমারী দিক। মূল সেই তো প্রকাশ স্থূল। অন-অন্ত—এক-এক দিক দিয়ে বলতে গেলেও অন্ত কোথায় হবে। যতটুকু ততটুকু অন্তেরও দিক। সত্তারূপে কি ? সেই আত্মা পরমাত্মা যা বলো।

ভগবান যেখানে মান্‌লে, ভগবৎ শক্তি মান্‌লে, ঈশ্বর ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য ইত্যাদি তো তিনিই। আচ্ছা তাহলে ভগবান অকর্তা। কেন না তিনি তো ক্রিয়া করেন না। কার্য করেন তবেই না তার কর্তা। সর্ব কার্য কারণ রূপেতে যিনি স্বয়ং কার্য কারণের কর্তা-অকর্তার প্রশ্ন কোথায় ? অতএব তিনি এখানে অকর্তা। তাঁর মায়া যেখানে, ঐশ্বর্য, ঐশ্বরীয় শক্তির বিকাশ যেখানে, মন্ত্র রূপেতে সেখানে সেই প্রকাশটি কে ? সেই তো হ্যাঁ। চল, অচল তোমাদের যে একদেশ দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে আবরণ রূপেতে। কর্তা-অকর্তা রূপেতে তোমরা যা বলছ তোমরা কর্তা-অকর্তা রূপেতে যেখানে নিবদ্ধ বলেছ সেই দৃষ্টিতে ভিন্ন আসা স্বাভাবিক—যা বলো তাই। অতএব সেই ভাবেতে সেরূপ দেখাটা। দৃষ্টি সৃষ্টির ভঙ্গিতে।

আবরণ পর্দা যতক্ষণ ততক্ষণ এই যে একদিক দেখা, শোনা—এইটা নষ্ট না হলে ঐ প্রকাশ কোথায় ? অতএব নাশ, নাশে যা এত সব দিক রূপেতে আছেন সেই তিনি। তিনি স্বয়ং সর্বরূপে, অরূপে নানাভাবে প্রকাশিত।'

ঈশ্বর কেমন তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই জেনে নিলে হয়! তাহলে তো ঈশ্বরের খুব কাছে যেতে হয়।

তিনি তো আছেনই। তিনি থাকলে আমি কই ? তিনি আছেন আমার

খুব কাছে—আমাকে ছুঁয়ে। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে—তিনিই আমি। আমিই তিনি। তিনি দুইটি নন। তিনি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ। এই ভাবটি খুব উচ্চস্তরের। এই ভাবকে তোমার নিকটে, খুব নিকটে নিয়ে এসো যতদিন না তুমি বুঝতে পারো ওটাই তোমার আত্মার অন্তরাত্মা স্বরূপ। শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয় প্রত্যক্ষ করা। অন্তরাত্মাকে দর্শন করা। স্পষ্টভাবে তাঁকে উপলব্ধি করা। তাহলেই ঈশ্বরের খুব কাছে যাওয়া হলো। তাঁর স্বরূপ জানা হলো।'

'এখন এই ভাবটা আনবার জন্য কি করতে হবে ?

'নিরন্তর জপ করতে হবে। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততটা নিষ্ঠা বাড়বে। বহুদিকে মন না দিয়ে একাগ্র হওয়া। ভয় ভাবনা কেন ? তিনি আমার কাছে নাই—এই ভাবটার জন্যই তো। তিনি আছেন। খুব কাছেই। তিনি ধরে আছেন ভয় কি ? অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায় ?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না। দুশ্চিন্তা কেন হয় জানো ? ভগবানকে দূরে রাখলেই দুশ্চিন্তা হয়। দুর্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখার নাম দুর্বুদ্ধি। হাতে কাজ করে মনে-মনে সর্বদাই তাঁর নাম করতে হয়। হাতের কাজ হলো মুদ্রা. ঐ মুদ্রায়ই তাঁর নাম করা। অজ্ঞানের পরদা যেমন আছে আবার জ্ঞানের দরজাও তো আছে। চেষ্টা করলে দেখা যায়। চাই ব্যাকুলতা। এমন ব্যাকুল হওয়া চাই যেন ঘরে আগুন লেগেছে, বের হতেই হবে। আর থাকা যায় না।'

এই ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ? ভগবানকে ভালবাসলে। রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ছিল রাধাভাব। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পদব্রজে বৃন্দাবন ধামে চলে গিয়েছিলেন। ভগবানের জন্য যে বিরহ তাও সুখই। তাঁকে ভালবাসতে পারলে তো তবে তাঁর জন্য বিরহ হবে। বিরহ মানে কি ? না, বি-রহ ; অর্থাৎ বিশেষভাবে থাক। মানে ভগবান যাঁর মধ্যে বিশেষভাবে রহেন তাঁরই বিরহ হতে পারে।

এ হলো মধুর ভাবের সাধনা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেছিলেন। সে কৃষ্ণ কে ? ব্রজনাগর শ্রীমদনগোপাল ! ব্রজের যুগল শ্রীরাধা-মদনগোপাল। প্রেমাশ্রু নির্গত হলে এই কৃষ্ণকে নয়নগোচর করা যায়।

ভক্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দেন। ভাবে বিভোর হয়ে ভক্ত ভগবানকে নয়নগোচর করেন।

তাইতো ভগবান ভক্তের কাছে সাকার। আবার জ্ঞানীর কাছে নিরাকার। নিরাকারও আছে আবার সাকারও আছে। সগুণও বটেন, নির্গুণও

বটেন। দুই বলো, এক বলো, অনন্ত বলো, যে যা বলে সব ঠিক।'

শ্রীশ্রীমা আরও বিশদ করে বলছেন:

'জগৎ ভাবময়। সৃষ্ট বস্তু সকলই ভাবের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগ্রত করে তুলতে পারো, দেখবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই একই খেলা চলছে। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, তাই বুঝতে পারে না প্রকৃততত্ত্ব।

সর্বধর্মই এক ধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।'

ঈশ্বর এক হয়েও বহু। অনন্ত। অসীম। বিচিত্র। বিবিধ। এই ভাবটাই মা আনন্দময়ী নানাভাবে প্রকাশ করছেন।

'ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ রয়েছেই। যদি সেটা বুঝতে না পারো, তুমি তাঁর সাথে একটা সম্বন্ধ পাতাও। তাঁকে পিতা বানাও, মাতা বানাও, পুত্র বানাও—যা তোমার ইচ্ছা। তাঁকে ছাড়া তো জগতে কিছুই নেই। সুখও নেই।

ভগবান আসবেন, ভগবানকে পাবো—এ ধরনের প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান তো রয়েছেনই আমার মধ্যে, আমি তাঁকে পেয়েছি, আমিই তো তিনি। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। তিনি ছাড়া যে কিছুই নেই। সব এক। সেই যে তোমরা কি একটা বলো অল ওয়ান (all one) না কী? সেই।

তাঁর ভাবের মধ্যে তোমার সকল কামনা ডুবিয়ে দাও, তিনি আপন স্বরূপে দেখা দেবেন।'

বদ্ধজীব সংসার নিয়ে মত্ত। তারা ভগবানকে চায় না, পেলেও সহ্য করতে পারে না। তাদের রুচিতে বিষয়-সুখই প্রিয়তর। বিষয় ছাড়তে হলে তারা অসন্তুষ্ট।

একটি গল্পের অবতারণা করলেন আনন্দময়ী মা।

শ্রীভগবানের আদেশে একদিন নারদ মর্ত্যধামে অবতরণ করে এক শূকরীকে বৈকুণ্ঠবাসের নিমন্ত্রণ করলেন।

শূকরী তার স্বামীকে এই সমাচার জানিয়ে বললো, চলো না দিনকতক চেখে ঘুরে আসি বৈকুণ্ঠে।

সুবিজ্ঞ শূকর-পুঙ্গব বললেন, তাইতো! বৈকুণ্ঠে খাদ্যদ্রব্য কি রকম পাওয়া যাবে সেটা তো নিশ্চিত করে জানা দরকার প্রথমে।

একথা শুনে নারদ বললেন, বৈকুণ্ঠে কারও কোনও চিন্তা নেই। তোমরা স্বয়ং নারায়ণের অতিথি, তোমাদের অন্নচিন্তা থাকবে এ একটা কথা! চলো আমার সঙ্গে! তোমরা মহানন্দে থাকবে বৈকুণ্ঠে—সেখানে সবকিছু সুন্দর, সবকিছু পবিত্র।

তখন বরাহ-প্রবর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের প্রিয় খাদ্য বিষ্ঠা নিত্য পাবো তো? নারদকে স্বীকার করতেই হলো যে উক্ত বস্তু বৈকুণ্ঠে দুর্লভ।

তৎক্ষণাৎ বরাহ-দম্পতি সমস্বরে নারদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করল।

অনবদ্য এই গল্পটি, রস ও রহস্যে ভরপুর।

সংসারী লোকের সংশয় দূর হয় না। সত্যিই কি তিনি আছেন? সত্যিই কি তাঁকে দেখা যায়? প্রমাণ দাও। দেখাও।

মা খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র (ভাইজী)-কে:

'দেবদেবীর সত্তা আমার তোমার দেহের মতো সত্য এবং ভাবের চোখে তাঁদের দর্শনলাভ হয়।

অশ্রুধারায় নিজেকে করো অভিষিক্ত। তিনি দর্শন দেবেনই। চাই ক্ষুধা। তীব্র ক্ষুধা, আর দর্শনের জন্য হৃদয়ভেদী অস্থিরতা। কিন্তু বিষয় বাসনায় উদ্বেলিত জীবের সে ক্ষুধা হওয়া বড়ই কঠিন, যতদিন প্রাণের উত্তাল সংস্কার-তরঙ্গগুলি তাঁর চরণতলে গিয়ে না অবসিত হয়, ততদিন প্রয়োজন সাধনার। একাগ্রতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে জীবাত্ম ব্রহ্মকে দর্শন করেন।'

মা আরও বিশদ করে বলছেন:

'একেবারে শুদ্ধ হলেই সিদ্ধ হয় এবং তখন জীবাত্ম সব সিদ্ধ দর্শন করে। সিদ্ধি বলতে কি বুঝায়?

সিদ্ধিও অনেক প্রকারের আছে, যেমন অষ্টসিদ্ধি, কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা। সিদ্ধিলাভ করলে কি দেখে? এ শরীরটা বলে সিদ্ধিলাভ করলে সিদ্ধই দেখে, যেমন আলু সিদ্ধ, পটল সিদ্ধ। (ভক্তরা হাসছেন) হাসবার কথা নয়। এটাই সত্য।

সে দেখে যে সব 'আমি' অথবা সব 'তুমি'। আবার 'আমি', 'তুমি', জগৎ সব একের মধ্যে লয় পায়। একেই ভগবান লাভ বা ব্রহ্ম দর্শন বলে।

অনুভূতির বিষয়। প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। কৃপাসাপেক্ষ। যতক্ষণ মানুষ অভাবের স্বভাবে থাকে ততক্ষণই এসব দর্শন স্পর্শন হয়। স্বভাবে স্থিতি হলে সবই একাকার হয়ে যায়।

আরও স্পষ্ট করে বলছেন মা :

'আমরা এখন অভাবে আছি। এটাই এখন আমাদের স্বভাব হয়েছে। যেমন আমাদের ক্ষুধা লাগে, আমরা অভাব বোধ করি, পরে খেলে অভাব দূর হয়। তখন আবার ঘুমের অভাব বোধ করি। ঘুম থেকে উঠে আবার বেড়াবার, গল্প করবার অভাব বোধ করি। এইরূপ একটা না একটা অভাব আমাদের লেগেই আছে। আমরা এই অভাবেই স্থিতি লাভ করেছি। একেই বলে অভাবের স্বভাব। এ-থেকেই স্বভাবে যেতে হয়। স্বভাবে যাবার ক্ষমতা মানুষের আছে। এই জন্যই বলা হয় মানুষের মধ্যে যেমন আছে অজ্ঞানের পরদা, তেমনই আছে জ্ঞানের দরজা। জ্ঞানের দরজা দিয়েই লোক স্বভাবে যায়, স্থিতি লাভ করে।

সেই জন্যই এ শরীরটা বলে সর্বদা নাম করতে থাকো। যেদিন চলে যায় সেদিন আর আসবে না। কিছু হলো না বলে নিরাশ হতে নেই। কারণ কিছু হলো না এই ভাবই প্রমাণ করছে যে কিছু হচ্ছে। চাই কেবল অভাব বোধ। আমার নাম হচ্ছে না আমি ঠিক মতো নাম করতে পারছি না, কি করলে আমি ঠিক মতো নাম করতে পারবো? এইরকম খুব একটা অভাব বোধ হলেই সিদ্ধি হাতের কাছে এসে পড়ে!

চাই ক্ষুধা। নাম করতে-করতেই ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়; ক্ষুধা না থাকলে তোমরা যেমন ঔষধ খেয়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করো, ভগবানের নাম করাও সেইরকম।

লক্ষ্য স্থির হলেই, চিত্ত স্থির হবে। নাম করতে-করতেই চিত্ত ও লক্ষ্য উভয়ই স্থির হবে। "হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা"।

'ভগবৎ প্রাপ্তির কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধি। জ্ঞানে ও ভাবে গেলেই খুলে যায়। যেখানে গেলে কর্ম কর্মের ইচ্ছা, কর্মের ভাব ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সমাপ্ত হয়ে যায়। কর্ম এবং ভাবের সমাধানই সমাধি। এখানে ভাব বলতে ভগবৎ ভাব বুঝায় না। কারণ ভগবৎ ভাবের সমাধানের তো কোনো অর্থই হয় না। এটা তো সব সময়ই আছে। এখানে ভাব হলো সেই ভাব যা ভগবৎ স্থিতির বিঘ্ন করে এবং মনকে করে বহির্মুখ। আর যা কিছু দৃষ্টিতে আসে তাই কর্ম। তোমরা দৃষ্টি সৃষ্টি বল না? ভাব এবং অভাব দুই-ই এক।

যেখানে অনুভব বলা হয়। সেখানেও একটা স্থিতি আছে। যোগী ঘরে বসে ধ্যান করছে, তখন যদি সে শূন্য অনুভব করে তবে বাইরে থেকে কেউ দেখলে সে ঘর শূন্যই দেখবে। শূন্যের পরে শরীর ধারণ করাও এক যোগক্রিয়া। এই যোগক্রিয়াই তো সাধনা। সব কিছুই ভগবান লাভের জন্য।

সাধনা তো অনন্ত। তিনিই সাধনারূপে অনন্ত। তবে কেমন করে আশা করা যায় যে সাধনা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে? এই জন্য তিনি বুদ্ধির ওপারে দুর্জ্ঞেয়। আবার সাধনা যদি কেহ তীব্রভাবে করে তবে তাঁর প্রকাশ হতেই হবে। যেমন পাথরে পাথর জোরে ঘষলে আগুন জ্বলবেই।

আবার কখন-কখন অল্প সাধনাতেও তাঁর প্রকাশ হয়। এও হতে পারে যে সে জন্ম জন্মান্তর ধরে সাধনাই করছে, কারণ তার সাধনাতেই আনন্দ। সময় সময় যে প্রকাশ হচ্ছে, তাতেই মগ্ন হয়ে আছে! যেমন তৃষ্ণাতুরের জল পেলেই আনন্দ। সেইরকম মন্দির এবং তীর্থাদির প্রকাশেই সাধকের আনন্দ। কর্মেতে ক্রমকৃপা হতে থাকে। এটা হলো ক্রমকৃপা কর্মানুযায়ী। আবার হয় অহৈতুকী কৃপা! ক্রমের স্বরূপ তা নয়। এই জন্যই বলা হয় সাধনা অনন্ত। কাজেই তাঁকে পাওয়ার ঠিকানা কোথায়? এইজন্যই কৃপা। ভগবৎ প্রাপ্তি কৃপা সাপেক্ষ।'

কিন্তু বিপদ হলো বিষয়ী মানুষদের নিয়ে। তারা নিজেদের পাত্রটিকেও উল্টো করে রেখেছে। কৃপা ধারণ করবে কিসে? শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সংসারই তাদের একমাত্র কাম্য। বিষয়ী মানুষ সংসার ছেড়ে বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ।'

এই প্রসঙ্গে মা আবার একটি গল্পের অবতারণা করলেন:

'ভগবান নারায়ণ একদিন নারদকে বললেন, দেখো নারদ, সংসারী জীব শত কষ্ট পেলেও বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করতে ইচ্ছুক হয় না। শ্রীভগবানের এই কথা নারদ ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই পরীক্ষা করবার মানসে মর্ত্যলোকে চলে এলেন। এবং বৈকুণ্ঠ-যাত্রীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অকস্মাৎ এক বৃদ্ধ শেঠজীর সাক্ষাৎ পেলেন। তখন নারদ মনে মনে ভাবলেন, এই শেঠজী তো জাগতিক সমস্ত সুখই ভোগ করেছেন। অর্থ পুত্র পৌত্র তার সবই লাভ হয়েছে। কাজেই একে বললে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে যাবে।

অবশেষে নারদ শেঠজীকে বললেন, শেঠজী আপনি তো সংসারের সমস্ত সুখই ভোগ করেছেন, সুতরাং এখন সংসার-মায়া ছেড়ে চলুন বৈকুণ্ঠে।

প্রত্যুত্তরে শেঠজী বললেন, ঠাকুর, আপনি যা বললেন তা যথার্থ। আমি

বৃদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী এখনও যুবতী আছেন। পুত্র ও পুত্রবধূরাও বর্তমান। আর আমার ছোট ছোট পৌত্ররাও আছে। ওরা এখনও লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়নি। ওরা উপযুক্ত হয়ে বিবাহ করলেই আমি বৈকুণ্ঠে যেতে পারি। তখন আর আমার কোনরূপ বাধা থাকবে না বৈকুণ্ঠ-ধামে যাওয়ার পথে।

নারদ শেঠজীর কথা শুনে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু ধৈর্য হারালেন না।

কিছুদিন পর নারদ আবার শেঠজীর বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। শুনলেন শেঠজী মারা গেছেন। নারদ ধ্যানযোগে জানলেন যে আসক্তি বশতঃ শেঠজী দেহান্তে ঐ বাড়ীর বলদ হয়ে আছেন।

তখন তিনি বলদরূপী শেঠজীকে বললেন, কেমন শেঠজী, আপনি তো পৌত্রদের বিবাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা তো পারলেন না। আসক্তির জন্য আপনাকে বলদ হতে হলো এবং বলদ হয়ে আপনি কত কষ্ট পাচ্ছেন। এখনও এখানে থাকতে ইচ্ছা করে? চলুন এবারে বৈকুণ্ঠে যাই।

বলদরূপী শেঠজী প্রত্যুত্তরে বললেন, ঠাকুর, আপনি যা বলছেন তা সবই সত্য। কিন্তু এই দুঃসময়ে আমি কি করে বৈকুণ্ঠে যাই। আমি ওদের জমি চাষ করে দিই, তাইতো ওরা দুটো খেয়ে বেঁচে আছে। আমি এখনই গেলে ওদের কষ্ট হবে। আপনি বরং কিছুদিন পরে আসবেন তখন অবশ্যই বৈকুণ্ঠে যাবো।

নারদ জীবের আসক্তি দেখে অবাক হলেন। আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

আবার কিছুদিন পর এসে হাজির হলেন। এসে শুনলেন ঐ বলদটি মরে গেছে। ওর কি গতি হলো জানবার জন্য নারদ আবার ধ্যান অবলম্বন করলেন। ধ্যানে তিনি জানতে পারলেন যে, শেঠজী এখন কুকুর হয়ে ঐ বাড়ীতেই আছেন। তখন নারদ কুকুররূপী শেঠজীকে বললেন, এখন তো দেখলেন যে সংসারাসক্তি কি ভীষণ! ছিলেন শেঠ, পরে হলেন বলদ, এখন হয়েছেন কুকুর। উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন, রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছেন আরও কত ক্লেশ ভোগ করছেন। কাজেই চলুন এবার বৈকুণ্ঠে যাই।

প্রত্যুত্তরে কুকুররূপী শেঠজী বললেন, ঠাকুর, আপনি যা বললেন তা সবই সত্য। তবে দেখুন, আমার ছেলেগুলি অসতর্ক। আমি সর্বদা সজাগ হয়ে চোর ডাকাত থেকে এদের টাকাকড়ি রক্ষা করছি। এখন আমি চলে গেলে এদের কিছুই থাকবে না। কাজেই এরা একটু সতর্ক হয়ে নিজের বিষয়-আশয়

রক্ষণাবেক্ষণ করতে শিখুক, তাহলেই আমি আপনার সঙ্গে চলে যেতে পারবো।

নারদ শেঠজীর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। আবার কিছুকাল পর নারদ এসে উপস্থিত হলেন শেঠজীর বাড়ী। শুনলেন কুকুরটি মরে গেছে। এবং ধ্যানযোগে জানলেন শেঠজী সর্প হয়ে গোলার ধান রক্ষা করছেন। তখন সর্পরূপী শেঠজীকে বললেন, শেঠজী, আর কেন ? এখনও কি সংসারাসক্তি মিটল না ? এখন তো সাপ হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। এখন চলুন বৈকুণ্ঠে।

শেঠজী বললেন, ঠাকুর, আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে আমি সর্প হয়ে পাহারা না দিলে ইঁদুরে গোলার ধান খেয়ে ফেলবে। তখন এরা খাবে কি ? জীবের বিষয়াসক্তির কথা ভেবে নারদ মনে মনে হাসলেন। আর কিছু না বলে তিনি চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একদিন বিরাট এই বিষধর সর্পটিকে দেখতে পেয়ে শেঠজীর স্ত্রী পুত্র পৌত্ররা মিলে লাঠি দিয়ে মেরে ফেললো।

ধ্যানযোগে জানতে পেরে নারদও ছুটে এলেন শেঠজীর বাড়ী। শেঠজী সর্পদেহ ত্যাগ করলে নারদ বললেন, কেমন শেঠজী আপনি যাদের জন্য এত ক্লেশ করলেন তারাই আপনাকে লাঠিপেটা করে মেরে ফেলল। আর কেন ? এখন চলুন বৈকুণ্ঠে। তখনও কিন্তু শেঠজীর যাবার ইচ্ছা নেই। সংসারের আসক্তি এতটুকুও নাশ হয়নি।

তখন নারদ একরকম জোর করেই শেঠজীকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে এলেন। এবং শ্রীভগবান নারায়ণকে বললেন, ভগবন্, আপনি যথার্থই বলেছেন। জীব কখনও সংসারাসক্তি ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে আসতে চায় না।

এদিকে ভগবানকে দর্শন করামাত্রই শেঠজীর সমস্ত বিষয় ভাবনা ত্যাগ হয়ে গেল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভগবান এবং নারদের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।'

তাইতো মা বলছেন :

'বিষয় বাসনায় মন থাকলে তার স্বভাবই মনকে বিকল করা। এই জন্য চেষ্টা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান জপে মন না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান জপের চেষ্টা করে যাওয়া। পরিমিত নিদ্রা ভোজন ইত্যাদির প্রয়োজন। দেখো, যখন কোথাও যাত্রা করো যতটা প্রয়োজন মাত্র ততটাই সঙ্গে নিয়ে যাও। ঘর থেকে সবটাই নিশ্চয় নিয়ে যাও না। এই জন্য ভগবৎ পথে যাত্রা করলে ভগবৎমুখী

অনুকূলতার জন্য আহার নিদ্রা যতটা প্রয়োজন ততটাই নেওয়া প্রয়োজন। যেমন বলে না, 'যেমন খাইবে তেমনই মন হইবে'।'

'মনকে বাইরের দিকে যেতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করতে চেষ্টা করা। অভাবের চিন্তা করে অভাবই প্রাপ্ত হয়! স্বভাবের চিন্তা করা। সংসার সংশয়ের স্থান। আসা যাওয়ার স্থান। পরমধনের বা পরমধামের প্রাপ্তি হলে আর আসা যাওয়ার প্রশ্ন থাকে না।

অমৃত পথের যাত্রী হও। অমৃতের যাত্রী কখনও মৃত্যুর ধ্যান করে না। অমৃতের চিন্তায় মৃত্যুভয় দূর হয় মনে রাখা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তা যতই অখণ্ড হয় ততই অখণ্ড প্রকাশের দিক।

শরীর ধারণ জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগের জন্য। সুবুদ্ধি জাগরিত করা এবং দুঃখ সুখের অতীতে যাওয়ার জন্য একমাত্র তাঁরই স্মরণ নেওয়া।

সেই মহাশক্তিই সর্ব ঘটে মঠে পটে—স্বয়ং তিনিই। কেবল তাঁকেই ডাকা। সন্তানের আকুল ক্রন্দনে মহাশক্তি মহামায়ার আসন টলে। যেমন তিনি কঠিন আঘাত করেন আবার তিনিই বুকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করেন।'

চাই নিবিড় একাগ্রতা। কিন্তু সংসারীর মন তো সংশয়ে ভরা। মন স্থির হয় কিসে?

আনন্দময়ী মা'র নিজের ভাষায়:

'মনকে স্থির করিবার জন্যই তো সাধনা। স্থির হইয়া গেলে তো হইয়াই গেল। চঞ্চলতা মনের স্বভাব। সে স্বভাবতঃই এদিকে ওদিকে যাইতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বধন না পায়, শুদ্ধভাব না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থির হইবে না। মনকে স্থির করিতে হইলে এক্ ভাব লইয়া থাকিতে হয়। যেমন নাম করা।'

আরও সহজ করে বলছেন শ্রীশ্রীমা:

'হ্যাঁ, নামেই হয়। মন এদিকে গেল ওদিকে গেল বলে দুঃখ করে লাভ নেই। বরং তখন এই বলে বিচার করতে হয় যে, মন যখন আমার বাধ্য না হয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে, আমিও মনের বাধ্য না হয়ে জোর করেই নাম করতে থাকবো। তোমরা দেখ না ছেলেরা ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি আকাশে এদিকে ওদিকে চঞ্চলভাবে উড়তে থাকে কিন্তু উহা বাঁধা থাকে লাটাইয়ের সুতার সঙ্গে। ঘুড়িটা হচ্ছে মন। উহাকে নামরূপ সুতার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। এইভাবে বাঁধা থাকলে একদিন না একদিন মনকে বশ করা যায়।

চঞ্চলতা যেমন মনের স্বভাব, আবার শান্ত হওয়াও উহার স্বভাব। মনকে শান্ত করতে হলে একটা কিছু আশ্রয় করতে হয়। আশ্রয় কর নামকে। সকল কাজেই চাই সঙ্কল্প। সাধনা। নাম করাকেই এ শরীরটা বলে সাধনা।

ফল হবে না কেন ?

'অনেক সময় মনে হয় যে, নাম তো করি কিন্তু ফল তো পাই না।

সংসারী মানুষ বড় হিসেবী। সাথে সাথে ফল চাই।

প্রকৃতপক্ষে নামের ফল থেকেই যায়। বৃথা যায় না। তবে মন দিয়ে নাম করা আর অন্যমনস্কভাবে নাম করার মধ্যে পার্থক্য আছে। মন দিয়ে নাম করলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। সাংসারিক দিক দিয়েও দেখ, যে সাংসারিক বিষয়ে বেশী মন দেয়, তার সাংসারিক জ্ঞান ভালভাবে প্রকাশ পায়। সেইরকম শুদ্ধভাব নিয়ে বেশীক্ষণ থাকলে উহাতেও শুদ্ধভাব প্রকাশ পায়।

তবে প্রথম প্রথম বেশীক্ষণ নাম করা যায় না, কারণ ভাল লাগে না। ছেলেপেলেও লেখাপড়া করতে চায় না, কারণ লেখাপড়ার চেয়ে খেলাই তাদের বেশী ভাল লাগে। তাদের লেখাপড়া শেখাতে হলে যেমন জোর করে তাদের পড়াতে হয়। সেইরূপ নামও প্রথম প্রথম জোর করে করতে হয়। চাই অভ্যাস। দেখ না বাসনপত্রে ময়লা জমলে, পরিষ্কার করবার জন্য ঘষতে মাজ্‌তে হয়। একবার ঘষলেই পরিষ্কার হয় না। যতই ঘষামাজা করা যায় ততই পরিষ্কার হয়। দিয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বালতে হলেও ঘষতে হয়। কখন যে দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে বলা যায় না। কিন্তু জ্বলবেই। নাম করাও সেইরকম আর কি। ফল মিলবেই।

তোমার যে নাম ভাল লাগে, সেই নামেই ডেকে যাও। দরকার মতো তিনি নিজে এসে তাঁর প্রকৃত নাম বলে দেন। যেমন দেখ না, একটি ছেলের ভাল নাম তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু তুমি তাকে যদি তার ছেলেবেলার সাধারণ নামে অথবা খোকন খোকা বলে ডাকো, প্রথমে খেয়াল না করলেও, তাকে

উদ্দেশ্য করে ডাকতে থাকলে, সে নিশ্চয়ই আসবে। এবং তখন সে নিজেই বলবে 'আমার ভাল নাম এই'। কাজেই যে নামেই ডাক কাজ হবেই।

আবার দেখ ছোট শিশু যখন মা বলতে পারে না তখন সে কাঁদলেই মা বুঝতে পারেন যে শিশু মাকে চাইছে। অমনি ছুটে যায় শিশুর কাছে। কিন্তু বড় হলে ছেলে কাঁদলেও মা বুঝতে পারেন না যে ছেলে মাকেই চাইছে। সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় আমরা যে নামেই ডাকি না কেন তিনি জানতে পারেন।

তাইতো মা কাব্যান্বিত করে বলছেন :

'নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামী অভেদ বলে সে সময়ের জন্য বহির্জগতের ভাব লুপ্ত হয় এবং নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা থেকেই ফুটে ওঠে।'

নামে তন্ময়তা আসবে কেমন করে? সকল প্রকার সাধনের জন্যই তো একাগ্রতার প্রয়োজন। কেমন করে মন একাগ্র হবে?

'ভালবাসার পাত্রকে চিন্তা করেই মনকে একাগ্র করতে হয়।'

আবার একটি গল্পের অবতারণা করলেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা :

'একটি ছাত্র গুরুর নিকট গিয়েছিল বেদাধ্যয়ন করতে। কিছুদিন পর গুরু লক্ষ্য করলেন, ছাত্রটির চিত্তচাঞ্চল্যতা। একদিন ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে তোমার মন সর্বদা এদিক ওদিক যায় কেন?

ছাত্রটি প্রত্যুত্তরে লজ্জিত হয়ে বললো, আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গোরু আছে, তারই কথা মনে পড়ে। সেইজন্য চিত্ত স্থির করতে পারি না।

তখন গুরু বললেন, তবে তুমি বেদপাঠ ক্ষান্ত রেখে কিছুকাল তোমার প্রিয় গোরুটির বিষয় চিন্তা করো।

গুরুর আদেশে ছাত্রটি সর্বদা তারই চিন্তা করতে লগেলো।

কিছুদিন পর ছাত্রটির গৃহদ্বারে এসে গুরু তাকে ডেকে বললেন, তুমি চলে এসো, পুনরায় তোমার বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হবে।

ছাত্রটি গুরুর আহ্বানে চলে এলো। গুরু বুঝলেন ছাত্রটির চিত্ত এখনও স্থির হয়নি! আবার ছাত্রটিকে গোরুর চিন্তায় নিমগ্ন হতে বললেন।

ছাত্রটিও প্রিয় গোরুর ধ্যানে মত্ত হয়ে রইলো, কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে গুরু আবার এসে দাঁড়ালেন ছাত্রটির গৃহদ্বারে। তারপর তাকে চলে আসবার জন্য ডাকলেন।

এবারে ছাত্রটি প্রত্যুত্তরে বললো, গুরুদেব আপনার নিকট কেমন করে

উপস্থিত হবো ? আমার শৃঙ্গ দরজায় বাধবে যে !

গুরু বুঝলেন,—গোরুতে এর সমাধি হয়েছে। চিত্ত স্থির হয়েছে।

তখন গুরু মৃদু হেসে ছাত্রকে বললেন, এস এস তোমার শৃঙ্গ বাধবে না, আমি তার প্রতিবিধান করবো। ছাত্রটি চলে এলো গুরুর কাছে। শুরু হলো বেদপাঠ।

গোরুর ধ্যানে শিষ্যের এমনি একাগ্রতা সাধন হলো যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হয়ে পড়লেন।'

তাইতো মা বলেন :

প্রথম বীজটি পুঁতে যদি বারে বারে উঠিয়ে দেখা যায়, তবে সেই বীজে আর গাছ বের হয় না। বীজটি মাটির ভিতর পুঁতে যত্নে রক্ষা করতে হয়। জল সেচন করতে হয়। শেষে গাছ বের হয়ে বড় হয়ে গেলে সেই গাছ থেকেই আবার কত বীজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই কত ফুল ফল ঝরে পড়ে।

নামের মধ্যেই বীজ আছে। তাই নাম করতে করতে বীজ স্ফুরিত হয়। বীজের মধ্যেও নাম আছে, সবের মধ্যেই সব। নাম করতে করতে একাগ্রতা হয়। মন স্থির হয়।

এই জন্যই এ শরীরটা প্রথম থেকেই সকলকে বলে যার যে নাম ভাল লাগে, সে তাই করতে থাক। গুরুর আদেশ বিনা বাক্যে পালন করে যাও। নিজেকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছেড়ে দাও। নিজের কোনো ইচ্ছাই বড় করে তুলো না। দেখবে আপনা হতে সব ফুটে উঠবে। কলিযুগে সরল সোজা নাম সাধলেই সব হয়। তোমরা ভেবো না যে সংস্কৃত শব্দে দীক্ষা না হলে ভগবানকে ডাকা যাবে না। কোনো কাজই হবে না। এ শরীরকেও তো দেখছো কত কথা শুনছো। ইহাই কি কেবল কথা! দরকার মতো সব নিজে নিজেই এসে যাবে। বলেছি তো রেজিষ্টারি খাতায় নাম লিখতে হলে ভাল নাম চাই। তাই তোমার যে নাম ভাল লাগে করে যাও। যাকে ভালবাস তাকেই সামনে রেখে ধ্যান করে যাও। দরকার মতো সব এসে যাবে। 'বীজ' অর্থ বিশেষ পরিচয়। যেমন তোমার নাম জানা আছে আর কিছু পরিচয় জানা নেই। কিন্তু নাম ধরে ডাকলেই কাছে আসলে তার সব পরিচয়ই পাওয়া যায়।

নাম কর। নামের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়। একটা প্রজ্বলন্ত প্রেমমন্ত্র। যাকে ভালবাস তাকে যেন হৃদয়ের স্বর দিয়ে ডাকা হয়। সে ডাকের সংঘর্ষে বাতাস হবে সমীরিত। আর সঞ্জীবিত

হবে সেই নিরুত্তর নিষ্ঠুর কাষ্ঠ। আর তারই প্রত্যুত্তরে একদিন পুষ্পান্বিত হবে সেই কাষ্ঠে।

অনুরাগ নিয়ে কথা। মাটি যত শক্তই হোক যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে তবে নাম বীজ, বীজের অঙ্কুর যতই হোক কোমল, মাটি ঠিকই ভেদ করে উঠবে।

পৃথিবীতে এতো বস্তু নেই যা, আগুন দগ্ধ করতে পারে না। তেমনি মানুষে এতো পাপ করতে পারে না যা, নামের দ্বারা দগ্ধ না হয়। নাম, নাম শুধু নাম।'

'নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।'

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভো নাম তদোত্তমঃ॥

কুম্ভ যোগে পুণ্যস্নান। তখন সূর্য মেষরাশিতে। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করে।

পুরাকালে, সত্যযুগে সুর ও অসুরগণ অমৃতলাভের জন্য সমুদ্রমন্থন করতে আরম্ভ করলেন। দেবতা ও অসুরের সেই সমুদ্রমন্থনে উঠলো নানারকমের ধনরত্ন। আর উঠলো অপরূপা লক্ষ্মীদেবী। তাঁকে নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। কে পাবে ভাগে! এইসব উঠতে উঠতে এক ভাঁড় অমৃতও উঠলো। অমৃত আর অসুরেরা চিনবে কি করে। তারা তখনও লক্ষ্মীদেবীর মোহে মোহাচ্ছন্ন। দেবরাজ ইন্দ্র অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি অমৃতের ভাঁড় দিলেন পুত্র জয়ন্তের হাতে। ইশারা করলেন পালাতে! জয়ন্তও ছুটলো ভাঁড় হাতে নিয়ে। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য অমৃত দেখে চীৎকার করে উঠলেন, ধর, ধর ওরে মূর্খ, অমৃত নিয়ে পালালো যে! সচেতন করে দিলেন অসুরদের। অসুরেরা তখন বুঝতে পেরে ছুটলো জয়ন্তর পিছু পিছু অমৃত সন্ধানে। জয়ন্তও ছোটেন প্রাণপণে। আমাদের এক বছর, দেবতাদের একদিন। জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিন দিন সমানে ছুটে এক জায়গায় ভাঁড় রেখে একটু বিশ্রাম করে

নিলেন। আবার তিন দিন পর ভাঁড় নামান হাত থেকে, এইভাবে তিন দিন পর পর চার জায়গায় জয়ন্ত ভাঁড় নামান। সেই চার জায়গা হলো, হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী। তিন বছর পর পর এইসব জায়গায় হয় কুম্ভযোগ। বারো বছর পর হয় পূর্ণকুম্ভ মহাকুম্ভের যোগস্নান।

ভক্তবৃন্দসহ আনন্দময়ী মা এসেছেন এই পূর্ণকুম্ভের যোগস্নানে। হরিদ্বারে। সাত দিন অবস্থান করে আনন্দলীলা করলেন ভক্তসনে। তারপর হৃষীকেষ লছমনঝোলার লীলা সমাপন করে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনে।

নিধুবন, নিকুঞ্জবন, রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থল।

সচ্চিৎ আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরমমোহন॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনাপুলিনে।
যাহা রাসক্রীড়া শতকোটী গোপীসনে॥

বৃন্দাবনের কুঞ্জঘেরা পথে পথে আনন্দময়ী মা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখে মনে হয় ভগবানের লীলাতত্ত্ব রহস্য বোঝাবার জন্য ভারতের সাধনাকাশে নব-নীরদ-শ্যামসুন্দরের উজ্জ্বলনীল-কান্তিচ্ছটা আবার বুঝি উদ্ভাসিত হলো। শ্যামাঙ্গে-হেমাঙ্গে হেলায়িত করে চিন্ময় লাবণ্য-লহরী আনন্দময়ী মা রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের স্বপ্রকাশ সৌদামিনীচ্ছটায় আবার আজ ভক্তভুবনের অন্তরের অন্ধকার হরণ করলেন। মানুষের ত্রিতাপ-তপ্ত হৃদয়ে করুণাময়ী আনন্দময়ীর করুণাধারা আবার যেন বর্ষিত হতে লাগলো।

অবশেষে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী মথুরা-বৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করে মা চললেন তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে। গ্রাম নগর শহরের পর শহর অতিক্রম করে হিমালয় অভিযানে। উত্তর কাশীতে প্রতিষ্ঠা করলেন কালীমূর্তি। আবার সোলনের রাজা শ্রীদুর্গা সিং-এর আহ্বানে এলেন সোলনে। মেতে উঠলেন নামগানে। কৃষ্ণকীর্তনে। ভক্তপ্রাণ দুর্গা সিং-এর নাম দিলেন 'যোগীভাই।' অকস্মাৎ কৃপাবর্ষণ হলো ভক্ত হরিরাম যোশীর পুত্রদ্বয়ের উপর। কঠিন রোগ হতে তারা আরোগ্যলাভ করলো। এইভাবে মা নানা লীলারহস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করে ভক্তজনদের চঞ্চল লক্ষ্যকে তাঁর বিরাট সত্তার অভিমুখে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

ঢাকা পরিত্যাগের পর কোথাও স্থির হয়ে বসেন নি মা। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কখনও দুর্গম উপলবন্ধুর পার্বত্য পথে পথে আবার কখনও সমতলভূমির নগরে নগরে শহরে শহরে মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। মত্ত-বিহঙ্গমার মতো আপন খুশীর খেলায় বিভোর হয়ে সঙ্কল্পের হাওয়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে বেড়াতে লাগলেন। কখনও আবার অজ্ঞাতবাস করছেন।

ধীরে ধীরে আনন্দময়ী মা'র সাধনার যশঃ সৌরভ সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। বারাণসীধাম এলাহাবাদ মথুরা বৃন্দাবন দিল্লী দেরাদুন হরিদ্বার আলমোড়া আহমদাবাদ বরোদা পুণা প্রভৃতি শহরে শহরে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই পৌঁছে গেল মাতৃলীলার লহর। গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মতোই ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'আনন্দময়ী মা' নাম। অন্তরে অন্তরে জাগে অপূর্ব এক শিহরণ! এ নামধ্বনির মধ্যেই যে আছে অজানা এক অনির্বচনীয় পরামানন্দের আভাস।

—বাবা বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন? তাঁর স্বর অতি পরিস্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার। ব্রহ্মানন্দ সাগরে অবগাহন করে 'আনন্দময়ী মা' এখন যেন জড়জগতে ফিরে এলেন। বলছেন পরমহংস যোগানন্দ।* অকস্মাৎ আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয় কলকাতায়। ভবানীপুরে। ১৯৩৫ সনে।

—বর্তমানে কলিকাতা কিম্বা রাঁচি কিন্তু শীগ্‌গিরই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি?

—আমেরিকা।

—হ্যাঁ। সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মতো ভারতীয়

* ১৯২০ সনে পরমহংস যোগানন্দ, ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস-এর ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আহুত হয়ে বক্তৃতা করেন। সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁর উপদেশ ও যৌগিক শিক্ষাপ্রণালীর লোকপ্রিয়তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে চুরাশীটি সৎসঙ্গ আশ্রম ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এক আমেরিকাতেই দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের উপর তাঁর শিষ্য ছিল এবং তাঁরই প্রবর্তিত 'যোগদা' প্রণালীর শিক্ষার্থী হন। সনাতন ধর্মের বাণী প্রচার ও বিশ্বজনীন মানব হিতৈষণার বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার অন্তরালে তিনি গভীর ধর্মভাবপূর্ণ বহু প্রবন্ধ কবিতা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের শিষ্য ছিলেন।

সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে—যাবেন আপনি ?

—বাবা নিয়ে গেলেই যাব !

—অন্তত রাঁচিতে তো আসুন। আপনার শিষ্যদের নিয়ে। আপনি নিজে একজন ঈশ্বরের 'শিশু'। আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দ পাবেন।

—বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুশী হয়ে যাব।

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মা'র রাঁচি বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষে বিদ্যালয় বাটি ও প্রাঙ্গন উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে তুললো।·· আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন—যেন স্বর্গের একটি সচল দেবী প্রতিমা।

প্রধান গৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা সানন্দে বলে উঠলেন, এ জায়গাটিও ভারি সুন্দর ! শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন ··অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সর্বব্যাপিত্বের এ কি রহস্যময় স্বতন্ত্র ! বললুম,—আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন ? হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস ··সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তা আবার বলবে কি ? একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। কি আর করেন, সুন্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গিতে প্রসারিত করে বললেন, বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার জ্ঞান কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয়নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, আমি সেই একই ছিলুম। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও আমি সেই। নারীত্বে পৌঁছে তখনও আমি সেই। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম, তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে তখনও আমি সেই। আর বাবা, এখন আপনার সামনেও আমি সেই একই আছি। আর এই অনন্তের কোলে আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্য আমি সেই একই থাকবো।

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মূর্তি তাঁর মর্মর প্রতিমার মতো নিথর, নিস্পন্দ। মন কার ডাকে যেন কোন সুদূরে উধাও

হয়ে ছুটে বেরিয়েছে। গভীর কালো চোখ দুটি তাদের অতলস্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন নিষ্প্রভ কাচের মতো। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ থেকে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব বর্তমান থাকে। সে সময় বোধহয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মতো। ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ। ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম আনন্দময়ী মা'র সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললুম, মা দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন। রাইট সাহেব গোটাকতক ছবি নেবেন।

—আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। অনেকগুলো ছবি তোলা হলো—ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতি অপরিবর্তিত!

তারপর এলো ভোজের পালা। আনন্দময়ী মা কম্বলাসনে বসলেন।··· একজন শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন···শিষ্যাটি আনন্দময়ী মা'র মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মতো শান্তভাবে তিনি খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল খেয়েই যাচ্ছেন—তরকারী আর মিষ্টিতে যে স্বাদের কোনো পার্থক্য আছে, আনন্দময়ী মা'র কাছে তার কোনোপ্রকার বোধ কিছুমাত্র নেই!

সন্ধ্যা হয়ে এলো—আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার সময় আর এক দফা তাঁদের উপর বর্ষিত হলো সেই রকম গোলাপফুলের পাপড়ি বৃষ্টি। তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃ উৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল। তাদের সে এক কী আনন্দের দিন!

সকল প্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্ত ভাবে পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিতদের চুলচেরা বিচারে নয়। কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মতো সরল সাধিকা মানব-জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্য লাভ। লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতি সকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানব-কল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ—কারণ তা মানুষের মন

সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বটে কিন্তু যীশুখৃষ্ট তাঁর 'প্রথম আজ্ঞায়' যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য তা তার একমাত্র দাতার মুক্তহস্তের দান—প্রথম শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

রঁাচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্রীরামপুর স্টেশনে। শিষ্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্যে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, বাবা আমি হিমালয় যাচ্ছি।

গাড়ীতে চড়লেন, দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে কি ট্রেনে কি ভোজনে কি নীরব ধ্যানে বসে, কোনো উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি:

'দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে আমি চিরকাল সেই একই আছি।'

তেরোশো চুয়াল্লিশ সালের তিরিশে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৩৭ সন) রবিবার। আলমোড়া থেকে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন কৈলাসের পথে। যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ, স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি, ভাইজী, গুরুপ্রিয়া দেবী, দাসুমহারাজ, কেশব সিং আর পাহাড়ী মেয়ে পার্বতী।

হিমালয়। হিমাদ্রি। মহাহিমবন্ত। দেবতাত্মা হিমালয়। এ যেন গিরিরাজ হিমালয়ের আহ্বানে গিরিকন্যা ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছেন পিতৃসন্নিধানে।

হিমালয়ের পথে সন্ন্যাসিনী রুমা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হলেন আনন্দময়ী মা। রুমা দেবী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেছিলেন। খেলায় 'সারদা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছেন। আনন্দময়ী মাকে প্রথম দর্শন করেই অভিভূত হলেন রুমা দেবী।

রুমা দেবী বলছেন:

'আনন্দময়ী মা'র রূপ ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতাম যেন ঐ রূপ চলিয়া গেল, তাহার স্থানে কখনও রামচন্দ্রের কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছে। মন ভাবসমাধিতে ডুবিয়া যাইত কিন্তু তাহাতে আমার বাহিরের জ্ঞান লুপ্ত হইত না। অন্তরে কে যেন বলিত সব রূপ দেখিয়া লও। আর

চলচ্চিত্রের ছায়ার মতো একটার পর একটা রূপ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। কখনও বা মনে হইত আমার কুণ্ডলিনী যেন ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে। ধ্যানে মনে হইত যেন একজন মহিলা আসিয়া আমার মস্তকে ফুল দিয়া আরতি করিতেছে। কখনও ধ্যান করিতে বসিয়া আমার শরীর দক্ষিণ এবং বামদিকে কম্পিত হইত। অন্তরে মনে হইত, কে যেন বলিতেছে সচ্চিদানন্দের আনন্দ লুটিয়া লও। আবার কখনও মনে হইত কে যেন আনন্দময়ী মাকে দেখাইয়া বলিতেছে ইনিই রামকৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ইনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।

কিছুদিন পর শ্রীশ্রীমার সঙ্গে হরিদ্বার হইয়া নর্মদা আসিবার পথে, দিল্লীতে ট্রেন হইতে যমুনা দেখিয়া কৃষ্ণের ভাবে আমার মন এমনভাবে তন্ময় হইয়া গেল যে আমি বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম 'মা' যেন কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখ দেখিয়া চিনিলাম 'ইনিই মা'। আমার শরীর অচল হইয়া গেল। আমি বহুক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম। আমি যখন মা'র নিকটে থাকি তখন কেবলই মনে হয় মা মনুষ্য নন। মা'র মুখে কৃষ্ণমূর্তি আর শরীরে দেবমূর্তি।"

অনেক দুর্গম গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে, ভীষণ গহন অরণ্যানী পেরিয়ে গিরিনদী নির্ঝরিণী ছাড়িয়ে মা ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌঁছলেন মানস সরোবরে। এই সরোবরের জলে স্নান করেই ভাইজীর অবধূত ভাব হয়। এবং সবকিছু আনন্দময়ী মা'র শ্রীচরণে সমর্পণ করে মৌন হলেন। মা সন্ন্যাস নাম রাখলেন মৌনানন্দ পর্বত। আর শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথকে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়ে নাম দিলেন তিব্বতানন্দ তীর্থ।

তারপর একদিন এসে পৌঁছলেন কৈলাস তীর্থে। সাধু সন্ন্যাসী তপস্বী তপস্বিনীর চিরবিস্ময় হর-পার্বতীর তপস্যালোক আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র সেই কৈলাসে। গৌরীকুণ্ডে স্নান করে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ কৈলাসপর্বত প্রদক্ষিণ করলেন।

অবশেষে একদিন লীলাময়ী মা কৈলাস পর্বতের লীলা সমাপন করে যাত্রা করলেন সমতলভূমির দিকে। আলমোড়া অভিমুখে। পথে ভাইজী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর কোনোদিনই তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। অবশেষে ১৩৪৪ সনের ২রা ভাদ্র বুধবার দিন মা আনন্দময়ী ও ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে বিচলিত করে চিরসমাধিতে নিমগ্ন হলেন ভক্তপ্রাণ 'ভাইজী' পার্বত্যশহর আলমোড়াতে। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পরদিন 'মা' হলেন সমাধিস্থ। দীর্ঘ ছয়দিন পর্যন্ত এই অবস্থায়ই রইলেন।

ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় মায়ের ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করে এক বিদেশিনী ফরাসী মহিলা মিসেস পেন্টরোজ অভিভূত হলেন। মাকে দর্শন করছেন আর অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হচ্ছেন। জীবনে যা দেখেন নি তাই যেন আজ দর্শন করেছেন। এমনই ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ভক্তপ্রবর হরিরাম যোশীকে, 'আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি, কিন্তু মার মতো এমন পূর্ণভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমি যখন আলমোড়াতে মার সমাধি অবস্থায় মার কাছে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম মার শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। কিছু সময় পর মার শরীর হইতে সূর্যকিরণের মতো একটা জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহা শান্ত হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পরে মা আমার দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম। এবং তখন আমি শান্ত হইলাম। অনেক লোকের ভিড় ছিল। ইহার পর হইতে আমার মানসিক অবস্থার পবিবর্তন হইয়া গেল। আমি মনে করি মা-ই 'পরাজ্ঞান'। তিনি আমাকে যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। আমি আরও দেখিলাম, মা বিরাট মূর্তিতে হাত পাতিয়া বসিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'তোরা বাহিরে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্? আমার ভিতরে আয়, অন্তর রাজ্যে প্রবেশ কর্'।'

'মনের গেরুয়াই আসল সন্ন্যাস।'

শ্রীশ্রীমা বললেন একজন গৃহস্থভক্তকে। তিনি গেরুয়া পরে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা মৃদু হেসে কাব্যায়িত করে এই কথা বললেন।

যে যাই বলুক, মনই তো সবকিছু। মন নিয়েই কথা। তাই তো মনের সমস্ত কুঠুরিতে জ্বালাতে হবে আলো। সে আলো প্রেমের আলো। ক্ষমার আলো। শান্তির আলো। সাধ্য কি তুমি আমার মনের ঘরটিতে এসে না বসো। তোমাকে আমি ধন দিয়ে ভোলাব না, ভোলাব মন দিয়ে।

এই অন্তরেই তো শুচির নীর-নিবাস। এই মনের মধ্যেই তো সেই মানস সরোবর। মনমালাই হোক জপমালা।

তাই তো মা ডাক্তার জে কে সেনকে বলেছিলেন দিল্লীতে। তুমি ডাক্তারী

কর, এবার একটু মনের ডাক্তারী কর। তোমরা তো জানো রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ পথ্য ঠিক ঠিক ভাবে খাওয়ানো দরকার। সেই রকম নিয়ম মতো নাম করে যাও। মন স্থির হবেই। ফল নিশ্চয়ই পাবে।

মা আবার বলছেন ঃ

'দেখ, তোমরা ঔষধ খাও সত্য, কিন্তু কুপথ্য কর। তাই ঔষধে ফল দেখা যায় না। ঔষধ হলো নাম আর পথ্য হলো সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়? যতই ঔষধ খাও ফল হবে না। তাই বলি যদি ফল চাও শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নাম করে যাবে।

বাইরে কোথাও তাঁকে পাবে না। এই অন্তরেই সব কিছু। এই দেহ-ঘটের মধ্যেই তিনি দীপ্যমান। এই দেহের মধ্যেই সপ্তসমূদ্রের রঙ্গলীলা। এই দেহ মনেই দ্বারকা মথুরা আবার কাশী সর্বপ্রকাশিকা।

যত কঠিনই হোক, অন্তর খুঁড়লে জল মিলবেই। দেখ না খেজুর গাছ প্রথমে কাটলেই কি আর রস বের হয়? কাটতে কাটতে ঝর্ ঝর্ করে রস পড়ে। সেই রসে আবার কত শত জিনিষ তৈরী হয়। তেমনই ভক্তি শ্রদ্ধার নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলবে। চাই সঙ্কল্প। চাই সাধনা। চাই ধৈর্য! চাই একাগ্রতা।

শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে। নিজেকে ভগবানের অঞ্জলি দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ, পবিত্র ভাবটি বজায় রাখবার চেষ্টা। যিনি আত্মা প্রাণের প্রাণ তাঁর কথা তারই গুণ বর্ণন, তাঁরই রূপ সর্বেতে দেখার চেষ্টা রাখা। যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা তাঁরই তো কৃপা। কেবল ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণীয়। নিরাশ হতে নাই। যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা।'

'গোলাপ ফুল তোলাই উদ্দেশ্য, কাঁটার দিকে লক্ষ্যও করতে নেই।

কাউকেও অবজ্ঞা করতে নেই। সাধুভাবে আছে, এই দেখলেই শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতে হয়। সেই বিরাট মহানেরও এই একরূপ, এই ভেবে প্রণাম করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে। শ্রদ্ধার ভাবে যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। সকলের মধ্যেই সেই একেরই সত্তা দেখতে চেষ্টা করতে করতে দেখবে সেই বিরাট মহান ভাবে তাঁকে পাওয়ারই রাস্তার অনুকূল আশা।

ফিলটার করলে জল পরিষ্কার হয়। সেই শুদ্ধজল যেমন এই জলেতে আছে তেমন তিনি সর্বেতে আছেন। তাঁকেই প্রণাম। তাঁরই সঙ্গ করণীয়।

জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করা দরকার। এমন কি

খাওয়া-দাওয়া-হাঁটা-চলা-দেখা-শুনা-বলা সব কিছু। তাঁর হাতের যন্ত্র এই শরীর দিয়ে যা কিছু হচ্ছে সব তাঁকে সমর্পণ করা। ভোর বেলা জাগরণের পর থেকে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি রাখতে চেষ্টা করা। তারপর মনে মনেই তাঁর চরণ চিন্তা করে জপ কিংবা ধ্যানের ভাবটি সহ চরণের উপর নিজের মাথাটি লুটিয়ে দিয়ে সর্ব সমর্পিত ভাবটি নিয়ে শুয়ে পড়ো। এই রকম করতে করতে ক্রমশঃ মনে আসবে যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ বস্তু তাঁকে কেমন করে দেব ? তিনি যে আমার কত প্রিয়। আপনজন। প্রিয়জনকে কি আর খারাপ জিনিষ দেওয়া যায় ? ধীরে ধীরে শুদ্ধভাব মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসবে। অসৎ কর্ম করবার ভাব মন থেকে বিদূরিত হবে।

তারপর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চরণে উজাড় করে দিলে, নিজের বলে কিছুই না। এই শুভমুহূর্তে তিনি কি করেন জানো? তিনি তোমার এই অল্পত্ব পূর্ণ করে দেন। তখন চাওয়ার পাওয়ার আর কিছুই থাকবে না বাকী।

যেই মুহূর্তে তোমার এই সমর্পণ, সেই মুহূর্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তার প্রকাশ। আমার আমি, নিজ বলে যা, তা অর্পণ মানেই নিজেকে পাওয়া।

আত্মাতে বিশ্ব আছে আবার বিশ্বতেও আত্মা আছে। অনুরাগের বর্ষণ অধিক হলে বিশ্বও থাকে না, আত্মাও থাকে না। অথচ উভয়ই অভিন্ন সত্তারূপে করে আত্মপ্রকাশ। তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ। পূর্ণসত্তা।'

মা আরও সহজ করে বলছেন :

'সর্বকর্মের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা বড় রাখতে চেষ্টা করবে। ধ্যান যত বড় রাখবে ততই সেই জ্ঞান পাওয়ার আশা। তুমি আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধর— সিদ্ধিকাম হবেই।'

'দেহ সংযম, বাক্ সংযমও অনেক সময় হয়। কিন্তু মন সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। নইলে ধ্যান বড় রাখবে কেমন করে ? সারাদিন মনটা কি করে ধরতে পারো কি ? জপ ধ্যান থেকে যদি মনটা ছুটে আসে তবে নিজ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মনটাকে নিজের বশে রাখা। গভীর অন্ধকারে মনের মতো গুহায় প্রবেশ করে সেখানে ক্রিয়া করে আসনে বসে পড়া। যতক্ষণ পারা যায় জপ ধ্যান ইত্যাদিতে থাকা। থাকতে থাকতে এই রকম হবে যে, সেই

গভীর অন্ধকার গুহা নিজের ভিতরের তেজোময় আলোতে যেন আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। যখন ইষ্ট অথবা গুরুর ধ্যানে মনটা আর নিবিষ্ট থাকছে না তখন ঐ গুহার ভিতরেই মনটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা। তারপর সেই আলোর মধ্যে কোনও কল্পিত ভাবে নয়, তেজোময় মহাযোগীদের প্রকাশ হয় কিনা উন্মুখ হয়ে থাকা। যদি কখনও কিছু পাওয়া যায় তাদের সঙ্গেই ওঠা বসা থাকা। যদি যোগীদের প্রকাশ নাও পাওয়া যায় তবুও এই গুহার মধ্যভাগ ছাড়া বাইরে কোথাও যাবার অধিকার নেই। গুরু ইষ্টের প্রকাশ জাগ্রত ভাবে রাখা। নিজের সর্বদা একটা নিরাবরণ মুক্তভাব রাখা। যদি কখনও মনটা শুধু ইষ্ট ধ্যান ছাড়া বাইরের দৃশ্য চিন্তায় আসে তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গুহার ভিতরে প্রবেশ। যে অবস্থায় থাকবে নিত্য কর্মাদি সমাপনান্তে এই জাতীয় ভাবধারাটায় যত দীর্ঘ সময় থাকা যায়।

তাঁরই সব। তিনিই তো স্বয়ং সর্বরূপে। যখন যেরূপে নিজেকে নিয়ে নিজেই খেলা করেন। তাইতো তাঁরই চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা। তার জন্য চাই মনের শুচিতা। শুদ্ধ চিত্ত। তমসায় আবিষ্ট মন নয়। যে মন জ্বলবে সত্যের বিভাসনে। মুক্ত খড়্গের মতো। সে দীপ্তি কিছুতেই বাধিত হবে না বাইরে তার আভাস জাগবেই জাগবে।

তাইতো আনন্দময়ী মা বলেছিলেন সাধিকা রুমা দেবীকে।

'দর্পণ পরিষ্কার করলে যেমন তাতে নিজের প্রতিমূর্তি পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়—তেমন চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মস্বরূপ তাতে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। সেইভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করার জন্য চেষ্টা করো। সেটাই লাভ করা দরকার।

অবশ্য একথাও ঠিক,—ভগবৎ কৃপা বিনা কিছুই নেই। সবই ভগবৎ কৃপা। ধৈর্যের আশ্রয়ে সব সহ্য করে তাঁরই নাম নিয়ে থাকা।

'অভাব জাগরণ ভাল। রাস্তা খোলে। অযোগ্যকে তিনি পথেই যোগ্য করে নেন।'

'অভাব রূপেতে তুমিই গো সাথে সাথে।
পরমেশশরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং।

এই ভাব নিয়ে ইষ্ট বন্দনায় মন রাখা। কোথাও কারো প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হওয়ার চেষ্টা করা। শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার জন্য ভগবৎ ভাবই গ্রহণীয়। পরমার্থ চিন্তনই মানুষের জীবনের গঠন হওয়ার দিক। সাচ্চা চাওয়াই পাওয়া। রাস্তা খোলে।

স্বয়ং ভগবান তিনিই সর্বত্র। কোথায় নেই? তিনি সর্বরূপে অরূপে নামে অনামে সর্বস্থানে সর্বভাবে সর্বদাই আছেন। প্রাপ্তি ইচ্ছারূপটি যখন প্রকাশ অখণ্ড তখনই স্বয়ং। সর্বনাম তাঁরই তো। কোন নামের ভিতর দিয়ে তিনি স্বয়ং ধরা দেবেন। লক্ষ্য প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা হওয়া। নিজেকে পাওয়ার লক্ষ্য হওয়াই চাওয়া ও পাওয়া।

দেহ মানে—দেও, দেও। অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির ইচ্ছা। জীব জগত যা। যেখানে বন্ধন আর গতি - তাই তার অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা। শ্রদ্ধাই এই পাওয়ার উপায়,—তা তুমি যা চাও, ভক্তি চাও। জ্ঞান চাও। আপনাকে পেতে চাও। মহান ব্যক্তিদের সঙ্গ করলে সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ প্রকাশের দিকে যাত্রা। বৃক্ষের তলে বসলে যেমন তার ফল প্রাপ্তি। যেমন তেমন করে বৃক্ষের তলে বসলে হাসি ঠাট্টা তামাসায় ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা খোলার দিক হওয়া। নিজের মধ্যে সব আছে—তাই শুনতে চাও। তাই জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি কিসে হয়? সৎ সঙ্গে থাকা। তাঁর নাম ধ্যান ক্রিয়া যোগ ইত্যাদি যার যেদিকে ভাল লাগে। গুরু প্রাপ্তিতে গুরু যাকে যা দেন। যে ভাবেই হোক ভগবান পাওয়ার চেষ্টাই মানুষের দিক হওয়া। সেই রাস্তাটিও তাঁরই প্রকাশ। আপনি আপনাকে পাওয়ার চেষ্টা করা। মোটর ট্রেনে যেমন যে দিকে লক্ষ্য,—গন্তব্য—স্থানে পৌঁছায়,—ভগবানের দিকে যাবার অনন্ত পথতো—যে কোনো পথে তাকেই পাওয়ার দিক। যা থেকে সবকিছু অপ্রকাশ—প্রকাশ। সেখানে পৌঁছলেই ঐ অভয়, যা তোমাদের প্রশ্ন। —পূর্ণ শান্তি ঐ অখণ্ডে। একমাত্র তুমি আছ, শক্তি স্বরূপ। শ্রদ্ধা স্বরূপ। প্রেমস্বরূপ সবই, তোমাতে তুমি। রোগীর জন্য যেমন হাসপাতালে রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, তেমন ঐ মহান বৃক্ষের তলায় অর্থাৎ মহাত্মা যেখানে, সেখানে পৌঁছলে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভের দিক কিন্তু স্বাভাবিক। রোগীর যেমন হাসপাতাল থেকে ঔষধ নিয়ে সুপথ্যসহকারে গ্রহণ। তেমন সাধনও, যেখানে অনুকূল স্থান হলেই। জপ। ধ্যান। পাঠ। ভগবানের

কথা শোনা। সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাভক্তি ভগবৎ প্রেম জাগরণের রাস্তা খোলে। যেখানে জ্ঞানের দিক, জ্ঞান স্বরূপ—আত্মস্বরূপ, সেই দিক খোলার রাস্তা।

মানুষেরই কর্তব্য নিজশক্তি যতটা তাই দিয়ে চেষ্টা করা। তিনি নিজেই নিজেকে টেনে নেন। ধরা দেন। নিজেতেই নিজে যেখানে।'

মা বলছেন কঠিন তত্ত্ব কথা ভক্তদের।

মা আবার বলছেন:

'ভগবানকে পাওয়া মানে, আপনাকে পাওয়া! আপনাকে পাওয়া মানে, ভগবানকে পাওয়া। ভগবান না পেলে জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি কোথায়? সেই যেখানে অমৃতত্ত্ব। —তুমিই অমৃত আত্মারাম। সেই প্রকাশের জন্য অগ্রসরের জন্য চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য। যাহা জানিলে জানার আর কিছুই বাকী থাকে না। শান্ত স্বরূপ। জ্ঞান স্বরূপ। আনন্দ স্বরূপ। আত্মস্বরূপ। নিরাবরণ প্রকাশের জন্য এই রাস্তাই মানুষের গ্রহণীয়। সৎসঙ্গ। মহাপুরুষের সঙ্গ করা। ভগবৎ কথা শোনা। এও তো এক প্রকারের সাধনা।

তাইতো এ শরীর কোনো সময় কাহাকেও বলে, বৃক্ষতলমে বৈঠো। বৃক্ষতলে দেখ না যেমন ঠাণ্ডা, শান্তভাব দেওয়া তার স্বভাব—শান্ত হওয়া। বৃক্ষ যেমন ডাকেও না, তাড়িয়েও দেয় না কিন্তু ঠাণ্ডা শান্ত স্বাভাবিক প্রকাশ—শুধু তাই নয়, নিজেকেও দিয়ে দেয়। নিজেকে নিজে দেওয়া কিরূপে? নিজেকে দেওয়া মানে—নিজেতে নিজে—যা। দেখ না সুপক্ক ফলটি যেমন মাটিতেই—যা হইতে উৎপন্ন তাহাতেই অর্থাৎ নিজেতেই নিজে—স্বয়ং প্রকাশ।

মহাপুরুষদের স্বভাবও এই প্রকার।

যেখানে লেন দেন, সেখানে দৃষ্টি সৃষ্টি। সেখানেই দুঃখ। তাইতো শোক মোহ মৃত্যু হতে ত্রাণের জন্যই সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা। যা সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় এবং সুন্দর তাই-ই সুখ এবং ভূমা। সংসার অনিত্য তাইতো দুঃখ। আবার এই মানুষের মধ্যেই রয়েছে শান্তি সুখের খনি। অমৃতত্ত্ব। অমৃতের সন্ধান পেতে হলে সদ্‌বুদ্ধি সব সময় অনুকূল। অমরত্বের পথে যাওয়ার জন্য সত্যানুসন্ধানই মানুষের কর্তব্য। সকলেই তো নিজ আপন আত্মা। পরম পথই পথ আর সব বিপথ। ভগবানই একমাত্র সত্য নিত্য। যিনি যেরূপে প্রকাশ হন ধরবার চেষ্টা মানুষেরই কর্তব্য। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক হওয়ার দিক নেওয়া। ভগবানের কল্যাণ হাত সব সময়ই।

সকলেই যে তাঁরই সন্তান। ছোট বড়র প্রশ্ন নেই। যে কোলে যেতে চায় তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

মায়ের নাম করা। মায়ের ধ্যান করা। মাকেই সর্বময় দেখতে চেষ্টা করা। মা-ময় হওয়ার দিক নেওয়া।

তিনি যে অসহায়ের সহায়। একভাবে সময় যায় না। ধৈর্য ধরা। মাটিতে আছড়ে পড়লে যেমন মাটি ধরেই দাঁড়ায় সেই রকম তুমি তাঁকে ছেড়ে থেকো না। যে তাঁকে পায় তার তো মৃত্যুর মৃত্যু। মৃত্যুর মৃত্যু সেই ভগবদ্দর্শনের আশা রাখা। আর সেই অনুকূল ক্রিয়াদির আশ্রয়ে সর্বদা মনটাকে রাখবার চেষ্টা করা। কোনরূপে তোমার কাছে স্বয়ং ভগবান তা তো তুমি জানো না। তিনি কখনও কোনও অনুভবরূপে, কোনও ভাবে ও আকারে, তাঁর জন্য চোখের জল রূপেও তিনিই স্পর্শ দেন। তুমি সর্ব আকারে প্রকাশে এই স্পর্শ অনুভবের জন্য তদ্‌ভাবনায় মনটাকে উন্মুখ করে রাখবার চেষ্টা করো। তাঁর সঙ্গে সব সময় যোগ রাখতে চেষ্টা করো। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে আর মায়ের সেদিকে কোনো খোঁজ নেই এ কখনো হয়?'

মা আবার বলছেন :

'তাঁকে ডাকা বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনাকে আপনিই তো ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেই তো ডাকা। কতকাল ভোগকে ডাকিয়া ভোগ করিয়া আসা হইয়াছে তো। যাঁহাকে ডাকিলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলিয়া যায় সেই ডাকটিই যে প্রিয় হওয়া চাই। অমৃত ভোজী হও তোমরা। অমর ভোজী। অমর পথে চলো। যেখানে মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই।'

'অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।'

'পারি না বলে দূরে সরতে নেই। পারতে হবে। করতেই হবে। মানুষের পক্ষেই সব সম্ভব। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য দেহ। যদি কেহ আছড়েও পড়ে, মাটিতে

পড়ে থাকে না তো। আবার উঠে দাঁড়ায়। চলে। সেই চলার গতি দ্রুত হওয়া চাই। আপনাকে পাওয়ার জন্য আপন গতিতেই চলা।

শরীর সুস্থ রেখে নিজ ধ্যান জপে মনটা রেখে দেওয়ার চেষ্টা। মানুষের বিক্ষেপ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বিক্ষেপের স্থানটা পার করতে দ্রুতবেগে চলতে হয়। সময় চলে যাচ্ছে।

যারা যাত্রী তাদের সতেজ সবল অটল সবেগ হওয়া প্রয়োজন। ছ্যাকড়া গাড়ীতে বসতে চলতে নেই। মনের সতেজ সবলতা সব সময় প্রয়োজন। নিজের জীবন নিজেই গড়তে হবে মনে রাখা।'

মা আবার বলছেন :

'মনে রাখবে যে কর্ম নিয়েছি তা পূর্ণরূপে করবো! অবশ্য 'মায়া' কখন কি করে বলা যায় না। তথাপি নিজের চেষ্টা।

বিশেষ কথা,—কর্ম নিজেই প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। দেখা করবার ভার কারও উপর না দেওয়া, আপন হাতে করা। অন্যকে দিয়ে করালে কর্মের হিস্যা তার মধ্যেও চলে যায়। এইজন্য কিছু করো তো নিজের হাতে, দেখ তো স্বচক্ষে, শোন তো স্ব-কর্ণে। কারও উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।

এইজন্য সাধন মার্গে যারা চলেছে সর্বদা খেয়াল—আমার ত্রুটি যেন না থাকে। সমস্ত কর্মের মধ্যে চেষ্টা। এতে কর্ম ক্ষয় হয়। মনে করো 'কর্মরূপে তুমি আমার কাছে। কর্মকে পুরো করা। যে কর্ম নিয়েছি তা পূর্ণ করতেই হবে,—আমার কর্তব্য। তখন ভগবানই ঐ কর্ম পুরা করে দেন।

ফলদাতারূপেও ভগবান স্বয়ং। যার যেখানে যা প্রাপ্তি ভগবান তা সংযোগ করে রেখে দেন।'

এই সম্বন্ধে মা আবার একটি গল্প বল্লেন :

অকস্মাৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঠিক হয় গঙ্গাতীরে শব দাহ করানো হবে। গঙ্গা অনেকটা দূরে ছিল। শব বহনকারীরা অনেক পথ চলে চলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রি। তার উপর পবনদেবতার তাণ্ডবলীলা। ঝড় বৃষ্টি। উপায়ান্তর না দেখে তারা পথিমধ্যে এক নিরাপদ স্থানে শব রেখে বিশ্রাম করতে লাগল। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সকলেই পড়ল ঘুমিয়ে। ঐ স্থানেই ছিল এক বৃদ্ধা। শরীর জরাজীর্ণ। শেষ অবস্থা। দিবারাত্র তার একই

চিন্তা—'যদি কোনো প্রকারে গঙ্গাতটে গিয়ে মরতে পারতাম'।

অকস্মাৎ তার লক্ষ্য পড়ল শববহনকারীদের উপর। দেখল, তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। সুযোগ বুঝে সে শবটিকে ঠেলে ফেলে নিজেই সেই খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ল।

মধ্যরাত্রিতে প্রকৃতি শান্ত হলো। শববহনকারীরাও জাগরিত হয়ে শব নিয়ে পথ পরিক্রমা শুরু করল। রাত্রি অবসানে দিবসের হলো আগমন। তারা গঙ্গাতটে এসে পৌঁছল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধাটিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। বৃদ্ধার গঙ্গা প্রাপ্তি লাভ হলো।

বৃদ্ধাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো শব বহনকারীরা। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। পরে সেই শবটির খোঁজ করে দেখা গেল। পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

যার গঙ্গা প্রাপ্তি ছিল সে এইভাবেই পেলো। যার ছিল না তার জন্য সকল চেষ্টাই বিফল।'

গল্পটি বলেই মা মৃদু হাসতে লাগলেন।

মা আবার বলছেন :

'এক হয় ভুল হয়ে গেল বা অসমর্থ। সে তো আলাদা কথা। নিজের দিক থেকে ত্রুটি না থাকলেই হলো। আর দৈবযোগে অন্য রকম হয়ে গেলে নিজের মনে শান্তি থাকে। অনুশোচনা হয় না। কর্মে পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য থাকে।'

মা বিশেষ জোর দিয়েই বলছেন :

'কর্মকে পুরো করা। কর্ম পূরণ।'

আরও বিশদ হই।

কর্ম থেকে উৎপন্ন হয় কর্মের ফল। কিন্তু কর্মের পূর্তি না হলে ফলের উৎপত্তি হতে পারে না। কারণের সমষ্টি থেকেই কার্য উৎপন্ন হয়। এই সমষ্টির অন্তর্গত কোনও একটি অবয়বের মধ্যে যদি থাকে অপূর্ণতা তাহলে ঐ বৈগুণ্যের জন্য কর্মফলও পারে না আবির্ভূত হতে। জীব অল্পজ্ঞ। তার শক্তিও পরিমিত। সে চালিত হয় পূর্ব সংস্কারের দ্বারা। সূক্ষ্মদৃষ্টিও তার খোলেনি। ফল বিশেষের উৎপাদনের জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম যে সকল কারণের সম্মেলন আবশ্যক

হয়, তাদের মধ্যে কোনো অংশে ত্রুটি থাকলে সে তো ধরতে পারে না। এই অবস্থায় তার পক্ষে বিশুদ্ধভাবে কর্ম পূর্ণ করা কি প্রকারে সম্ভব? কর্ম পূর্ণ না হলে কর্মের ফল প্রাপ্তিই বা তার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব? এই জন্যই যাবতীয় কর্মপদ্ধতির মধ্যে অন্তে ভগবৎ স্মরণের ব্যবস্থা আছে।

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥

'অপূর্ণ কর্ম একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করতে পারেন। কৃতকর্মের ত্রুটির জন্য সরলচিত্তে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা। প্রার্থনায় সত্যিকার ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফল স্বরূপে প্রকাশ পান।

সমগ্র কর্মে তাঁর নির্ভর রাখতে হয়। কর্মের সুকৌশলতা—সবদিকটা তিনি তাঁহার—এভাবে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা।

কর্মেই যদি সব হয়, তবে আর বর প্রার্থনা কেন?

'বর প্রার্থনা একটা স্বভাব। প্রাপ্তির জন্য চাওয়া। তাঁর কৃপা সকলেই চায়। জীব অপ্রসন্ন তিনি প্রসন্ন। জীব প্রসন্ন হওয়ার দিক যেখানে, স্বয়ং জয়যুক্ত হয়ে নিজেতে নিজে প্রকাশ হওয়ার জন্য।'

'যে বর প্রাপ্ত হলে বর অ-বরের পারে যেতে পারা, সেই বর পাওয়ার জন্য। বর চাওয়া, নিজেকেই নিজের জন্য চায়। যে বর চাইতে জানে তার চাওয়া 'তুমি আমাতে নিত্য আছই—প্রকাশিত হও।' এটা চাই ওটা চাই—এতে বোঝা। বোঝা-বুঝির পারে যেতে হবে। চাওয়ার রূপেও তিনি, পাওয়া রূপেও তিনি। দিচ্ছেন তিনি। দিচ্ছেন তাই দেওয়া ক্রিয়া। দাতারূপেও তিনি। গ্রহীতাও তিনি। এই তিনটির উপরে যেতে হবে। ত্রিপুটি নাশ হওয়া চাই।

ত্রিপুটি নাশ হলেই যে স্থিতি। বর! কে কাকে দিচ্ছেন—এ একস্থানের কথা। বর চাওয়া পাওয়ার প্রশ্নই নেই। ঐ যে স্থিতি।

নিজেতে নিজে, নিজ প্রকাশের জন্যই নিজেকে ডাকা। আপনাকে ডাকা সেই আনন্দে স্থিতি লাভের জন্য।'

তারাপীঠ। তারাপীঠের মহাশ্মশান। মহাতান্ত্রিক ঋষি বশিষ্ঠদেবই প্রথম দ্বিভূজা শিলাময়ী তারিণী দেবীর প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে প্রাণবন্ত করে তুললেন। তারাপুরের শ্মশানভূমি 'তারাপীঠ'—'বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ' নামে হলো প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের সাধক কর্ণাভরণ বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডির আসনে সস্ত্রীক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এবং তারাও অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গে লীন হয়ে যান। ধীরে ধীরে সেই জাগ্রত সাধনপীঠও সুপ্ত হয়ে রইলো অরণ্যের অন্তরালে। অদৃশ্য হলো 'বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ'—তারাপীঠের শিলাময়ী তারিণীদেবী আর ভৈরব চন্দ্রচূড়, বনের মাটিতে। অকস্মাৎ একদিন রত্নগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক জয়দত্ত এসে নৌকা নোঙ্গর করলেন দ্বারকা নদীর পূর্ব-তীরে সুপ্ত মহাশ্মশানের বুকে। একমাত্র পুত্র খুবই অসুস্থ। মৃতপ্রায়। প্রভাতে মাঝিরা শ্মশানের মাঝে পুকুরের ধারে রান্নার আয়োজন করেছে। মাছ কেটে পুকুরের জলে ধুতে গিয়ে দেখে মৃত মাছ জীবিত হয়ে উঠলো। বিস্মিত ও হতবাক হলো মাঝিরা! অভাবনীয় ঘটনার কথা বলবার জন্য ছুটে এলো বণিক প্রভুর নিকট। বণিকের পুত্র তখন ইহলীলা সংবরণ করেছে। শোকাতুর বণিক তখন আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই মুহূর্তে মাঝিদের মুখে অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে দেহ মনে আবার ফিরে পেলেন শক্তি। মৃতপুত্রকে সেই পুষ্করিণীর জলে নিয়ে গিয়ে স্নান করালেন। সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্জীবন লাভ করলো বণিক পুত্র। অভিভূত হলেন বণিক। স্থান মাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে গভীর রাত্রিতে স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে তারিণীদেবী স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারামায়ের কৃপালাভ করে বণিক জয়দত্ত পরদিন প্রত্যুষে হৃষ্টচিত্তে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে লোকজন সংগ্রহ করে সেই অরণ্যকে দিলেন সরিয়ে, যে অরণ্য আর মাটি আচ্ছাদন করে রেখেছিল শিলাময়ী তারিণীদেবী আর অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড়কে। ধীরে ধীরে জেগে উঠলো বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ আর তার পুণ্যময় সাধনভূমি মহাশ্মশান। বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করলেন বণিক প্রবর জয়দত্ত। জনপদের মানুষেরা আবার জানলো চিনলো তারামাকে। মহাপীঠ তারাপীঠকে আর জীবিত কুণ্ডকে।

তারপর আবার অরণ্য এসে গ্রাস করলো তারাপীঠকে। সে অরণ্যকেও একদিন সরিয়ে দিলেন রাজা রামজীবন রায়। মন্দিরের সংস্কার ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের কর্মচারী রামজীবন। বিভব ও সদ্‌গুণের জন্য রাজা নামে খ্যাত হন। রামজীবনের বংশধর এঁড়োলের বাঁড়ুয্যেরা তারামায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন! এই সময়েই বিশে ক্ষ্যাপা নামে এক শক্তিধর শক্তিসাধক আবির্ভূত হন তারাপীঠের মহাতীর্থে। আবার জাগ্রত হলো তারাপীঠ।

রাণী ভবানী যখন নাটোরের কর্ত্রী, আসাদুল্লা খাঁ তখন বীরভূমের রাজা। তারাপুর তখন তাঁর অধীনে ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দুর দেবীকে লাঞ্ছিত ও অবহেলা করবেন এই আশঙ্কায় ভক্তিমতী রাণী ভবাণী নিকটবর্তী একটি মৌজা তাঁকে প্রদান করে তারাপুর গ্রাম নিজের অধীনে আনয়ন করলেন। তারাপুর-তারাপীঠ তন্ত্রোক্ত নাম! গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। রাজ্য সরকার থেকে পূজার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই সময় কমলাকান্ত ভটাচার্য মহাশ্মশানে সাধনা করে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। রাজযোগী রাজা রামকৃষ্ণও তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধনা করেন। তিনি তারামায়ের মন্দিরের সংস্কার ও নিত্য পূজার সুবন্দোবস্ত করেন। এই সময় রাজা রামকৃষ্ণ আনন্দনাথ নামে একজন ফৌল সাধককে প্রধান ফৌলপদে বৃত করেন। তাঁর সমসাময়িক যোগীবর বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যও তারাপীঠে ছিলেন। তাঁর শিষ্য তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। পূর্বাশ্রমের নাম মাণিকরাম মুখোপাধ্যায়। তারাপীঠের মহাশ্মশানই ছিল তাঁর সাধনভূমি। তিনিই ছিলেন বামাক্ষ্যাপার দীক্ষাগুরু। আর কৈলাসপতি বাবা ছিলেন বামাক্ষ্যাপার শিক্ষাগুরু। বামাক্ষ্যাপার আত্ম-প্রকাশের পর থেকেই আবার বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ নবজীবন লাভ করে। প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে শিলাময়ী তারাদেবী। যুগে যুগে নব নব সাধক সিদ্ধপুরুষ মাতৃসাধকের আগমনে তারাপীঠ জাগ্রত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কত যুগের কত সাধনার ইতিহাস নীরব হয়ে তারাপীঠের মহাশ্মশানের এই মাটি আর বাতাসের সঙ্গে রয়েছে মিশে। তাইতো আজও তন্ত্রসাধনার অন্তঃ-সলিলা ধারাটি বয়ে চলেছে।

সেই মহান তন্ত্রপীঠে আজ আবার এলেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা। সঙ্গে আছেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে ভোলানাথ এখানে সাধনা করে তারাসিদ্ধ হয়েছিলেন। আবার বাবা ভোলানাথের পালিতা কন্যা মরণীর বিবাহও এই মহাশ্মশানের পুণ্যভূমিতেই

সম্পন্ন করলেন আনন্দময়ী মা। অবশেষে, একদিন তারাপীঠের লীলা সাঙ্গ করে মা যাত্রা করলেন সম্মুখের পথে! পথেরও নেই শেষ—চলারও নেই বিরাম।

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা বলছেন :

'—ধর্ম মানে কি ?

যে ধারণা করেছে। চোর চুরি-বিদ্যা ধরেছে। কিন্তু আবার দেখা যায় সেই চোরই সাধু হয়ে গেছে। তবেই চুরিটা তার স্বধর্ম নয়, যা বাস্তবিক ধর্ম তা কখনও পরিবর্তন হয় না। যা পরিবর্তন হয় তা ধর্ম নয়। অধর্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম। তা ছেড়ে অপর যে সব পরধর্ম (অধর্ম) নেওয়া, সর্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার জগতে যেমন আগুনের ধর্ম। জলের ধর্ম। সেই রকম সংস্কার অনুযায়ী যার যার যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে, গুরু শক্তি দ্বারা তার ভিতর দিয়েও তদমুখী করিয়ে নেন।'

—ধর্ম বিষয়ে গুরুর প্রয়োজন আছে কি ?

আছে বৈকি। গুরু নাম দেন। চৈতন্য দেন।

তোমরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে শিক্ষক রেখে দাও কেন ? লেখাপড়া শিক্ষা দিতে যেমন একজন গুরুর দরকার, ধর্ম-বিষয়েও সেইরকম একজন গুরুর প্রয়োজন আছে বৈকি।

—পুস্তকেই তো সব লেখা আছে, আবার গুরু কেন ?

'এ পুস্তক নিয়ে পড়া যায় না। বাইরের পুস্তক পড়া যায়, এ যে ভিতরের পুস্তক। নিজে পড়া সম্ভব নয়। গুরু তা পড়ে দেন, যদি গুরুর মতো গুরু হন।

সদ্‌গুরু লাভ করতে হলে বিশুদ্ধ চেষ্টা চাই। চেষ্টা বিশুদ্ধ হলে সদ্‌গুরু লাভ হবেই হবে। দেখ না ছেলে যখন মা মা করে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে মা কি তখন স্থির থাকতে পারেন ? তিনি যে আসতে বাধ্য।

গুরুকৃপাতে তোমার মনের অন্ধকার গুহা আলোকিত হয়ে উঠবে। অখণ্ড শান্তিলাভ করবে। তাইতো বলি, গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখাই একমাত্র কর্তব্য। সংসারের সঙ্গ, তার ভিতর শান্তি কোথায় ? সর্বক্ষণ জ্বালাই থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কিছুসময় শূন্য ঘরে বসবে। পূর্ণময়ের অনুসন্ধানে প্রাণমন উন্মুখ করে কিছুটা সময় দিতেই হবে। কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে শূন্য করে কেবল গুরুর উপদেশ সঙ্গে নিয়ে থাকবে। যেখানে শূন্য সেইখানেই পূর্ণ।

কর্ম থাকতে গুরুশক্তি বোঝা যায় না। তাই কর্ম শেষ করবার জন্য পুরুষকারের দরকার। কর্ম করেই কর্ম শেষ করতে হয়।'

—পুরুষকার মানে কি ?

আনন্দময়ী মা'র ভাষায়,—'পরমপুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা।'

—কৃপা কি পুরুষকার সাপেক্ষ ?

'নিশ্চয়। তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন এ কথা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ যদি কৃপার বন্যা এসে পড়ে, তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না! তোমার যে এখনও সময় হয় নি। তোমার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পাচ্ছ। যেটুকু আকাঙ্ক্ষা সেটুকু পাবে।

কৃপাই তো অনেক সময় দুঃখের বেশে বিপদের বেশে দেখা দেয়। মা, যেমন কত সময়ে ছেলেকে থাপ্পড় মেরে শিক্ষা দেয়—তেমনি ভগবানের থাপ্পড়কে যে কৃপা বলে চিনতে পারে সেই ব্যক্তিই কৃপার উপযুক্ত পাত্র।

কৃপা যে অহৈতুকী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। কৃপা না থাকলে তোমরা থাকতে কোথায় ?

করুণাসাগর তিনি। তোমাদের শূন্য ঘট পূর্ণ করবার জন্য তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। তোমরা নিতে জানো না এই তাঁর দুঃখ। তোমাদের একেই তো সব ছোট্ট ছোট্ট আধার। বেশী কৃপা ধরে না। তার উপর আবার নিজের ঘট উল্টো করে রেখেছো—যেটুকু কৃপা পাচ্ছ তাও পড়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছো না। গলানো সোনা মাটির পাত্রে ঢাললে পাত্র ফেটে সব সোনা পড়ে যায়। সোনা রাখার জন্য উপযুক্ত আধার চাই। উপযুক্ত আধার না হলে কৃপা ধরে রাখবে কেমন করে ?

তাইতো এ শরীরটা বলে এক নিশ্বাসের বিশ্বাস নেই। অহং বোধ ত্যাগ করে, কর্ম করে যাও। সময় হলে ফল পাবেই।

বাস্তবিকই সাধন ভজন করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মানুষ বুঝতে পারে আমার কিছুই ক্ষমতা নেই। তিনি যেমন করাচ্ছেন আমি তেমনই করছি। কিন্তু সে অনুভূতি কোথায় ? বাস্তবিক এই অনুভূতি হলে তো দুঃখ কষ্ট কিছুই করবার নেই।

তোমরা যে অহং বুদ্ধি দিয়ে লেখাপড়া কাজকর্ম সবকিছু করছো, সেইরূপ ঐদিকে যাবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করো। সব আমরা করতে পারি আর ধর্ম কাজের কথা হলেই 'তিনি না করাইলে কি করিয়া করিব ?' এ কথা বলা চলে না।

গুরুর উপর নির্ভর করো, সংসার যাত্রা সুগম হবে। আর কোনো ভয়ই থাকবে না। তিনিই বলে দেবেন পথের কথা।

এক লক্ষ্য হলেই গুরুর উপর নির্ভর এসে পড়ে। তুমি সর্বত্র গুরুকে অনুভব করতে চেষ্টা করো! গুরু কি এতটুকু জিনিষ। মনে করো এই আকাশ বাতাস গুরু। যে দিকে যা দেখি সবই আমার গুরু। এইভাবে আমাকে জড়িয়ে আছেন। আমার হাড়, মাংস। আমার প্রাণবায়ুরূপেও গুরু। গুরু ছাড়া কিছুই নাই। গুরু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু ব্যাপিয়া আছেন। এই অর্থে তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আবার বিচার করে দেখলে দেখা যায় জগতে এক সৎবস্তুই আছে। তিনি গুরু আবার তিনিই শিষ্য। গুরু শিষ্যে কোনও ভেদ নেই। এই অর্থে গুরু তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তা ছাড়া গুরু মন্ত্ররূপেও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। বিষয়টি খণ্ডভাবে দেখলে দেখা যায় যোগীরা যোগবলে একই সময় বহু জায়গায় থাকতে পারেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু যোগবলে খণ্ডভাবে সমস্ত শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারেন।

তাইতো গুরুর আদেশ পালন করে চললে গুরুই তাকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করেন। ধীরে ধীরে সবই হয়।'

এ সমন্ধে একটি সুন্দর গল্প বললেন আনন্দময়ী মা :

'এক ছিল চোর। চুরি করাই ছিল তার ব্যবসা। হঠাৎ তার কি মনে হওয়াতে এক সাধুর কাছে এলো দীক্ষা নিতে। সাধুটিও খুশী হয়ে তাকে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু বলে দিলেন—খবরদার চুরি করতে পারবি না আর মিথ্যা কথাও বলবি না।' চোরটি গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে চললো। ফল হলো দারিদ্রতা আর অনাহার। স্ত্রী-পুত্র পরিবার অনাহারে দিনাতিপাত করতে লাগলো। কিছুদিন পর গুরু শিষ্যের খোঁজ নিতে এসে দেখলেন, বড়ই দুরবস্থায় সে দিনাতিপাত করছে। অনাহারে সমস্ত পরিবারটি মরতে বসেছে। গুরু খুবই ব্যথিত হলেন, অবশেষে শিষ্যকে বললেন,—আচ্ছা তুই চুরি করে পরিবার প্রতিপালন কর। কিন্তু খবরদার মিথ্যা কথা বলবি না কখনও।

শিষ্যটি গুরুর আদেশে আবার চুরি করতে শুরু করে দিলো।

একদিন এসেছে রাজার বাড়ীতে চুরি করতে। রাজা বুঝতে পেরেছেন চোর এসেছে বাড়ীতে। কিন্তু তিনিও কি যেন মনে করে হঠাৎ গোপন বেশ ধরে চোরের কাছে গিয়ে বললেন, দেখ ভাই আমিও চুরি করতে এসেছি। তোমাকে কাজে সাহায্য করবো। কিন্তু আমি এ পথে নবীন। আজই প্রথম আরম্ভ করেছি। তাই তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কিভাবে কি করতে

হবে। আর যা পাওয়া যাবে তার তিন ভাগের দু'ভাগ তুমি আর একভাগ আমি নেবো।

চোরটি রাজী হয়ে গেলো।

রাজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর চোরটি রাজার ঘরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙ্গে মোহরের থলিগুলি নিয়ে এলো। এদিকে ভোরও হয়ে এসেছে। তাই মোহরগুলি তাড়াতাড়ি ভাগ করে একভাগ রাজার কাছে ফেলে আর দু'ভাগ নিয়ে সে দৌড়ে চলে গেলো। যাবে আর কোথায়! অর্ধেক পথেই রাজার লোকেরা চোরকে ধরে ফেললো।

পরের দিন রাজসভায় রাজা চোরটিকে বিচারের জন্য আনলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চুরি করেছো?

লোকটি প্রত্যুত্তরে বললো, হ্যাঁ মহারাজ, আমি চুরি করেছি।

—কি পেয়েছো?

চোরটি তার ভাগের মোহরগুলির সংখ্যা বললো। রাজাও গুণে দেখলেন চোরটি ঠিক কথাই বলেছে।

তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, বাকী মোহর কি করেছো?

চোরটি গত-রাত্রির ঘটনার কথা খুলে বললো। রাজা সবকিছু শুনলেন এবং তৃতীয় থলিটি গুনে দেখলেন, চোরটি সত্যই বলেছে।

বিস্মিত হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চোর। চুরিই তোমার ব্যবসা। ইচ্ছা করলে তো নিজে যা পেয়েছো তার একভাগ সঙ্গীকেও না-ও দিতে পারতে। নিজে আরও বেশি নিলে না কেন?

প্রত্যুত্তরে চোরটি বললো, মহারাজ আমি চোর সত্য। কিন্তু আমার গুরু মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। চুরি না করলে আমার জীবিকা নির্বাহ হয় না দেখে তিনি চুরি করতে আদেশ দিয়েছেন। তাই আমি কখনও মিথ্যা বলি না। সঙ্গী লোকটির কাছে আমি যে অঙ্গীকার করেছি তার অন্যথা কেমন করে করবো? আর আপনার কাছেও একবর্ণ মিথ্যা বলছি না। গুরুর আদেশ কেমন করে লঙ্ঘন করবো বলুন?

রাজা চোরটির সত্যবাদিতায় ও গুরুর প্রতি নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে বললেন,—আজ থেকে তোমার পরিবারের ভার আমি নিলাম। তুমি চুরি করা বন্ধ করে দাও।

চোরটি রাজার ব্যবহারে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে করজোড়ে প্রণাম করে, গুরুর সন্নিধানে চলে গেল। বাকী জীবন গুরু-সেবায় উৎসর্গ করে মুক্তিলাভ করলো।'

গল্পটি শেষ করে মা আবার বলছেন :

'গুরু শিষ্য সম্বন্ধে একটা বন্ধন। গুরু শিষ্যের মঙ্গল কামনা করেই এই বন্ধন সৃষ্টি করেন। এই বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হয়। যে পর্যন্ত শিষ্য মুক্ত না হয় সে পর্যন্ত গুরুরও যে বন্ধন ঘোচে না।'

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো অতি গুরুভার ছন্দে দিন আসে রাত্রি যায়। আবার সেই রাত্রি প্রভাত নব-উষা!

অকস্মাৎ একদিন ভেঙ্গে গেল ভক্তসনে মায়ের আনন্দমেলা। ২৩শে বৈশাখ ১৩৪৫ শুক্রবার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ। পরম একটি ভাগবত জীবনের হলো অবসান। একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ আচ্ছন্ন করে ফেললো সমস্ত পৃথিবীকে। ভক্তরা শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখলেন তাঁদের পরম আরাধ্য পিতাজীর দেহ নিস্পন্দ দৃষ্টি স্থির বদনমণ্ডল অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বিচলিত হলো তাঁদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়।

শ্রীশ্রীমা তখনও ধীর স্থির অচল অটল। স্তব্ধ গৃহের নীরবতাকে ভঙ্গ করে শুধু মা কবিরাজকে বললেন, কি, তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে তো?

স্তম্ভিত হৃদয়ে কবিরাজ মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ—মা।

এইভাবে নিঃশব্দে বাবা ভোলানাথ যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে। ভক্তরা পরমপুরুষের দিব্যদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন দেরাদুন আশ্রম থেকে হরিদ্বারে। অবশেষে হরিদ্বারের গঙ্গায় দিলেন জল-সমাধি। সুরধুনির পূতধারা বরণ করে নিল বিশ্বপিতার দিব্য দেহ।

পরবর্তীকালে মা ভক্তদের বলেছিলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথের মৃত্যু পূর্ব ঘটনার ইতিহাস। শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায় :

মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে ভোলানাথ বলিলেন, 'ভাত খাইতে ইচ্ছা করে।' রাত্রি তাই তখন দেওয়া গেল না। পরদিন ভোর বেলাতেই ভাতের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু যখন যোগেশ (যোগেশ ব্রহ্মচারী) সেই ভাত ও মুগের জুস মিলাইয়া সরবতের মত করিয়া খাওয়াইতে গিয়াছে তখন বলিলেন, 'মা খাইয়াছে? আমি মা'র প্রসাদ ছাড়া খাইব না।'

যোগেশ তখন এ শরীরটার মুখে একটু দিয়া দিতেই কাতরভাবে ভোলানাথ বলিলেন, 'তুমি আমাকে এই প্রসাদ খাওয়াইয়া দিবে?'

এ শরীরটা বলিল, 'হাত ত ঠিক থাকে না। আচ্ছা দিতেছি।' এই বলিয়া তাঁকে খাওয়াইয়া দিলাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে সবটা খাইলেন। তারপর বলিলেন, 'আমি তোমাকে একটু স্পর্শ করিব।' এ ভাবটাও দেখিলাম শিশু যেমন মা'কে ধরিতে চায়, একেবারে সেই ভাব। হাত বাড়াইয়া দিতেই দুই হাত দিয়া এ শরীরের হাত ধরিলেন। কিন্তু তখনই কাঁপিতে কাঁপিতে ওঁর হাত পড়িয়া গেল। তারপর একবার বলিলেন, 'তোমাকে দেখিব।' প্রথমে পরিষ্কার দেখেন নাই, পরে পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, 'দেখিয়াছি'। এই বাসনা যে জাগিবে এ শরীরটা জানিত। তাই কবিরাজকে পূর্ব হইতেই বলা হইয়াছিল, চোখটায় মাখন দিও। সাবধান মত সর্বদা লক্ষ্য রাখিও। একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে? বলিলেন 'হ্যাঁ—হইতেছে। তবে কোথায় হইতেছে কিছুই বুঝি না।' এ শরীরটা ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না। তখন কাত হইয়া ভোলানাথ শুইয়া ছিলেন। এই শরীরের হাত দিয়া দুই তিন বার ওঁর মাথা হইতে সর্ব শরীর বুলাইবার মত হইয়া গেল। এর পূর্বে ত আর অসুখ অবস্থায় ধরা ছোঁয়াও বড় হয় নাই। সকলকে দিয়া সেবা করাইয়া নেওয়া হইতেছিল মাত্র। কিন্তু এখন এইভাবে একটা ক্রিয়া হইয়া যাওয়ার পর দেখিলাম ভাবটা বেশ আনন্দপূর্ণ। আর যেন কোন যন্ত্রণা নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, এখন কোন কষ্ট আছে কি? হাসিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন, 'আনন্দ।'

আবার বলিলেন 'আমি যাই'! এ শরীরটা বলিল, ও কথা বলিতে নাই। আসা যাওয়া আছে কি? তখন বলিলেন, 'তুমি ত চিরদিনই আমাকে এ আশা দিয়া আসিতেছ।' সন্ধ্যার পূর্বেই গোলা আমাকে একছড়া মালা দিয়া গিয়াছিল, রোজই দিত। আজ মালা ছড়া গিয়া ভোলানাথের ঘরে রাখিয়া দেওয়া হইল। কারণ রাত্রিতেই যখন মালার দরকার হইবে তখন ত পাওয়া যাইবে না। এ আভাষ পূর্বেই এই শরীর পাইয়াছিল। শান্তি বলিল, সে মালাটা ছুঁইতে গিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাকি মনে হইতেছিল মালাটি জীবন্ত। ভোলানাথের শরীর ত একেবারে উলঙ্গ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বলিলেন, 'আমার শীত করিতেছে।' তখন ওঁরই একটা গেরুয়া রংয়ের কাপড় দিয়া শরীর ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কিছুদিন পূর্বে যখন সন্ন্যাস নেওয়ার কথা হয় তখন ভোলানাথ একবার এ শরীটাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার উপর ত আমার মাতৃভাব আছেই, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না। যদি সন্ন্যাস নেই তবে প্রথম তোমাকে সকলের সম্মুখেই মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হাত হইতেই প্রথম

ভিক্ষা নিব। ঘটনাচক্রে তাঁহার সে কথা পূর্ণ হইয়া গেল। অন্ন ও বস্ত্র শেষ এই শরীরের হাত দিয়াই নিল। সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি ত কীর্তন ভালবাস একটু কীর্তন শুনিবে? বলিলেন, 'আচ্ছা'। যোগেশকে ডাকিয়া কীর্তন করিতে বলা হইল। কিছুক্ষণ কীর্তন হইল। তারপর কীর্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার কি সন্ন্যাস মন্ত্র মনে আছে? বলিলেন, আছে। প্রণব ও মন্ত্র বাহিরে উচ্চারণ না হইলেও ভিতরে যে হইতেছিল তাহা বোঝা যাইতেছিল। সন্ন্যাস মন্ত্র যদিও তিনি মানস-সরোবরের তীরে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসের ক্রিয়াদি তাঁহাকে কুম্ভ স্নানের দিন করিতে বলা হইয়াছিল। এই অনুসারে তিনি নিজে নিজেই সেইদিন ক্রিয়াদি সব করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষের এবং ভোলানাথের দুই জনেরই দেখিলাম সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর বেশী দিন শরীর রহিল না।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বেই তাহার মাথায় (ব্রহ্মতালুতে) হাত দিয়া এ শরীর বসিয়া ছিল। ঐ ভাবেই হাত কিছু সময় রহিল। এ শরীর ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না, হইয়া যাইতেছিল। শেষ নিঃশ্বাস পড়িলে এ শরীর কবিরাজকে বলিল, কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত? সে স্তম্ভিতভাবে এ শরীরটার মুখের দিকে চাহিয়া ভোলানাথের দিকে চাহিল ও বলিল,—'হ্যাঁ মা।' সেদিন এইভাবে নিঃশব্দে সব হইয়া গেল।' ভোলানাথের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল।

সৃষ্টি লীলার অপার বিভূতি যে মাতৃভাবের দ্যোতনায় জগৎ চরাচর দীপ্তিমান হয়েছে, সেই অখণ্ড মাতৃভাবের সর্বতোমুখী প্রকাশ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র সকল কথা ও কর্মে, সকল লৌকিক ব্যবহারে যায় দেখা। ভক্তজনের নিকট শিশুকন্যার মত আবদার, শরণাগত আর্তের প্রতি মাতৃরূপে অভয় প্রদান, জিজ্ঞাসুর নিকট বাণীরূপে অন্তর্জগতের সত্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করা সকলই একই মহাশক্তির লীলাবিলাস।

মা বলেন, 'এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।'

"এক আর অনন্ত আলাদা কোথায় ?
একের মধ্যে অনন্ত অনন্তের মধ্যে এক।"

অনন্তরূপে অনন্তের আত্মপ্রকাশ হলে একের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে অনন্তের দিকটা সমগ্রভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হলে স্বভাবতই একের দিকটাও আর প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না। এটা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। শুধু নানা অথবা ভেদ দর্শন করলেই অভেদের সাক্ষাৎকার হয় না। কিন্তু এই ভেদ দর্শন করতে করতে যদি অনন্তে মন অবরুদ্ধ হয় অর্থাৎ সীমা প্রাপ্তির অভাববশতঃ যদি ভূমা হৃদয় ক্ষেত্রে ফুটে ওঠে তখন অভাবরূপে অনন্তই জাগ্রত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনন্তে প্রতিষ্ঠিত এক অখণ্ড সত্তা প্রকম্পমান হয়। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত থেকে যেমন একের জ্ঞান সম্ভবপর তেমনি পক্ষান্তরে একের জ্ঞান থেকেও অনন্তের আভাস ফুটে ওঠে, কিছুই অসম্ভব নয়। সাধকের অন্তঃপ্রকৃতি এবং সংস্কারের তারতম্যবশতঃ কেহ অনন্তের মধ্য দিয়ে এককে ধরে এবং কেহ বা একের মধ্য দিয়ে অনন্তকে ধরতে সমর্থ হয়।

তাইতো মা বলছেন :

'ভুলের রাজ্যে ভুল। যখন দেহ বল তোমার আকারটাই হলো দাও দাও। দাও মানে অভাব আছে। অভাব যেখানে সেখানে ভ্রান্তি অজ্ঞান। যেখানে ভ্রম আর অজ্ঞান সেখানেও ভুল থাকবেই ! এর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার দিকে যখন সাধনা করো বা কৃপা পেয়ে যখন সাধনা হয়—সাধনা মাত্রেই কৃপা—তখন কত স্তর পার হয়ে দেখতে পাও আমিকে সমগ্ররূপে। আমি আছি তবেই না গাছপালা যত ইত্যাদি। যত রূপ রয়েছে সে তো আমির। যেখানে আমার প্রকার প্রকাশটা এই দাও দাও ভাবটা। এই রূপেই অনন্ত। এই দেহটার আকারেই অনন্তভাব। অনন্ত প্রকাশ। এই যে আর সব আকার রয়েছে সবই তো অনন্ত। তাহলে আমিও অনন্ত। তখন দেখতে পাওয়া যায় যতগুলি আকার প্রকার প্রকাশ রয়েছে সেটাও আমিই—নিত্যই আছি। এ তো গেল আমি নানারূপে। আমি তো অনন্তরূপে, আর এই যে রূপ রয়েছে তার অনন্তরূপ প্রকাশ। এই অনন্তগুলিও আমার মধ্যে অনন্তপ্রকার রয়েছে—আমি সকল

আকার এই সবের। যে আলাদা দিকগুলি রয়েছে সেই সকলের দিকটাও আবার অনন্তপ্রকারে আমাতে। এই রকম প্রকাশ যখন প্রত্যক্ষ—অনন্তের দিকটাও যখন সমগ্রভাবে প্রকাশ হলো তখন একের দিকটাও আসতে বাধ্যই।

এই যে অনন্ত আর অন্ত এই তত্ত্বটা যার পূর্ণাঙ্গীভাবে প্রকাশ হবে, তখন অনন্তে অন্ত, অন্তে অনন্ত। এখন সাকার নিরাকারের সমাধান করো। দেখো একটা কথা, ব্যক্তিগত আবরণ যেখানে থাকে ঐটা না হলে খেলটা চলে না। যেখানে ভুলটা হবে, সেখানে আবরণ ঢাকা না দিয়ে নিলে খেলা হয় না। সুতরাং এটা থাকা স্বাভাবিক। এজন্য জগৎ-সৃষ্টি দৃষ্টি। জীব মানে তো বদ্ধ, বদ্ধ মানেই আবরণ, সেইখানেই ভুল। অজ্ঞান, জ্ঞান নাই আবৃত আছ বলে। অদ্বৈত পথের সাধক দ্বৈত নেবে না। সগুণ পথের সাধক অদ্বৈতটাও নেবে না। কিন্তু চলতে চলতে বিভূতি কি তা বুঝে যাবে। নির্গুণ যে বলে তার মধ্যেও কথা আছে, এরও প্রকাশ হওয়া চাই! এইজন্য সাকার কি, নিরাকার কি তার সমাধান হয়ে যাওয়া। সেখানে এক রকমের স্থিতি মাত্র নানাটা চলে গিয়েছে—স্বয়ং প্রকাশ তা এখানে নয়। অদ্বৈত পথে চলতে চলতে বিবেক বৈরাগ্য দ্বারা এক আত্মার প্রকাশ চাই। আলাদা আলাদা সব জ্বালিয়ে এক হয়ে গেল, ঐখানে স্থিতি এসে গেল। কেউ হয়তো বলবে এই অদ্বৈত স্থিতি। জগৎ পরিবর্তন—এর মধ্যে যে গতি, স্থিতি, নানা এই সমস্তই চলে গিয়ে এক। এখানে নানা থাকেই না। এখানে এক ব্রহ্ম, এক আত্মা কে?—একে অদ্বৈত স্থিতি বলে।

আর এক কথা, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, সবই চিন্ময়। আকার প্রকার প্রকাশ সবই চৈতন্যময়। অপ্রাকৃত আর কি! যেখানে পর পর নাই—এই একমাত্র—তাঁরই বিগ্রহ। জগৎ দৃষ্টিতে যে তোমার 'নানা' এখানে সেইরূপ নানা নেই। বিভূতি—বিভু, যা একমাত্র তিনিই স্বয়ং বিগ্রহ। তি—তিনিই নানার মধ্যে বিভূতিরূপে একমাত্র। যেমন জলে বরফ, বরফে জল। জল না থাকলে বরফের আকার এল কোথা হতে? জলেতে বরফ হওয়ার ভাব যদি না থাকে তবে বরফ হয় কি প্রকারে? অতএব সমগ্র তাতে। তিনি সমগ্রতে —সেই যে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—অদ্বৈত নিত্য সেবক। নিত্য দাস। নিত্য দাস মানে অনিত্যতা নেই। আকার প্রকার রূপে ঐ। যিনি নিরাকারের রাস্তায় যাবেন যদি তাঁর এক অদ্বৈত—এখানে স্থিতি থাকল আর লীলা ক্ষেত্রটা গেল না তবে হলো না। দ্বৈত কি তার সমাধান হলো না। এক এক দিকের কথা তো। কিন্তু সর্বাঙ্গীন পেতে হবে। নিজেকে ফিরে পেতে হবে। গাছের

একটি কলম পেলে, ঐ কলম থেকে গাছ হলো! বিশাল বৃক্ষ তারই মধ্যে সুপ্ত থাকল। কিন্তু ঐ গাছ থেকেই আবার কলম পাওয়া যাবে, তখন নিজেকে ফিরে পাওয়া হলো। উপমা সর্বাঙ্গীন হয় না। সবটার মধ্যেই যে সেই এক আর একের মধ্যে যে সব যুগপৎ এই প্রকাশটা হয়ে আছেও, নাইও, আছেও না। নাইও না। কি রকম? বীজের মধ্যে দেখলে একটি বীজ গাছপালা বা অন্য কোনো আকার প্রকার কিছুই নাই। আবার গাছটি হলো তার মধ্যে পাতা ফুল ফল গাছ অনন্ত দিক।

যখন একটি বীজমাত্র তখন কিছুই নাই; কাজেই নাই। আবার যখন গাছ—তখন আছে। নাই যে ছিল না এটাও তো ঠিক। অতএব নাইও না, যেহেতু যা দেখা গেল এটা আছে। কি রকম? অনন্তরূপে আর একরূপে। আছেও না, যেহেতু নাই ছিল। ভাষা কোথায়? বল না সৎ অসৎ, না সৎ, না অসৎ। যেখানে অদ্বৈত বল না অথবা নিজেকে নিয়ে নিজেই লীলা খেলাটা। ঐ যে বলা হলো সমস্তটা জলে এক হয়ে গেল, যেন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক হয়ে যে গেল এখানে একটা অন্ধকার আছে। স্বয়ং প্রকাশ তো নয়। চিন্ময় রাজ্যও আসে নি। এখান থেকে কখন যে উত্থিত হবে বলা যায় না। চিন্ময় যদি এসে যায় এখানে বিগ্রহ আসবে 'ত' হিসাবে। জগৎ-দৃষ্টিতে যেটা ছিল দুঃখ সেটা চিন্ময়েতে হলো বিরহ অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে রহ। এই বিরহটা অনন্ত, নব নব প্রকাশ! ভগবানের কল্পনা মাত্রেতে সৃষ্টি।'

সৃষ্টি কি?

তিনি স্বয়ং সেই।

তবে আলাদা পর পর কেন?

পর পর নয়—বিন্দুতে সিন্ধু রয়েছে কি করে? এক হয়ে যখন তিনিই বিগ্রহরূপে প্রকাশ হলেন—রাধাকৃষ্ণ—এটা নিত্যই আছে। কোথায়? বৃন্দাবনে।

যার হৃদয়গ্রন্থি খুলে গিয়েছে তার একমাত্র বৃন্দাবনই,—এই যে জিনিষটা তুমি লীলারূপে পেলে এটা অনন্ত। এই অনন্তটা কোথায় হবে? জগতের যত ইতি এটা কি বাদ দিয়ে?

পরমহংসদেব বলেছেন, 'মা নাচছে।'

– বৈষ্ণব কে?

— সর্বত্র বিষ্ণুদর্শন।

জগতের boundary মোহ।

এজন্য নানাশক্তি—এটা মোহ, এটা প্রাকৃত, এটা অপ্রাকৃত, এটা তোমরা ভাগ করছ। কিন্তু সমগ্রটাই তাঁর লীলা। সমগ্রটার মধ্যে তাঁকে পাওয়া।

অপ্রাকৃত পর পর নাই Boundary-এর মধ্যে যে থাকবে তার হৃদয়টা বৃন্দাবন হবে না। যখন পেল, একমাত্র বৃন্দাবন। একমাত্র শিব। একমাত্র অদ্বৈত। তবেই হলো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর খেলা। এটা আর এটা নয়—প্রকৃতিটাও তাঁরই। স্থিতি এসে গেলে প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত কোনো কথা নেই। যেখানে একমাত্র চৈতন্যময় প্রকাশ হচ্ছে সেখানে কেউ অদ্বৈত স্থিতি নিয়ে গেল, কেউ লীলার প্রকাশটা নিল। তিনি বিগ্রহরূপেতে, বিগ্রহরূপেতেও নয়। সমগ্র মানে সম অগ্র। সব অগ্রেই যে সমতা আছে সেটা যদি প্রকাশ না হয়, জগৎ দৃষ্টিতে দেখবে তবে অদ্বৈত নয়। আর যখন অদ্বৈত নেবে ফিরিয়ে পাওয়া কি ?

জগতে শোকে তাপে যে আচ্ছন্ন ছিল—আচ্ছন্ন মানে, আচ্ছাদন—এটা চলে গিয়ে একমাত্র 'তৎ'। বিগ্রহ এতে গেলে সবটার মধ্যে—গতিরূপে প্রতিবিম্বরূপে কে ?

সেই একমাত্র।

এখানে দুঃখ কষ্ট কে দেবে ? তোমার সমগ্র জিনিষটা একত্ব হয়ে যা আছে —তার প্রকাশ হলো। যে দুঃখে আজ দুঃখিত ছিলে সেটা হলো তার বিরহ। জাগতিক দুঃখ অভাবে, আর ভগবানের জন্য বিরহ স্বভাবে।

যে সাকার সগুণ নিয়ে চলছিল তার কি হলো ?

প্রথমেতে তার নিজের মূর্তিটুকুই। তার চলতে চলতে কি হয়— আমার ঠাকুর কি এইটুকুই ? রাম। কৃষ্ণ। শিব। দুর্গা। সবের মধ্যে আমারই ঠাকুর। আমার ঠাকুরই নানারূপে। এরপর সকলের মধ্যে আমার ঠাকুর। আমার ঠাকুরের মধ্যে সকলে। এই চলার মধ্যে বহু স্তর বহু স্থানে আছে। এক জায়গার কথা বলা হচ্ছে। প্রথমতঃ যখন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তখন আমার ঠাকুরই ঐ। ভক্তি শ্রদ্ধায় তাকে এত ছোট রাখতে দিতে চায় না। সাধকের দীনভাব। ভক্তিভাব বেড়ে চলে। চরমে তো সবের মধ্যেই সে! তাঁরই মধ্যে সব। একের মধ্যেই সেই বিগ্রহটিকে ফিরে পেল।

বীজের থেকে গাছ হলো আবার গাছ থেকে সেই বীজটি ফিরে পেল। 'দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ।' নিজেকে পেয়ে স্বরূপ প্রকাশের পর এখন যদি সে ঐ ঠাকুরের সেবা পূজা নিয়ে থাকে—নিজেই পূজা নিজেই করে, এ তার লীলা। —কার লীলা ?

লীলা তো ভগবানের। লীলা আবার কারও হয়?

কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে বললেন আনন্দময়ী মা।

মা আবার বলছেন ঃ

'যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ ব্যাভিচারের কথা। যতক্ষণ একমাত্র সে-ই সর্বভাব, সর্বরূপ ও অরূপে প্রকাশ না হয় ততক্ষণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন। একনিষ্ঠ হওয়া একমাত্র ইষ্ট প্রকাশের জন্য। যথাশক্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা।'

'আশাটা মহান রাখতে হয়।'

এমনও দেখা যায় লোকে শুধু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করেই উর্ধ্বস্তর হতে আরও উর্ধ্বস্তরে চলে যায়।

তোমারা 'জীবন' বলতে তো এই জীবন ধরছো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তো ঠিক নয়। কত জন্মের সংস্কার যে তোমাদের মধ্যে আছে তা তো তোমাদের জানা নেই। এই যখন অবস্থা তখন লোকের শেষ সময় কি হবে তা বলবার উপায় নেই। এ দেহ বলে, সব কিছুই হতে পারে। সেইজন্যই আশাটা ছোট রাখতে নেই।

ভাবতে হয় তিনি যখন মুক্তির ভাবটা হৃদয়ে জাগিয়ে নিয়েছেন তখন মুক্তিও দিয়ে দেবেন। আলোর আভাস যখন ভাবনারূপে এসেছে তখন তার পূর্ণ প্রকাশ হওয়াটা অসম্ভব কি? সন্দেহ দুর্বলতা মাঝে মাঝে আসবেই কিন্তু তাই বলে দুর্বলতার আশ্রয় নিতে নেই। মহান আশা নিয়ে কাজ করে যাওয়া

পরম পথের যাত্রী হয়ে চলা ভাল নয় কি? মহাপথে চলাই তো চাই। পরম পদ, পরম পথ প্রকাশ যেখানে।

কিছুই করতে পারি না, নিজের কিছু করবার শক্তি নেই এই সব কথা যে বলা হয় এগুলো শুধু মুখের কথা। কারণ সংসারের কাজ তো কিছু করছো এবং কিছু করতে পারো বলে মনে মনে বিশ্বাসও আছে। যদি নিজে কিছুই করবার শক্তি নাই এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হতো, এবং তা যদি অনুভূতিতে আসত

তবে বুঝতাম সাধনরাজ্যে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছ। কৃপা দ্বারাই যে সব হয় তাতে আর সন্দেহ কি? সাধনের উদ্দেশ্যই এই যে, নিজের শক্তির সীমা অনুভব করা—প্রাণে প্রাণে বুঝা যে আমার কিছুই করবার শক্তি নাই। আর মজাও এমন, সবই এমন সুন্দর যে, সাধনের অবস্থায় দেখা যায় আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র বই কিছুই নই। এটা অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ্য।'

মায়ের ভাষায়:

'এই দেহের উপর দিয়ে যখন সাধনার অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল এবং একটা অজ্ঞানতার ভাব চলিতেছিল তখন দেখিয়াছি, এই দেহটা তাঁহার হাতের যন্ত্র বই কিছুই নহে।'

মা আবার বলছেন ভক্তদের। তাঁর নিজের ভাষায়:

'সাধনের উদ্দেশ্য হইল আমরা নিজে যে কিছু করি না, করিতে পারি না তাহাই অনুভব করা। কাজ করিয়া যাও, তাঁহার কৃপায় সব সময় সবকিছুই হইতে পারে।'

'হরিনামেও কাজ হতে পারে। অক্ষরই ভগবান হরি। তাঁর নামের প্রতি খেয়াল রাখা চাই। হরিবোল কীর্তন করতে করতে হরি শব্দের সাথে আরও অন্যান্য মন্ত্রের উচ্চারণ হয়ে যায় এবং বসবার ধরন বদলে যায়। আগে সাধনার খেলার সময় এই শরীরটারও এমনটা হতো। ভক্তির উদয় হলে যে কোনো শুদ্ধশরীরে এমন হতে পারে। ঠিক নিয়ম মতন কাজ হলে শরীরের স্পন্দন নিশ্চয় অনুভব হবে। তারপর অন্যান্য দিব্য অনুভূতি। শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম নাড়ীগুলিতে আর আলাদাভাবে থাকবে না। সর্বত্র এক শক্তি প্রবাহিত হবে। বন্ধন নাশের জন্য হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি যেভাবে খোলা দরকার সব আপনিই খুলতে থাকবে। সাধনার যে লাইনেই চল না কেন। মূলাধারে সুইচ টেপা হয়ে গেলে শরীরে স্পন্দন, কম্পন দিয়ে কাজ শুরু হবে। এবং জ্যোতি দর্শনাদি দিব্যনাদ শ্রবণাদি নানাকাজ শুরু হবে।

গর্ভাবস্থায় অন্তঃশক্তি, মাতৃশক্তির সাথে যোগ থাকে শিশুর, তাই জ্ঞান থাকে। ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগাদির দ্বারা মাতৃগর্ভের অবস্থা আবার তৈরী করতে হবে। সাধক ভক্ত যোগী ভগবতীর গর্ভে যোগশিশু হয়ে থাকে। তাই তার শ্বাসক্রিয়ার ভাগ থাকে না। সদা এক লক্ষ্য, এক গতি। এক অনুভূতি, এক জ্ঞান।'

মা আবার বলছেন সাধনার গূঢ় রহস্য কথা সরল ভাষায় সহজ করে ভক্তদের :

'টিউবে হাওয়া যেখান থেকেই ভর না কেন, সঙ্কুচিত টিউব ঠিক টেনে সোজা হয়ে যাবে, ফুলে সমানরূপে সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রাণায়াম ধ্যান কীর্তন যাই করা যাক, ঠিকভাবে করলে মন একাগ্র হয়ে শরীর ও প্রাণ স্থির হয় বা বলতে পার প্রাণ কম্পন স্থির হয়ে মন একাগ্র হয়। তখন সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণের গতি সমানভাবে হয়। সেই সময় পূর্বস্মৃতি উদিত হয়। জ্ঞানের অবস্থা লাভ হয়।

গর্ভাবস্থায় জীবাত্মার বাহ্য দুনিয়ার সাথে কোনো সম্বন্ধ না থাকায় কোনও ব্যাঘাত হয় না এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালন শ্বাসকার্যের দ্বারা না হয়ে সোজা মায়ের শরীরের রক্তধারা নাভিমূল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমভাবে হয়। বাইরের দৃশ্য ও বাইরের হাওয়াই মানুষের একাগ্রতা নষ্ট করে ও স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। সাধকের দরকার এই বাইরের ব্যাঘাত থেকে নিজেকে ঢেকে লুকিয়ে হৃদয় গুহারূপী মাতৃগর্ভে প্রবেশ করা। তাহলেই আবার পূর্বস্মৃতি উদিত হবে। তখন মা-ই সব ভার নেবেন।'

তাইতো মা বলছেন :

'তাঁকে ডাকা, তাঁকেই পাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা মানুষের কর্তব্য। সব সময় তাঁরই কোলে তাঁরই বুকে—'মা'-টিরই মধ্যে। মাকে পেলেই সব পাওয়া যায়।'

আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করছো, কেন করছো? মা জিজ্ঞেস করলেন শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে। দক্ষিণেশ্বরে। পঞ্চবটীতে।

তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের ৩রা কার্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। বাংলার তপোবন, সারদার পীঠস্থানে। জ্ঞান ও তপস্যার প্রাণকেন্দ্রে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ধীরভাবে বললেন সুভাষচন্দ্র, আনন্দ পাই।

—আচ্ছা এ কি নিত্য আনন্দ না খণ্ড আনন্দ?

—তা তো বলতে পারি না। বললেন সুভাষচন্দ্র।

এবারে মা মৃদু হেসে বললেন, এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটিও একটু করো বাবা! যদিও তোমরা বলতে পারো এই কাজ তো নিজের জন্য করছি না। সকলের উপকারের জন্য করছি। কিন্তু আমি বলবো—এই বলেই আবার বলছেন, তোমরা যা বলাচ্ছো তাই বলছি, আমি তো লেখাপড়া কিছুই জানি না। তবে বলা হয় এই যে সবই নিজের জন্য। সকলেই এক অখণ্ড আনন্দ চাইছে। কেন চায়? না সেই রসটা আমাদের জানা আছে বলেই তো আমরা চাইছি। তবে তোমরা বলতে পারো যে—এই সব করে কি হবে? কিন্তু বলা হয় যে বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায় নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তা দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার স্বভাবতঃ হয়ে যায়। যেমন এম-এ বি-এ পাশ করে শিক্ষকরা কত মূর্খকে বিদ্বান করে দিচ্ছেন।

আবার মা মিষ্টি হেসে বললেন, বাবা, তুমি তো কত জায়গায় বক্তৃতা টক্তৃতা দাও। এখানে কিছু বল না আমরা শুনি।

সুভাষচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি মা, আমি এসেছি শুনতে। আপনার কাছ থেকে কিছু শুনে আনন্দ পেতে।

মা অমনি বলে উঠলেন, তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?

–চেষ্টা করবো। প্রত্যুত্তরে বললেন সুভাষচন্দ্র।

–শুধু বাইরের দিকে লক্ষ্য রেখো না বাবা, একটু ভেতরের দিকেও লক্ষ্য করো। তাহলেই সেই পথের সন্ধান পাবে। তোমার তো সেই শক্তি আছে বাবা। বললেন আনন্দময়ী মা।

—সেই পথ কি? সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন।

—সেবা! বাস্তবিক সেবার ভাব জাগলে সে পথ দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যায়।

আনন্দময়ী মা যেন শোনাচ্ছেন সুভাষচন্দ্রকে সেই পুরাতন কথা। মানব-সভ্যতার প্রভাতে ছায়াচ্ছন্ন তপোবনে ঝঙ্কৃত সেই শাশ্বত মন্ত্র—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি। যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।

অবশেষে সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে আনন্দময়ী মাকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। হৃদয় তাঁর ভরে উঠলো দিব্যানন্দে।

আসল কথা চাই বিশ্বাস।

সরল বিশ্বাস? শিশুর মতন বিশ্বাস।

বিশ্বাস তো অন্ধ। কিন্তু প্রথম-প্রথম আমাদের আশ্রয় করতে হবে এই বিশ্বাসকে। বিশ্বাসই হবে প্রথম অবলম্বন। পড়া বিদ্যা আর কি! পড়া বিদ্যাও কিছু-কিছু সাহায্য করে— যেমন রাস্তায় চলতে গেলে টাইম টেবিলেও কাজ করে।

সরল বিশ্বাসের সঙ্গে যে তাঁকে চায় সেই তাঁকে পায়। কঠোর সাধনও তাঁর নিকট পরাস্ত হয়।

ভক্তদের বোঝাবার জন্য আনন্দময়ী মা আবার একটি গল্পের অবতারণা করলেন:

'একদিন দেবর্ষি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। পথে যেতে-যেতে দেখলেন, একস্থানে এক কঠোরতপাঃ যোগী ঘোর তপস্যার মধ্যে দিয়ে শরীর ক্ষয় করে চলেছেন। তাঁর শরীর বল্মীকে অর্দ্ধ প্রোথিত হয়েছে। তিনি চীৎকার করে নারদকে ডেকে বললেন, ভগবন্ আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর জন্য এমন ঘোর কৃচ্ছ্রসাধন করছি, সিদ্ধিলাভ করতে আর কতদিন লাগবে?

দেবর্ষি অঙ্গীকার করে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন একজন পাগল নির্জনে বসে মহানন্দে গাঁজার ধূমপান করছে। হঠাৎ দেবর্ষিকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি হে ঠাকুর! কোথা যাও?

নারদ জানালেন তাকে বৈকুণ্ঠ গমনের কথা। অমনি সে বললে, আচ্ছা ভালই হলো। একবার সে ব্যাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস কোরো—

'ভজন পূজন সাধন বিনা,
আমার গাঁজা ভিজবে কি না?'

দেবর্ষি নারদ উভয়ের অনুরোধ অঙ্গীকার করে প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে উভয়েরই বক্তব্য জানালেন। পাগলটির কথা বলামাত্রই গোলোকনাথের চোখ দিয়ে বইতে লাগলো অনর্গল অশ্রুধারা।

তিনি বললেন, বৎস নারদ, ঐ পাগলটির মতন ভক্ত এই পৃথিবীতে আর কোথায়? কিন্তু তুমি যে যোগীর কথা বললে তাকে তো আমি চিনি না।

নারদ ফিরবার পথে ঐ পাগলটিকে গোলোকনাথের কথা জানালে, তখন পাগলটি নাচতে-নাচতে গাইতে লাগলো—

'ওরে তুই বগল বাজা,
গোলোকে তোর ভিজলো গাঁজা।'

সরল বিশ্বাসীর গাঁজা এইরূপই গোলোকে ভিজে থাকে। ভক্তের জাতি কুল বিদ্যা কিছুই নেই। চাই শুধু সরল প্রাণ আর সরল বিশ্বাস। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত।

তাইতো আনন্দময়ী মা ভক্তদের বলেন :

'যখন যা প্রাণে আসে, তাঁকে জানাবি। আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবি। সরল প্রাণে যে ডেকেছে সেই পেয়েছে তাঁকে।

তাঁকে ছাড়া তো জগতে কিছুই নেই। তাঁর জন্য বনে জঙ্গলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। মালিকের সঙ্গে সব সময় যোগ রাখতে চেষ্টা করো। সফল হবেই।

শিশু যখন ঘুমিয়ে রয়েছে, আর মা বাপের সেদিকে কোনো খোঁজ নেই, এ কখনো হয়? যেখানেই থাকো, ঘরে হোক, অফিসে হোক ভগবানকে স্মরণ করতে পারো। পরমার্থের দিকে যতটা খালি হয়ে যাবে, ভগবান ততটাই দেবেন ভরে। সবটা তাঁকে দিলে তোমারও অন্তর বাহির তিনিই দেবেন পূর্ণ করে।

মনকে খেলা দিও যত পারো। সকল সময়ে। তাঁকে নিয়ে খেলাধুলা। তাঁর রূপ নিয়ে হোক, গুণ নিয়ে হোক। তাঁর বাণী, তাঁর নাম, তাঁর মহিমা নিয়ে হোক। যত বেশী সময় দিতে পারো ততই ভাল। এই খেলাতেই মত্ত থাকার চেষ্টা করবে।'

মা আবার বলছেন :

'জীবনে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলেছিস্। হার জিত যা হবার হয়ে গেছে। এখন নিরাশ্রয়ের মতো তাঁর পানে চেয়ে তাঁরি কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি। তোর আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না।'

সংসারী কেন ভক্ত হতে পারবে না?

এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট নয় ?

'ভগবান যখন পিতা মাতা গৃহ পরিবার দিয়েছেন তখন তাঁর চরণে প্রাণ সমর্পণ করে সংসারের কর্তব্য পালন করলেই হলো। সংসারের সমস্ত কাজই তাঁর কাজ করছি ভেবে করলে পাপ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। বুদ্ধিও হয় না বিচলিত। প্রাণ সর্বদাই থাকে অমৃতপূর্ণ হয়ে। এটা শেষ করে ভগবানের নাম করবো এ রকম ভাব থাকলে হবে না। তাও কি কখনও হয় ?

লোকে যদি মনে করে সমুদ্রের ঢেউ শান্ত হলে স্নান করে উঠবো তা যেমন হয় না, সেইরূপ সংসারের কাজ শেষ করে ভগবানের নামও চলে না।

তাঁর চরণ স্মরণ সর্বক্ষণ। আসল পেনসনের চেষ্টা। যাঁর সব তাঁকেই ভাবা সর্বক্ষণ। যতই কেন সংসারের কার্য না কর, প্রাণের টান সর্বদাই থাকা চাই তাঁর দিকে।

মা ডাক ডাকবার জন্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন হয় না। ভক্ত যখন সরল প্রাণে মাকে ডাকতে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে মায়ের লীলা এমনই প্রতিভাত হতে থাকে যে তা নিরীক্ষণ করতে করতে এবং তার আলোচনা করতে করতে সে প্রভূত জ্ঞান লাভ করে। ভক্ত যতই মা বলে ডাকতে থাকে ততই মা আপনার স্বরূপ তার নিকটে প্রকাশ করেন। কে না জানে মা জ্ঞানস্বরূপা ? তাঁর আবির্ভাবে ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার যায় খুলে।

'ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোনো গুণের অপেক্ষা রাখেন না।'

এই প্রসঙ্গে মা আবার একটি গল্প শোনালেন ভক্তবৃন্দকে :

এক গুরু তাঁর শিষ্যবাড়ী এলেন। শিষ্যের নাম ধন্না। ধন্নার গুরুভক্তির তুলনা হয় না। গুরু শিষ্যবাড়ী এসে তাঁর শালগ্রাম শিলা পূজা আরম্ভ করলেন। গুরুর পূজা-পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হলো ধন্না। সে জাতিতে গোয়ালা। পূজার কিছুই জানে না। কিন্তু পূজা করার একান্ত ইচ্ছা। তাই গুরুর শ্রীচরণে নিবেদন করল মনের বাসনা। গুরু শিষ্যকে এসব ব্রাহ্মণোচিত কার্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শিষ্য নাছোড়বান্দা। গুরু উপায়ান্তর না দেখে একটি পাথরের টুকরো শিষ্য ধন্নাকে দিয়ে বললেন, নে এই তোর ভগবান। একে স্নান করাবি, ভোগ দিবি এবং ভগবান আহার করলে তুই নিজে প্রসাদ নিবি। অবশেষে গুরু বিদায় নিলেন শিষ্যগৃহ থেকে।

ধন্না তো মহানন্দে সেই পাথরের টুকরোটিকে ভগবান জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করল। তাকে স্নান করিয়ে ভোগ দিল। কিন্তু তার ভগবান কিছুই গ্রহণ করলেন না। বড়ই দুঃখ হলো ধন্নার। দুই চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে বলতে লাগল, ভগবান আমার গুরু যখন তোমাকে ভোগ দেন, তখন তো তুমি খুব তাড়াতাড়ি খাও, এখন খাচ্ছ না কেন? তুমি না খেলে আমিও খাব না।

কিন্তু ভগবানের কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না। একদিন সে ভগবানকে গামছার মধ্যে বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে কার্যান্তরে চলে গেল। ভগবান অভুক্ত বলে তারও খাওয়া হলো না। এইভাবে সাতদিন অতিক্রান্ত হলো। ধন্নাও উপবাসী রইল।

ভগবান ধন্নার ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর একনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং নিজেকে তার নিকট প্রকট করলেন।

বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে ধন্না দেখল প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবানকে। সে তখন পরমানন্দ লাভ করল।

সেই থেকে ভগবানের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ভগবানও তার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তার সমস্ত কাজ করে দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

ধন্নাও শ্রীভগবানকে গোরু চরানো আর ক্ষেতে নিঙড়ানোর কাজে নিযুক্ত করল।

এইভাবে দিন যায় রাত্রি আসে। আবার রাত্রির অবসানে দিবসের হয় আগমন। সপ্তাহ, মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হয়। অকস্মাৎ একদিন গুরু এসে উপস্থিত হলেন ধন্নার গৃহে। ধন্না গুরুকে পেয়েও খুব খুশী। তারপর অভিমানভরে বলল, গুরুদেব তুমি আমাকে এমন এক ভগবান দিয়েছিলে যে প্রথমে কিছুই খেতে চায় না। তার জন্য আমাকে সাতদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল।

গুরু প্রত্যুত্তরে বললেন, ওরে মূর্খ, ভগবান কি খান? তাঁর কাছে খাবার জিনিষ কিছুক্ষণ রাখতে হয়। তাহলেই তাঁর খাওয়া হয়ে যায়।

ধন্না বলল, তা হবে কেন? আমরা যেমন খাই ভগবানও তেমনই খান।

গুরু কিছুতেই মানতে চান না। ধন্নাও খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বার বার ঐ একই কথা বলে।

তখন গুরুদেব বললেন, তুই যদি আমাকে তোর ভগবানকে দেখাতে

পারিস, তবেই আমি তোর কথা বিশ্বাস করব।

ধন্যা সরল বিশ্বাসে বলল, ভগবান তো এখন গোরু চরাতে গেছেন। আচ্ছা আমি তাঁকে ডাকছি।

এই কথা বলে সে ভগবানকে ডাকতে লাগল। ভগবান এলেন কিন্তু ধন্যার গুরুর নিকট অদৃশ্য হয়ে রইলেন। গুরু দেখছেন না দেখে ধন্যা ভগবানকে দেখা দিতে অনুরোধ করতে লাগল। ভগবান বললেন, এ জন্মে তোর গুরু আমাকে দেখতে পাবে না। কারণ ওর ভক্তি বিশ্বাস কিছুতেই নেই।

কিন্তু ধন্যাও নাছোড়বান্দা। সে বলল, ভগবান তুমি দেখা না দিলে, আমি যে তোমাকে পেয়েছি তা তো গুরু বিশ্বাস করবে না। কাজেই তোমাকে দেখা দিতেই হবে।

শ্রীভগবান ধন্যার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুই তোর গুরুকে কোলে করে বোস, তবেই সে আমাকে দেখতে পাবে।

ধন্যা শ্রীভগবানের নির্দেশে গুরুকে কোলে করে বসল। শ্রীভগবান ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। অভিভূত ও পরমানন্দ লাভ করল ধন্যার গুরু। অবশেষে শিষ্য ধন্যাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে গুরু বললেন, তোমার মতন শিষ্য পেয়ে এই অধম পাষণ্ড সংসার বন্ধন হতে মুক্তি পেল।'

গল্প শেষে মা মৃদু হেসে বললেন :

'তাইতো বলি, তাঁর উপর নির্ভর করে সমস্ত কাজ করতে চেষ্টা কর। কেবল নির্ভর করে সরল বিশ্বাসে তৎজ্ঞানে সেবা। মনে মুখে ঠাকুরের নাম, হাতে কাজ। সংসারের কাজ করেও সর্বদা থাকা সেবা ভাবে।

তিনি চোখ দিয়েছেন, দেখ, একমাত্র তিনিই আপনার। হাত দিয়েছেন, তাঁরই সেবা করো। পা দিয়েছেন তাঁর পরিক্রমা করো মন তাঁরই সেবক। ভোজন করো তাঁরই আহুতি। সর্বদা নাম করে এই ভাবনা করো যে তুমি যন্ত্ররূপে তাঁরই যন্ত্র, তিনি যেমন চালাবেন। প্রার্থনা করো আমা দ্বারা যেন সব শুভকর্মই হয়। সৎ চিন্তা হয়। আর সমস্ত কর্ম তোমারই সেবায় লাগে। সেবাভাবে কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধ হলে ধ্যান হয়। কর্ম করার সময় মন অন্তর্মুখ রেখে ধ্যানাভাবে কর্ম করবে। কর্ম সুন্দর হবে।

আসলে জমি তৈরী চাই। সেইজন্যই তো যত চেষ্টা। এমন তৈরী করা চাই যেন বীজ পড়লেই গাছ ওঠে। ফলে ফুলে শোভা পায়।

'শুদ্ধ অনন্তভাবের বলে সবই সম্ভব হয়।'

অহঙ্কারই ধর্মপথের বাধা।

'ধর্মপথে প্রচ্ছন্ন 'আমাকে সরাতে হবে। 'আমাকে' সরালে 'আমাকে' পাওয়া যায়। 'আমি' বিদায় না হলে 'তিনি' আসবেন কেমন করে? যে পর্যন্ত 'আমি' না যাবে সে পর্যন্ত যতই ধর্মসাধন কর না কেন স্বর্গের দ্বার রুদ্ধই থাকবে।

অহঙ্কারটা কি?

প্রথমে যখন অজ্ঞান অবস্থায় অহঙ্কার থাকে তখন সেই অহং দ্বারা ক্রিয়া হয়। তাই সেটা অহঙ্কার। আবার এই অহং যখন পরমার্থ পথে হয় নিয়োজিত তখন অহঙ্কারই হয় সোঽহং অর্থাৎ আর কেহ নাই।'

আরও বিস্তারিত করে মা বলছেন:

'আমি আমি করে যে ক্রিয়াগুলি হচ্ছে সেগুলোই অহঙ্কারসূচক। দুনিয়া মানে দুই নিয়া। এখানে দ্বন্দ্বমূলক কর্মময়। দুই-এতে দ্বন্দ্ব প্রশ্ন অহঙ্কার। অহংরূপী ক্রিয়া। কাঁচা আমিতে অহঙ্কার। 'আমি আত্মা' প্রকাশ হলে পাকা আমি। অহঙ্কারের ফল অন্ধকার। 'আমি ঈশ্বরের নিত্যদাস'—এই ভাবেও দুই থাকে। কিন্তু জাগতিক অহঙ্কার থাকে না। পাকা আমি অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাঽস্মি' না হওয়া পর্যন্ত অহঙ্কার সমূলে বিনাশ হয় না।

প্রথমটাতে পুরুষকারের অহঙ্কার আছে। দ্বিতীয়টাতে আত্মসমর্পণ। তখন তিনি দরজা খুলতে বাধ্য হবেন। অখণ্ড দীপ তখন যাবে দেখা। দরজা ভাঙ্গবারই জিনিষ। পুরুষকার দ্বারা বা গুরু নির্দিষ্ট সাধনার দ্বারা তা ভাঙ্গবে।' সব তপস্যাই পরদা সরাবার জন্য। কিন্তু নিজের ক্রিয়াতে ভগবান প্রকাশ হন না। তিনি কর্মের অপেক্ষা রাখেন না। আবরণ নিজ কর্মে হয়, আবার সরে। সরলে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বয়ং প্রকাশ হবেন। যা সরে যায় তাকেই সরান যায়। যাকে সরান যায় না তাকে সরাবে কি করে? ক্রিয়ার মধ্যে যখন তোমার প্রকাশ যেমন জগতে বা মনোরাজ্যে সেখানে আপেক্ষিক সুখ, কেন না মনোরাজ্য মোহরাজ্য কিনা। নিরপেক্ষ সুখস্বরূপের প্রকাশ সেখানে নেই। সেই অভাব মোচনের জন্য এই সাধারণ ভাব অবলম্বন যাতে গুরুশক্তি দ্বারা ইষ্ট

প্রকাশ হয়। যেখানে অনিষ্ট অর্থাৎ অভাব দুঃখ নাই সেই ইষ্ট। জ্ঞানাগ্নিতে যা জ্বলে তাকে জ্বালাও। ভক্তি শ্রদ্ধায় যা গলে তাকে গলাতে চেষ্টা করো। তবে ইষ্ট প্রকাশ হবে। জ্ঞানের মার্গে জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশ। ভক্তির দ্বারা প্রেমস্বরূপের প্রকাশ। দুই-ই এক।

ভক্তির লাইনে—'যত্র তত্র নেত্র হেরে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' জ্ঞানের লাইনে—এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। দুই-ই এক। যে যে লাইনে যাবে, সেই একই স্থানে পৌঁছবে। প্রাকৃত মানে পর পর ক্রম। অপ্রাকৃত মানে এক অবস্থা। সেখানে পর পর ক্রম নাই। চিন্ময় প্রকাশ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণই থাকে। শূন্য থেকে শূন্য গেলে শূন্যই থাকে। প্রাকৃত অপ্রাকৃতরূপে তিনিই। সাধন করতে করতে অহঙ্কার বদলে সোঽহং প্রকাশ হয়। ভক্তি—মার্গে অনিত্য দাস নিত্য দাসে হয় পরিণত।

অনিত্য রাজ্যে শান্তি নাই। যতই ভোগের বস্তু থাকে না কেন। নিত্য স্বরূপ ভূমার প্রকাশ না হলে অভাবে যাবে না। অহঙ্কাররূপী ক্রিয়াতে বিভ্রান্ত হবে। সাধন করে করে নিজেকেই পাবে। মৃত্যুপথের যাত্রী হোয়ো না। স্বরূপ প্রকাশের যাত্রী হও। বিষয় বাসনার জীবনে মৃত্যুযাত্রী হতে হয়। বাসনা কামনা থাকলে return ticket কাটার মতন আবার জন্ম নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়।'

কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে ভক্তদের বললেন আনন্দময়ী মা।

মহাভারতে আছে একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গমন করতে সমর্থ হলেন। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেবের গর্বই পতনের কারণ।

যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব স্বর্গের পথে চলেছেন। প্রথম সহদেব পতিত হলেন ভূতলে। ভীম জিজ্ঞেস করলেন যুধিষ্ঠিরকে সহদেবের পতনের কারণ।

ধর্মপুত্র প্রত্যুত্তরে বললেন, এই নৃপনন্দন কোনো ব্যক্তিকেই নিজের মতন জ্ঞানী মনে করতেন না। সেই দোষে পতিত হয়েছেন।

কিছুদূর অগ্রসর হলে নকুল পতিত হলেন। নকুলের পতনের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে যুধিষ্ঠির বললেন, ইনি মনে করতেন এর মতন রূপবান এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সেইজন্য পতিত হয়েছেন।

নকুলের পর মহাবীর অর্জুনের পতন হলো। ধর্মপুত্র অর্জুনের পতনের কারণ সম্বন্ধে বললেন বৃকোদরকে।

এই শৌর্যাভিমানী অর্জুন বলেছিলেন, তিনি একদিনের মধ্যে শত্রুগণকে দগ্ধ করে ফেলবেন। কিন্তু সক্ষম হন নি। এবং ইনি ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে, অপর ধনুর্ধারীদের অবজ্ঞা করতেন। তাই তিনি পতিত হয়েছেন।

তারপর কিছুপথ অগ্রসর হতে না হতেই দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পতিত হলেন। ভীম পতিত অবস্থায়ই যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন পতনের কারণ।

ধর্মপুত্র প্রত্যুত্তরে বললেন, হে বৃকোদর, তুমি অন্যের বল গ্রাহ্য না করে নিজ বলের প্রশংসা করতে। এই অহঙ্কারের জন্য তুমি পতিত হয়েছো।

অবশেষে একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গমন করতে সক্ষম হলেন।

ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব নানাগুণে বিভূষিত হয়েও, হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন অহঙ্কারকে। তাই বঞ্চিত হলেন স্বর্গ থেকে।

অহং বোধই সর্বনাশের মূল। সবকিছু সুকৃতি অহঙ্কারে নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মলাভ হয় না ; অহঙ্কারী মানুষ অখণ্ড শান্তিলাভ করতে পারে না!'

তাইতো আনন্দময়ী মা বলেন :

'সাধন ভজনের লক্ষ্যই হচ্ছে অহঙ্কারকে চুরমার করে দেওয়া।

'আমি' 'আমার' এই বোধকে উৎপাটিত করা। উন্মুলিত করা।'

'আমার কুণ্ডলিনী' এই বোধ যতদিন থাকবে, ততদিন কলকুণ্ডলিনী তো জাগবে না! ধ্যানও হবে না! ধ্যান করা এক কথা আর ধ্যান হওয়া আর এক কথা। যখন সত্যসত্যই ধ্যান হয় তখন সাধক বুঝতে পারে এ দুটির মধ্যে কত প্রভেদ।

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে নাভিমূলে যে সব গ্রন্থি আছে তা খুলতে আরম্ভ করে। এইসব গ্রন্থিভেদ হলেই নানারকম শব্দ শোনা যায়। জ্যোতি দেখা যায়। গ্রন্থিভেদ হলে যে শব্দ শোনা যায় তাকেই বলে অনাহত ধ্বনি! সর্বদাই হচ্ছে, কিন্তু চিত্ত স্থির না হলে শোনা যায় না। ইহা জগতের যাবতীয় ধ্বনির সমষ্টি। যেমন শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতির শব্দ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এগুলি একত্রে বাজালে যে রকম শব্দ হয়, অনাহত ধ্বনিও ঐরূপ। জগতের এমন কোনো ধ্বনি নেই যার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে। অথচ জগতের সমস্ত ধ্বনিই এখান থেকে উৎপন্ন। সেই রকম আবার অন্য এক গ্রন্থিভেদ হলে জ্যোতি দর্শন হয়, এ জ্যোতিও অপার্থিব। জগতের কোনো আলোর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। রূপ সম্বন্ধেও এই রকম সংস্কার অনুসারে নানা রূপ দর্শন হয়। আবার সমস্ত রূপ একরূপেই লয় হয়ে যায়। জগতের সমস্ত জিনিষই এক মূল থেকে.

উৎপন্ন। গ্রন্থিভেদ হলেই এসব বুঝতে পারা যায়। যার সমস্ত গ্রন্থিভেদ হয়েছে কেবল সেই বুঝতে পারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ।

জগতে কোনোটাই স্থির নয়। একমাত্র স্থির বস্তু ভগবান্। তাঁকে পেতে হলে চিত্ত স্থির হওয়া দরকার। লক্ষ্য স্থির না হলে চিত্ত স্থির হয় না। আর আমিত্ব বোধ লুপ্ত না হলে ধ্যান হয় না। প্রণব উচ্চারণও হয় না? 'আমি প্রণব উচ্চারণ করছি' এই বোধ নিয়ে প্রণব উচ্চারণ করা যায় না। প্রণবের উচ্চারণ অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়। করতে হয় না। সেই আদি শব্দ ব্রহ্ম যখন চিত্তে জেগে ওঠেন তখন তিনি নিজে থেকে উচ্চারিত হন। তিনি যে স্বয়ং প্রকাশ।

কিন্তু হৃদয়ে অহঙ্কার থাকলে প্রভু থাকেন না। এই অহঙ্কারই সাধনার প্রধান অন্তরায়। ভগবানকে পাওয়ার বাধা!' এ বাধা অতিক্রম করতেই হবে।

অহঙ্কারকে ছেড়ে যেতে হবে ভালবাসায়। তাহলেই 'আমি' হয়ে উঠবে 'তুমি'। যখন আমার তোমাতে বিস্তার তখনই আমার একমাত্র নিস্তার।'

'ভক্তের টানে ভগবান বাধ্য হন।' বললেন আনন্দময়ী মা। 'ঠিক যেন ইলেকট্রিক তার। স্পর্শ করলে আর হাত ছাড়ান যায় না। সেইরকম আর কি।

ভক্তের হৃদয়ই তো ভগবানের বসতিস্থান। তিনি সর্বত্রই আছেন তবে ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে আছেন।'

—ভক্তি কি?

'জীবের নিজের স্বরূপের অনুসন্ধান ভক্তি। ভক্তিযোগও ভগবান লাভের একটি পথ। প্রেমের জগতেও সাধনা আছে সেই সাধনাকে বলে ভক্তি সাধনা। একমাত্র ভক্তিযোগের সাধনার দ্বারাও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়।'

—ভক্তির উদয় হয় কেমন করে?

শান্তরস স্থায়ী হলে। শান্তরসই সাধক ও ভক্তের উপযোগী।

শান্তরসের উৎপত্তি হয় কি করে? চিত্ত শ্রীভগবানের অভিমুখী হলে পার্থিব ভোগসুখে যে অনাসক্তি ও বিরাগ উপস্থিত হয়, তা যদি স্থায়ী হয় তাহলেই

উৎপত্তি হয় শান্তরসের। শান্তরস স্থায়ী হলে যথার্থ ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির উদয় হলে ভক্তের আর দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। জগতে সকলেই তখন তার আপনার বলে মনে হয়। ভক্ত অনুভব করেন প্রেমময় ভগবানের বিকাশ রয়েছে সকলের মধ্যে। ভক্তি-মন্দাকিনী ভক্ত-হৃদয়কে প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়ে চলে। ভক্তহৃদয় প্রেমে ডুবে যায়। ভাবঘনতনু প্রেমময় ভগবানের ধ্যানে হয়ে থাকেন আত্মহারা। ভগবান এসে আশ্রয় নেন ভক্তহৃদয়ে। ভক্ত ভাবের চোখে দর্শন করেন প্রেমময় ভগবানকে।

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং যা লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥

অর্থাৎ যে ভক্ত নিষ্কামভাবে আমার পূজা করে, সে আমার ভক্তিযোগ লাভ করে আর ঐ নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের দ্বারা সে স্বয়ং আমাকে লাভ করে। তাইতো আনন্দময়ী মা বলছেন :

'ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, ভগবানকে চিনতে পারে না।'

মা আরও সহজ করে বলছেন :

'ভাব হতেই উদয় হয় প্রেমের। ভাবের চালনা হলে প্রেম উপস্থিত হয়। প্রেমে নিয়ম নাই। প্রেমে নিজের ভাষা, ব্যবহার নিয়মাদি সবকিছুই হয় পরিবর্তিত। এইজন্যই বলা হয় যে প্রেমে নিয়ম নাই।'

যিনি এই মধুররসে ডুবেছেন তাঁর আর বাইরের ধর্ম কর্ম থাকে না। তিনি বেদ বিধি ছাড়া। যিনি শুনেছেন আত্মার ভিতরে বংশীধ্বনি তিনি তো পাগল। সাধারণ পাগল নন। ধর্ম-পাগল। ভগবৎ ভাবের উন্মাদ। শ্রীচৈতন্য এই ভাবে বিভোর হয়ে মধুররসে সাঁতার দিতে দিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেছিলেন। চৈতন্য লাভ করেছিলেন। প্রাণে মধুররস সঞ্চারিত হলে ভক্ত ভগবান ছাড়া আর কাউকেই জানেন না। তখন তিনি পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন ভগবানে। ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়।

'সবটা তাঁকে দিলে তোমারও সবটা অন্তর বাহির তিনি পূর্ণ করে দেবেন।'

'যদি ভালবাসতেই হয় তবে ভালবাসো ভগবানকে। যাঁকে পেলে সবকিছুই পাওয়া হয়। তাঁকেই পাবার চেষ্টা করা আর কি। তিনি আছেন। আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি আর না পারি তিনি আমার কাছে আছেনই।' দৃঢ়কণ্ঠে

মা বলছেন ডাঃ পান্নালালকে : 'তাঁকে অনুভব করতে, পেতে, চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। যেমন তোমাকে আমি দেখছি, আমাকে তুমি দেখছো এইরূপ তাঁকেও দেখা যায় পরিষ্কার ভাবে। কল্পনা নয়। সত্যই। তাঁকে ছাড়া তো জগতে কিছুই নেই! ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ রয়েছেই। যদি সেটা বুঝতে না পারো, তুমি তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধও পাতাও। ভালবাসার সম্বন্ধ। প্রেমডোরে তাঁকে বাঁধো। তিনি যে ভক্তের অধীন। ভক্তজনকে বড় ভালবাসেন।'

'অন্তরে যদি থাকে ভালবাসা তবে আর ভয় নেই। যে রূপ ভাল লাগে সেই রূপেই তাঁকে ধ্যান করো। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রেমময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে বলবে, যে রূপেই তিনি দেখা দেন না কেন!

—'হে প্রিয়, হে ভগবান তুমি এই রূপেই আমার কাছে এসেছো। কারণ তোমার এই রূপ যে আমার কাছে প্রিয় ছিল, তাই তুমি আমাকে তোমারই দিকে টানবার জন্য এই রূপ ধারণ করে এসেছো। এইভাবে সেই প্রেমময় প্রেমের ঠাকুরের ধ্যানে মনটাকে লাগাতে চেষ্টা করা আর কি।

মোহটাকে মহান্ ভাবের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাঁর দিকই দিক। অন্য কোনও দিকেই নেই শান্তি। নেই মুক্তি। তাইতো চাই ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তোমার কাছে কিছুই চাই না—শুধুই ভালবাসি। গোপিনীদের মতন কামগন্ধহীন প্রেম। মধুরভাবের সাধনা। মধুররসে ডুবে যাওয়া। ঈশ্বর প্রেমরূপ সুধা পান করে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের আনন্দে আত্মারাম হয়ে যাওয়া।'

'নিজেই নিজেকে নিয়ে খেলা। আত্মারামের লীলা।
সবই আরাম কিছুই নাই বেয়ারাম।'

একমাত্র ভগবৎ প্রেমই প্রেম। যদিও তাঁর দোহাই দিয়ে সাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনো কোনো ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আসলে তো একই, তবে এটাও ভাব, বাস্তব ভাবের আশা। শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ ভক্তি থেকেই প্রেমের প্রকাশ, আবার প্রেম স্বয়ং প্রকাশ। নিঃসংশয় কখন হতে পারে? সেটা ভাববার বিষয় নয় কি? জোঁক যেমন একদিক ধরে অন্য দিকটা ছাড়ে। আকর্ষণ কমা মানে অপর কোনোদিকে আকর্ষণ হওয়া। সেটা যদি ভগবৎভাবের দিকে নিঃসংশয় হওয়ার সহায়ক আকর্ষণ না হয় তা হলেই পতন। বাস্তবিক পক্ষে আকর্ষণ কখনও কমে না।

আসলে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোনোই প্রভেদ নেই। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান একই। দেখ না যেমন 'আমি স্বরূপ দেখবো' এই হলো

জ্ঞান। আর ভক্তি হলো স্বরূপ দেখবার আকর্ষণ।

তারপর কি ? না—সাবান লাগাও, আবার ধুয়ে ফেলো জ্ঞান গঙ্গায়, এইসব হলো কর্ম। সবই আছে একের মধ্যে।

দর্শনের ইচ্ছাটাও তো কামনা। তাকে কি নিষ্কাম কর্ম বলা যায় ?'

আনন্দময়ী মা অল্প কথায় সহজ করে বলছেন :

'বিষয়কর্মই কাম, ভগবৎকর্মই হলো প্রেম। ভগবানের জন্য যা কিছু করা হয় তাকেই বলা হয় নিষ্কাম কর্ম।

অন্তরেই সবকিছু। অন্তরেই ভক্তি ও প্রেমের উৎস। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবণ।'

'অন্তরকে সর্বদাই ভগবৎভাবেই পূর্ণ করে রাখা আর কি। সেই মহান্ ভাবের ভিতর একবার পড়তে পারলে শেষে সেই স্রোতই তাঁর দিকে নিয়ে যাবে। একবার ফেলতে পারলে হয়।'

আনন্দময়ী মা এসেছেন সেবাগ্রাম আশ্রমে! মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে। ১৩৪৮ সন। ৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার। মহাত্মা গান্ধী 'আইয়ে, মাতাজী—আইয়ে—' বলে সাদর আহ্বান করলেন মাকে। মা-ও পিতাজী পিতাজী বলে মহাত্মা গান্ধীর ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর শুরু হলো নানা কথাবার্তা আলোচনা।

মহাত্মাজী বললেন, মাতাজী তোমার কথা আমাকে প্রথম কে বলে জানো ? কমলা নেহেরু। সেই আমাকে বিশেষ করে বলেছিলো, আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,—কমলা এঁকে গুরুর মতন মানতেন।

মা-ও হেসে হেসে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন 'পিতাজী আমি কারো গুরু-টুরু নই! আমি তো ছোট্ট বাচ্চি।'

মহাত্মাজীও হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা! আচ্ছা!

তারপর মাকে অনুরোধ করে বললেন, দেখো তুমি যেন যাবার কথা বলো না।

অন্ততঃ পক্ষে দু'দিন তো কাজ আছেই। যমুনালালের বিষয় নিয়ে আরও দু'দিন কাজ আছে। তুমি থাকলে জানকীবাঈ ও কমলনয়ন খুবই আনন্দ পাবে।

যমুনালাল বাজাজ শ্রীশ্রীমাকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মাতৃনামে বিভোর হয়েছিলেন। যমুনালাল সম্বন্ধে মা বলেন, 'এই শরীরটার সঙ্গে সে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন শিশুর মতন মিশেছিলো যে, এরকমটা সাধারণতঃ দেখা যায় না।'

যমুনালালের পত্নী জানকীবাঈ ও পুত্র কমলনয়নও শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত। যমুনালাল বলেছিলেন জীবনে অনেক সাধুসন্তর দর্শনলাভ হয়েছে কিন্তু— মাতাজীর মতন এমন জীবন্ত সাধুর দর্শনলাভ আর হয়নি।

মা এবারে হেসে হেসে বললেন গান্ধীজীকে, 'পিতাজী এই ছোট্ট মেয়েটার মাথাটা কিছু খারাপ। সব সময় সব কথা রাখতে পারে না। তার কি করবো পিতাজী ? তোমার স্বভাবই তো মেয়েটা পেয়েছে !'

এই কথায় সকলেই হেসে উঠলেন।

মহাত্মাজী হাসতে হাসতে বললেন, এরা যে সকলেই হাসবে। বলবে কোথা থেকে এক পাগল মেয়েকে এনেছে যাকে বুঝিয়ে দু'দিন রাখতে পারলো না।

আনন্দময়ী মা-ও মিষ্টি হেসে বললেন, 'বেশ তো, আমার বাবাকে নিয়ে লোকে যদি একটু আনন্দ করে করুক না। আর আমার বাবা তো এই সব গ্রাহ্যই করেন না। বাবার এই সবে কিছুই আসে যায় না।'

এবারে মহাত্মাজী হাসতে হাসতে বললেন, আমি তো অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলছ, ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলে ফেলেছি।

মহাত্মাজীর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। এইভাবে গান্ধীজী আনন্দময়ী মার সাথে সরল রসিকতায় মেতে উঠলেন।

গান্ধীজী আবার বলছেন, যমুনালাল জেলে বসে সুতা কেটে তাই দিয়ে এক জোড়া কাপড় বানিয়ে মাতাজীর জন্য রেখে গেছে। মাতাজী তা থেকে এক টুকরো আমাকে, এক টুকরো জানকীবাঈকে আর এক টুকরো বিনোবাজীকে এবং অবশিষ্ট টুকরোটি নিজের জন্য রেখেছেন।

মা বললেন, 'পিতাজী আমিও একবার নিজের হাতে সুতা কেটে এক জোড়া কাপড় বানিয়েছিলাম। আমি চরকায় সুতা কাটতে জানি।'

মহাত্মাজী মিষ্টি করে হেসে বললেন, হ্যাঁ, যেখানে যেখানে খদ্দর বানানো হয় সব আমারই কাপড়।

ইতিমধ্যে কস্তুরীবাঈ এসে আনন্দময়ী মাকে প্রণাম করে বললেন, খুব ভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা আপনাকে দর্শন করবার। আজ পূর্ণ হলো আমার সেই ইচ্ছা।

কমলনয়ন বললেন, বাপুজী, মাতাজীকে আপনার কাছে রেখে যাই। তবে আর মাতাজী যেতে পারবেন না।

মহাত্মাজীও আগ্রহভরে বললেন, বেশ, জানকীবাঈ ও মাতাজী এখানেই থাকুন। শোবার বন্দোবস্ত করে দেবো। তারপর হরিরাম যোশীকে লক্ষ্য করে বললেন, যোশী তুমি কি মাতাজীর সঙ্গেই আছ?

প্রত্যুত্তরে হরিরাম বললেন, না আমাকে কাশী থেকে তার করে আনিয়েছেন।

মহাত্মাজী মৃদু হেসে মাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার কাছে তোমার একা আসতে ভয় করে নাকি?

—'ভয়ের তো কথা নেই। ও বলেছিলো এদিকে এলে খবর দিতে। তাই খবর দিয়েছিলাম।'

—ও তুমি বুঝি হুকুমও চালাও?

এইভাবে নানারকম কৌতুকের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হলো। ভক্তবৃন্দ, মহাত্মাজীর সেবক-সেবিকারা, সেবাগ্রাম আশ্রমের বাসিন্দারা বাপুজীও আনন্দময়ী মার সরল রসপূর্ণ কথোপকথন শুনে বিমল আনন্দ উপভোগ করলেন। নীরস দার্শনিক আলোচনা বা গভীর তত্ত্বকথা নয়—সহজ সরল কথাবার্তা। তার মধ্যে ছিল প্রাণের আকুতি, অনির্বচনীয় প্রসন্নতা। আনন্দময়ী থেকে বিমল আনন্দ উৎসারিত হয়ে সেই আনন্দময়ের স্পর্শের অনুভূতি যেন সকলের প্রাণে প্রাণে অনুভূত হলো।

আনন্দময়ী মা মহাত্মাজীকে দর্শন দিয়ে রাত্রিবাস করে ভোরের বেলা পথে বের হয়ে পড়লেন। সেবাগ্রাম আশ্রম—ওয়ার্ধা ত্যাগ করে মা আবার সম্মুখের পথে যাত্রা করলেন। চলা—চলা – আর চলা—চলার আর বিরাম নেই। নেই বিশ্রাম। মা যে চলেছেন সেই অসীমের সন্ধানে!

শ্রীশ্রীমা বলছেন ঃ

'একের অভাবেই সব অভাব।'

'তাইতো এ শরীরটা বলে, 'যাঁকে ভাবলে, যাঁর রূপ হৃদয়ে রাখলে শান্তি, তাঁকেই স্মরণ রাখা। যতক্ষণ বিঘ্ননাশনরূপে প্রকাশিত না হন ততক্ষণ তাঁকেই ধরে থাকার চেষ্টা করা।'

'তাঁরই ভাবে থাকা। সব ঝঞ্ঝাটের ভিতরে তাঁর উপরই নির্ভর রাখা। সংসারের ভাবরূপ নিয়ে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। অভাব বোধটা থেকেই যায়। একেতে মনটা লাগাবার চেষ্টা করা তাহলেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার আশা। যত এই চেষ্টা থাকবে মনে তত আনন্দ পাওয়ার আশা। যখন মনটা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায় অন্ততঃপক্ষে তাঁর স্মরণ ও ধ্যানের চেষ্টা। সত্যপালন, তাঁরই কথা স্মরণ। অন্ততঃ তাঁর সঙ্গ করা, তাঁকে ছেড়ে থাকব না এই চেষ্টা। মনের আবেদন নিবেদন তাঁকেই জানান। চিরকাল ভগবানের পিছনে ঘুরতেই হবে। উপায় নাই। নিরুপায়। তাঁর সৃষ্টি কিনা। তিনি যখন যা করেন সব মঙ্গলের জন্য। বেছে-বেছে নিজের মঙ্গল মনে করে নিলে তো হবে না।'

মা আরও বিস্তারিত করে বলছেন :

'বৃক্ষের গোড়ায় জল দেওয়া। এই গোড়াই তো, মাথা। যে মাথায় তোমার বিচার বুদ্ধি সব সময় খেলছে, জপ, ধ্যান, পাঠ এই সব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আবার একটা আছে! বাঁধা হওয়া অর্থাৎ বদ্ধ হওয়া সেই দিকটা দেখে চলা। বদ্ধ হওয়া। বাঁধা। অর্থাৎ গতিরোধ। যাতে করে সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে চলা। নিজের দিকে নিজে অবাধ গতিতে চলা। 'তুমি' নেও আর 'আমি নেও,' যা নিবে সেই তুমিই। আমিই।' কেন দেখে চলা ?

দেখা রূপে 'তুমি'। কেন রূপে 'তুমি'। কেন তুমিই। যে দিকে যা প্রকাশ, অপ্রকাশ সে 'তুমি' যে, আমিই। না, হাঁ রূপেও যে তুমিই—সেই। পূর্ণাঙ্গীন রূপ ধরা পড়বে তোমাতে, যেখানে অর্থাৎ যেখানে নিজেই নিজে— সেইজন্যই দেখা চলার কথা। যেখানে সীমাবদ্ধ দেখছ ওখানেই সীমাও অসীমেরই প্রকাশ! তার যে মূল সত্তা 'তুমিই'। সেই প্রকাশ না হলে পরিপূর্ণ কোথায়। পূর্ণ। পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ, যা বল। পূর্ণ অপূর্ণের প্রশ্ন সেখানে আর কোথায় ?'

মায়ের নিজের ভাষায় :

'একমাত্র নিজেই সদা সর্বত্র বিরাজমান। দ্বিতীয় কেহ নাই। ছিল না। থাকিবেও না। এবং এই একমাত্র বস্তু তুমি অথবা ইহাই আমি। কারণ এখানে তুমি ও আমি একই বস্তু। এই জন্য প্রকৃত দৃষ্টি তাই যা সর্বদা এই এককে নিরীক্ষণ করে থাকে এমন কি যখন গণ্ডীর বা সীমার দর্শন হয় তখন এই গণ্ডীবদ্ধ দর্শন ও অসীমের দর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কারণ যা কিছু যেখানে প্রকাশমান সবই তো সেই অনন্তেরই প্রকাশ। সুতরাং সীমারূপে খণ্ডরূপে যে প্রকাশ তাও সেই অখণ্ডপ্রকাশেরই অঙ্গীভূত। এই দৃষ্টিই সমীচীন

দৃষ্টি। বাস্তবিক খণ্ড কিছুই নাই।'

আবার মা বলছেন প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিভাগ সম্বন্ধে সহজ করে সরল ভাষায় ভক্তদের।

'প্রাকৃত সাজে তুমিই ফিরছ।'

'প্রাকৃত জাগরণের প্রশ্ন। কিন্তু যা পাওয়ার পরে আর পাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। যেমন প্রাকৃত জগৎটা দেখা যাচ্ছে সেটা আলাদা। আবার আলাদায় প্রশ্ন নাই তো। সে স্থানও তো আছে।

যা কিছু করা হচ্ছে মৃত্যুরূপে পরিবর্তন যা হচ্ছে। বাদটা বাদ দিতে পারবে না। মৃত্যুরূপে তুমি—চাওয়ারূপে তুমি। গতিরূপে তুমি। স্থিতিরূপে তুমি। বিশেষরূপে নির্বিশেষরূপে তুমিই। (আবার) অনন্ত অন্তহীন।

যেখানে থেকে কথা হয় - আমি বাদ দিচ্ছি না। নিজেই নিজেতে। রূপে অরূপে এক। তোমারই যে অপরূপ সেটা এই উপস্থিত স্থিতিতে থাকলে হবে না। তোমার যে সম্পূর্ণরূপ সেটা বোধে আনতে হবে। বোধে আনলেও চলবে না। বোধ অবোধের পারে যেতে হবে। যা তাই প্রকাশ চাই। তাই বিচার রেখে রেখে বার বার মনকে জানান—তোমার জাগরণের জন্য— রয়েছে জপ ধ্যান এই জাতীয় সবকিছু। যাত্রায় যেন আমি শিথিলে পা না বাড়াই? চেষ্টা আর কি? সে জন্যই তাঁর ভিতর মেখে থাকার চেষ্টা। ওতপ্রোতভাবে থাকা তবে নিজের সঙ্গেই নিজে মেখে থাকা। অনুপায়রূপে যেমন হাহাকারে আছ। উপায়রূপেও তুমিই রয়েছ, সেইটি প্রকাশের জন্য ঝর-ঝর ভাবে মাথায় বিচার রেখে চলা।

বিশদভাবে বলা যায়।

বিচারের একটি অবস্থাতে প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতকে পৃথক করে দেখবার চেষ্টা করা হয়। এই দৃষ্টিতে প্রাকৃত আলাদা এবং অপ্রাকৃত আলাদা। কিন্তু প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃততে প্রবিষ্ট হলে প্রাকৃত না থেকেও থাকে। প্রাকৃতের অতিক্রম হয় মাত্র। কিন্তু প্রাকৃতের রূপান্তর বা লোপ হয় না। কিন্তু এমন স্থিতি আছে যেখানে প্রাকৃত ও তথাকথিত অপ্রাকৃত উভয়কে একই দৃষ্টিতে একই প্রকার দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিভাগ পূর্ণ সত্যের দৃষ্টি অনুসারে নয়। এই জন্যই মা বলছেন, 'প্রাকৃত সাজে তুমিই ফিরছ।'

মা বলছেন ঃ

নিজেই—গ্রহণ ত্যাগের প্রশ্ন নাই। কোনকালে হয়েছিল যে গ্রহণ হবে? ত্যাগ হবে? জন্মই হয় নাই। যে দিকে নিবে—এটা হয় নাই এ যেমন সত্য, নামরূপ ফেলে দাও এটা যেমন সত্য, আবার অক্ষর যার ক্ষরণ হয় না—নামরূপ। মূলে কিন্তু ঐ সত্য। ভুলরূপটা যে ভুল ভাঙ্গাও সে। আবার ভুল শোধনের কোনো প্রশ্নই নাই। জায়গা তো ঐ একটিই। ঐটি লক্ষ্য রেখেই ভুলের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া। বুঝবার জন্যই এই জাতীয় এই সব কথা।'

তাইতো বলা হয়—তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে তাঁর হাতের হয়ে তা অনুভব করতে চেষ্টা করা। সাধনায় চলবার সময় একদিক দেখ।'

সবই সাধন সাপেক্ষ, সাধন না করলে দৃষ্টি খুলবে কি করে?'

'যেমন জলে কত জীবাণু আছে, বায়ুতে আছে। সকলেই দেখতে পায় না। ডাক্তারেরা জানেন আবার যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখেনও। ডাক্তারেরা এইসব জানবার জন্য দেখবার জন্য বছরের পর বছর পড়েছেন সাধনা করেছেন। তবেই তো তাদের রোগ ও জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়েছে। ডাক্তারের দৃষ্টিলাভ হয়েছে। তাইতো বলা হয় সাধনা না করলে দৃষ্টি খোলে না। ঈশ্বরভাবও জাগে না।

যে যত আত্মহারা হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে সে ততটাই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, ভগবৎ দর্শনের দৃষ্টিলাভ করে।

দৃষ্টিশক্তির বহু ক্ষমতা। লোভাতুরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে গাছের ফলও পচে মাটিতে পড়ে যায়।' আনন্দময়ী মা সাধনার গূঢ়তত্ত্ব কথা সরল করে সহজ করে বলছেন সাধক ব্রহ্মচারী কমলাকান্তকে।

'তুমি যদি সাধনা করে ভগবৎদৃষ্টি লাভ করতে চাও, সেই শক্তি যে শক্তি দ্বারা ভগবান দর্শন লাভ হয়, তবে পূর্ণঘট উপুড় করে জল ঢালার মতো নিজের হৃদয় মনের সকল ভাব উজাড় করে নমস্তকে সমর্পণ করে দাও।'

—নমস্ত কে?

—যিনি তোমার গুরু। তোমার ইষ্ট। তুমি যাঁকে ভজন করো।

—কেমন করে তাঁকে প্রণাম করবো?

—নমস্কারের প্রণালী কি?

আনন্দময়ী মা আরও সরল করে বলছেন নমস্কারের প্রণালী।

সাধনার গূঢ়তত্ত্ব কথা।*

—নির্জন স্থানে বসে তুমি চিন্তা করো তোমার ইষ্টকে। গুরুকে।

—মনে করো তিনি তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি গভীর বিশ্বাস নিয়ে তাঁর পদনখ হতে হাঁটু, নাভি, হৃদয়, মুখমণ্ডল এবং শির পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করে, শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে উঠিয়ে নাও তাঁর মস্তক অবধি। কুম্ভক করো। চিন্তা করো। দৃষ্টির দ্বারা তাঁর সেবা করো। অঙ্গ মার্জনা করো। এখন তুমি তাঁকে প্রণাম করবার অধিকারী। এবারে কুম্ভক অবস্থাতেই তোমার শরীরটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বিধিতে ভূমিতে লুটিয়ে দাও। মনে করো তোমার মস্তক তাঁর চরণ স্পর্শ করে রয়েছে। এখন তুমি প্রশ্বাসটি পরিত্যাগ করবে। মনে করবে মৃত্যুসময়ে মহাশ্বাসের মতন যেমন শেষ শ্বাসটি পদতল হতে শুরু করে সর্বাঙ্গে যেখানে যতটুকু জীবনীশক্তি আছে সবটুকু সংগ্রহ করে সে প্রয়াণ করে, তেমনভাবে তুমি এই শরীরকে ত্যাগ করে, মস্তিষ্করন্ধ্র হতে নির্গত হয়ে, সংস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর পদনখাগ্রে প্রবেশ করো। তারপর ধীরে ধীরে তোমার সত্তাকে তাঁর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করাতে থাকো। প্রশ্বাসটি পূর্ণভাবে ত্যাগ করা হলো। তুমিও শিরদেশে গিয়ে নিজেকে সংস্থাপন করলে। এখন কিছুক্ষণ বর্হিকুম্ভক অবলম্বন করো।

—বর্হিকুম্ভক কাকে বলে?

—শ্বাস পরিত্যাগ করে যে কুম্ভক করা হয় তাকেই বলা হয় বর্হিকুম্ভক।

—এবারে চিন্তা করো, তুমি মিশে গেছো তোমার গুরুর শরীরে। কিন্তু তোমার দেহ কি এখন বাস্তবিকই মৃত হয়েছে?

—না।

—বিধাতা যতদিন শরীরকে নষ্ট না করবেন ততদিন পর্যন্ত তুমি আবার ঐ ত্যক্ত শরীরে গুরুর শক্তি, দেবতারই শক্তি সঙ্গে নিয়ে দেবতারই সেবার জন্য বাকী জীবনটুকু অপেক্ষা করবে—হাতে কাজ করা এবং অন্তরে তাঁরই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকা।

* শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন সাধক কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে

—এই হলো নমস্কারের প্রণালী। এই হলো কুম্ভক। বহিঃকুম্ভক। এই হলো ভগবৎ দৃষ্টি লাভের সাধনা।

—তাইতো বলা হয়, দৃষ্টিশক্তির বহু ক্ষমতা।

—এইভাবে সাধনা করলে ধীরে ধীরে তোমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসীমাটুকু অনেক বেশি প্রসারিত হয়ে যাবে। যতটুকু এখন দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে। অসুন্দরের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে সুন্দর তাঁকে তুমি দেখবে। ফুলের মধ্যে লুকিয়ে আছে যে আশীর্বাদ, বেদনার মধ্যে আনন্দ, কান্নার মধ্যে হাসি, অসম্ভবের মধ্যে সম্ভব। সবই তুমি দেখতে পাবে।

—তুমি দুঃস্থ হও, দরিদ্র হও, অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত হও, সকল বিষয়েই হীন ও হতভাগ্য হও তাতেও কিছু যায় আসে না। ভিতর থেকে প্রস্তুত হলেই হলো। অন্তরেই সবকিছু। অন্তরে শুদ্ধভাব জাগলে আলোর সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে। দিব্য সত্যের আলো দর্শন করবে। সত্য সত্যই যখন তুমি ভগবানের জ্যোতি দর্শন করবে, তখন তুমি আশ্চর্য হয়ে দেখবে এ জ্যোতির আলো তোমার অন্তরেই ছিল।'

আরও বিস্তারিত করে বলা যাক।

যাদের চিত্ত ভক্তিপ্রবণ তারা পরমাত্মাকে নিজের ইষ্টদেবতারূপে আকার বিগ্রহসম্পন্ন দেখতে পায়। চিত্ত জ্ঞানপ্রবণ থাকলে শুধু মণ্ডলাকার জ্যোতি-স্বরূপেই হয় দর্শন। বিগ্রহরূপে দৃষ্ট হলে ক্রমশঃ চারিদিক্‌কার প্রভাবমণ্ডল উপসংহৃত হয়ে ঐ বিগ্রহ লীন হয়। ধীরে ধীরে ঐ মূর্তি অথবা মণ্ডল বিস্তারিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায় সমগ্র চিত্তে। চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ হলে পর ঊর্ধ্বদ্বার অবলম্বনে ঐ হৃদয়াকাশ-স্থিতি বিজ্ঞানময় রূপ বাইরে নির্গত হয়। নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভৌতিক সত্তার আশ্রয়ে বহির্জগতে আবির্ভাব সংগঠিত হয়। এই রূপটি স্থূলরূপ। ইহা সর্বভূত গুণের দ্বারা যুক্ত। এই রূপ দর্শনের জন্য চিত্তের অন্তর্মুখী দৃষ্টি আবশ্যক হয় না। ইহা যে ইন্দ্রিয়গোচর রূপ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এই রূপ সকলেই দেখতে পারে না। যোগী ভক্ত স্বরূপে এই রূপের দর্শন লাভ করে। যোগাবস্থায় যেমন অন্তরাকাশে উদিত পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার অংশাংশি সম্বন্ধ ছিল ঠিক তারই অনুরূপ প্রণালীতে ইষ্ট ভগবদ্রূপ নিজরূপ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অঙ্গাঙ্গি-ভাবে হয়। পৃথকভাবে। যোগীর যোগদৃষ্টির সম্মুখে যে ধাম প্রকাশিত হয়, তা বিশুদ্ধ মনোময় উপাদানে রচিত। কিন্তু ভক্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়-গোচর বা স্থূল

জগৎকেই নিজধামরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাকার ধাম ভাসে না। যোগীর দৃষ্টিতে তা মনোময় বা সত্ত্বময়রূপে হয় প্রতিভাত। ইন্দ্রিয় চিন্ময়রূপে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত রূপ-রসাদিসম্পন্ন বাহ্য ভগবৎ দেহ দর্শন করা যেতে পারে না। শুধু ভগবৎ দেহই নয়, ঐ অবস্থায় ভক্তের কাছে সমগ্র জগৎটাই চিদানন্দময় ভগবৎ দেহরূপে পরিণত হয়। ধাম দর্শন হলেই ধামের অন্তর্গত পরিকর-মণ্ডলীরও দর্শন হয়। ঐ ধামে প্রবিষ্ট ভক্তের নিজ দেহও তখন চিন্ময়। চিন্ময় জগতে চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় মন বিশিষ্ট আত্মা চিন্ময় দেহে ভগবৎ সত্তার দর্শন ও আস্বাদন লাভ করে থাকে। যোগী-দৃষ্টিতে যেমন স্পষ্টভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে, তেমনই ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তের অপ্রাকৃত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ স্থূলভাবেই প্রকট হয়ে থাকে। ভক্ত স্বয়ং যা দর্শন লাভ করে তা স্থূল এবং বাহ্য হলেও সাধারণ লোকের অসংস্কৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

তাইতো মা বলছেন ঃ

'ভগবানের দিকে মন বিশেষভাবে রাখতেই হবে। সত্যানুসন্ধানে ভগবানকে নিয়ে থাকাই তো মানুষের কাজ। আর অভাবের ভিতর দিয়েই ভগবানের উপর নির্ভরতা। নির্ভরতাই অনুকূল। সাধনার অনুকূল। নিজেদের তো জানা নেই কিসের ভিতর দিয়ে ভগবান টানেন।

ধ্যান করা চাই। যদি সেই ব্রহ্মধ্যান না আসে, প্রথমে আসনে বসে মূর্তি ধ্যান। তারপর মূর্তি আসনে স্থাপন করে প্রণাম। যে রূপ আসে তাই ধ্যান করো। দেখো ভগবান কোন রূপে প্রকাশ হন। আসলে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করা চাই।

নিত্য অর্পণভাবে থাকতে থাকতে কে জানে কখন অর্পণ হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়। তাঁর দয়ায়। এইজন্য সর্বদা অর্পণ বুদ্ধি রাখতেই হবে।'

'আমি কে ?—এই ভাব নিয়ে সাক্ষীর মতন মনটাকে রেখে দেবার চেষ্টা। নিজেকে খোঁজা।

মনের ব্যথা-কথা, শোনা বলা আপনাতেই তো। নিকট দূরও নিজেতে

নিজেই। অখণ্ড সাধকের ধারাটাও নিজেতেই আছে। যে সাধনায় যে পরমধনে ধনী হওয়ার অধিকার স্বভাবতঃই আছে সেই ধারাটায় অখণ্ড থাকা। সব সময়টাই অহংকার বুদ্ধিরূপে তো নিজেই নিজেতে খেলছেন। অহং ক্রিয়ারূপে যিনি বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপেও তো তিনি স্বয়ং। সেই প্রকাশের জন্য বুদ্ধিটা গতির মধ্যে যে স্থিতি বোধ করে—সেখানে স্বক্রিয়া গতিতে, স্ববুদ্ধি নিজ স্বরূপ প্রকাশিত হওয়া চাই তা হলেই দুর্বুদ্ধি স্ববুদ্ধির যোদ্ধারূপেও ঐ-ই-যে—যা প্রকাশ আছে এবং হয়। তিনিই যে স্বয়ং অনন্ত—অন্ত। সেইটি ধরে না নেমে অন্তঃসারশূন্য হয়ে নিরন্তর চলার চেষ্টা করা। সেই ধারায় সে যে রূপই ধরা দেয় সেই বিশুদ্ধ মনবুদ্ধিতে যা বোধ করে তা স্বয়ং প্রকাশের দিক গ্রহণ করা!

মনের গতি উচ্চ আদর্শে ও নিজ পূর্ণ লক্ষ্যে রাখা লোকলোচনের অগোচরে। কে জানে তাঁর ডাক কিসের ভিতর দিয়ে আসে। দমে যেতে নেই। তুমি সত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত। ঐ দিকে নিজে অগ্রসর হওয়ার জন্য নতুন ভাবধারার গতিতে নিজেই চলা কর্তব্য। বিদ্যা ও স্ববুদ্ধিরূপেও ভগবানই তো ভিতরে রয়েছেন। তাই এই সুযোগ স্বরূপ প্রকাশের যাত্রার দিকে যাত্রা করা কর্তব্য।

সময় তো চলে যাচ্ছে।

পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, সখা স্বামী—একাধারে সব তিনি। সকলেই তো আনন্দের মূর্তি। নিজেকে পেয়ে নিজেতে আনন্দ স্বাভাবিক।

যতক্ষণ পূর্ণপ্রকাশ না হয় ততক্ষণ সৃষ্টি স্থিতি লয়—কার্যে সংযোগ থেকেই যায়। থেকে যায় কি, আছেই তো। বিয়োগ কখনও হয় না, হয়ে ছিলও না, হবেও না।

তাইতো বলা হয়, ধর্মের দিকেই মন দিতেই হবে। ধর্মই তো প্রাণের প্রাণ। আত্মা যা নিত্য সত্য ধরে আছে। সেই নিজ কে? মানতে হবেই যে।

তাইতো প্রথম চাই শ্রবণ। পরে মনন। তারপর কর্মে বিশেষ প্রকাশ। সৎ-কথা শোনা তো ভাল যদি তিনি দোষ দর্শন না করান। দোষ দর্শনে সকলেরই বিঘ্ন হয়। সমতা রেখে যা বলে তাতে ফল হয়। কেন না যেখানে অসৎ দৃষ্টির কথা নাই সেটাই সৎ-সঙ্গ।

সৎ কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে। যেমন পাথরে জল পড়ে পড়ে ছিদ্র হয়, আবার হয়তো কোনো সময় বন্যা এসে পড়ে, প্রকাশ হয়ে যায়।

গ্রন্থপাঠ, সৎ-কথা, কীর্তন সব তাঁকে নিয়েই। তাঁর পাঠ, তাঁর কথা, তাঁর কীর্তন।'

'তিনটিই অভেদ। অভেদ হয়েও তিনি আকার। গ্রহণ পৃথক পৃথক-- যার যেটা।

আসলে ভগবানই তো। তাঁর দিকে যাবার জন্য এক এক রাস্তা। কোনো রাস্তা কারও জন্য—আপন অধিকারে রুচি।

মনে করো বেদান্তগ্রন্থ পাঠ। এর মধ্যে কেউ কেউ বিলকুল ডুবে যায়। যেমন কেউ কেউ কীর্তনে আবেশে মগ্ন হয়। সেইরকম এই বেদান্ত পাঠেও এমন মগ্ন হয় যা হয়তো কীর্তনে হয় না। সে যে লাইনে চলেছে সেই লাইনের পাঠ বা যা কিছু তাতেই মগ্ন।

দেখো না অনেকে বলে, আরে কীর্তনে আবার কি আছে। পরে যখন শুনল, কীর্তনই ভাল লেগে গেল।

—বৈষ্ণব কাকে বলে ?

—যেখানে সর্বত্র সেই বিষ্ণু।

—শাক্ত কে ?

—যে এক 'মা'কেই দেখে। সর্বভাব এক জায়গা থেকে স্ফুরিত। কারো নিন্দা, কারো হিংসা সমতাই তো !

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি স্বামী, তুমিই সব। সর্বনাম তোমারই নাম। সর্বগুণ তোমারই গুণ। সর্বরূপ তোমারই রূপ। আবার সেই অরূপে নিরাকারে যে লাইনে চলবে।

আবার বলে না শৈবের যে পরমশিব—সেই ব্রহ্ম। আত্মদৃষ্টিতে এক আত্মা। বিরোধ তো আসেই না। বিন্দুমাত্র ভেদ দৃষ্টিতেও সেই স্থিতি কোথায় ? তাই যে লাইন নাও—ঐ। বেদান্ত তো ভেদ অভেদের যাহা অন্ত।

সাধনায় চলবার সময় একদিক দেখো, পরে আর কি ? ভেদ অন্ত। সাধনায়ই ভেদ, ফলে ভেদ কোথায় ?

সাধনার গূঢ় রহস্য আর শ্রবণ মাহাত্ম্য সহজ করে মা বলেছেন ভক্তদের।

আরও বিশদ হওয়া যাক।

অনেকে মনে করেন যে বিষয়ে অথবা যে ভাষা শ্রোতার বোধের অগোচর তা শ্রবণ করে কোনোপ্রকার ফল লাভ হতে পারে না। লৌকিক জগতে একথা সত্য। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে সাধক শ্রোতার শ্রবণরূপ সাধনা তার বুদ্ধি অথবা

বিচারশক্তির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না।

বেদবাক্য অপৌরুষেয়। মহাজন বাক্য অপৌরুষেয় না হলেও মহাজ্ঞানী ঋষি মুনিদের নিজ মুখে উচ্চারিত। এই সকল শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে চৈতন্যশক্তি নিহিত রয়েছে। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র লৌকিক শব্দ নয়, যদিও সাধারণ শ্রোতার নিকট ইহারা শব্দরূপে প্রতীত হয়। এইসব শব্দের অন্তঃস্থিত শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবন প্রবাহিত, এমন কি পরিবর্তিতও হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ গুপ্ত শক্তির কার্যকরী রূপ পেতে হলে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐসব বাক্য শ্রবণ করতে হয়। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ফলে ঐ সব শব্দ জেগে ওঠে। চৈতন্যময়ী শক্তিরূপে করে আত্মপ্রকাশ। এই চৈতন্যময়ী শক্তির প্রভাবে দেহ প্রাণ ও মনের যাবতীয় শৃঙ্খল ক্রমশ ছিন্ন হয়ে যায়। এইজন্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে না পারলেও ভগবদ্‌বাণী অথবা মহাজনের বাণী শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করতে হয়। ঐ শ্রবণ বৃথা যায় না। অনেক সময় বুদ্ধিপূর্বক শ্রবণের পরিবর্তে ঐ রকম সরল ও সাদর শ্রবণের ফলে সাধকের অন্তঃকরণের আবরণ খুলে যায় এবং সাধক জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত নিজস্বরূপে স্থিতিলাভ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং অনুভবে না আসলেও শুধু শ্রবণের ফলে অনুভবের পথ খুলে যায়।

তাইতো মা আবার বলছেন :

'এইসব কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ঐ দিকের রাস্তা খোলে। জল পড়ে পড়ে যেমন পাথরে ছিদ্র হয়।'

মা বলেন :

'অভ্যাস যোগের দ্বারাই আধ্যাত্মিক পথে রুচি ও নিষ্ঠা আসে। অন্তর্যামী দেবতাকে বাইরে ভিতরে যে প্রকাশিত করতেই হবে।

আরও বিশদ হই।

প্রত্যয় বিশেষে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হওয়ার নাম অভ্যাস। ভগবদ্‌ভাবে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। স্বীয় চেতনা যখন অন্য বিষয়ে ধাবিত হবে না তখনই ধ্যেয়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাবে। তৎসারূপ্যলাভ হবে। নিজেকে সেই ধ্যেয় বলে অনুভব করা। এইভাবেই সেই দিব্য পরমপুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয়। এই হলো চেতনার ধর্ম। যে কোনো ভাব গ্রহণ করে জ্ঞান শক্তিকে এক ধারায় পরিচালিত করা। আর সেই ভাবটিকে এক ধারায় প্রবাহিত রাখতে

পারলেই তদ্ভাবময় হওয়া সম্ভব। নিজেকে সেই ভাবময় বলেই অনুভব করা। অধ্যাত্মভূমিতে এইভাবে অভ্যাসের দ্বারা ভগবদ্‌ভাবে সারূপ্যলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে।

'ধৈর্য এবং সহ্য সাধনার মেরুদণ্ড। তুমি মাটির মতন সহনশীল ও ধৈর্যশীল হও। প্রাণে গঙ্গাবারি ধারণ করতে পারবে। লোকের পূজা পাবে। যেমন ঘটে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। ঘটকে পূজা করে। তেমন।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন কাব্যান্বিত করে। আরও বিশদ করবার জন্য সুন্দর একটি গল্পের অবতারণা করলেন তিনি—'ঘটের আত্মকাহিনী'।

একজন পূজা করবার সময় ঘটে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করছিল। হঠাৎ ঘট কথা বলতে শুরু করল।

আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম। অনেকে আমার গায়ের উপর দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে হেঁটে যেত। কেউ আবার আমার উপর মলমূত্র ত্যাগ করত। সব সহ্য করতাম। একদিন একজন লোক কোদাল দিয়ে আমাকে কাটতে লাগল। তাও সহ্য করলাম। তারপর আমায় টুকরীতে ভরে মাথায় তুলে নিয়ে এক জায়গায় রাখলো। কিছুক্ষণ পর একটা লাঠি এনে আমায় খুব পিটলো। তারপর আমার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালল। ঢেলে চলে গেল। প্রাণে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি পেলাম। আবার আমাকে সে পা দিয়ে লাথি মেরে দলতে লাগল। তারপর হাত দিয়ে আমাকে খুব মলল। গেল একটা পিণ্ডী বানাল। পরে কুমোরের চাকার উপড় চড়াল। তারপর আমাকে বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগল। হাত দিয়ে যত্ন করে আমাকে ঘট বানাল। আস্তে করে আমাকে নামিয়ে রাখল। আমি ঐ অবস্থায় রোদে কয়েকদিন পড়ে রইলাম। কখনো ঠাণ্ডায়, কখনো গরমে আমাকে নানা অবস্থায় রাখল। তারপর আমাকে আগুনের উপড় চড়াল। সে কি বিরাট অগ্নিকুণ্ড আর তার কি ভীষণ গরম শিখার জিহ্বা। আগুনে পুড়ে পুড়ে আমি যখন লাল শক্ত পাকা হলাম তখন আমাকে পরিষ্কার করে তুলে রাখল। একদিন আমাকে বাজারে নিয়ে গেল অনেকগুলি ঘট কলসীর সাথে।

যে কিনতে আসে সেই তুলে নিয়ে আমাকে টং টং করে বাজায়। শেষ পর্যন্ত একজন পয়সা দিয়ে আমাকে কিনে নিল। আর এখন আমি গঙ্গাজল বুকে পেটে ভরে বসে আছি। দেখ এমন সহনশীল হলে পরে তুমিও প্রাণে গঙ্গাবারি ধারণ করতে পারবে। আমার মতন ধৈর্যশীল হও, তবে তুমিও আমার মতন লোকের পূজা পাবে। তোমাতেও ঠিক ঠিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।'

গল্পটি বলেই মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাসি উচ্ছলতায় রস ও রহস্যে ভরপুর হয়ে উঠলো কাহিনীটি।

মা আবার বলছেন ঃ

'অখণ্ড জপধ্যানে লেগে থাকতে হবে। গাছেরও খাব তলারও কুড়োব, তাতে কি করে হবে? মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। হঠাৎ একটু জপে কি হবে? অভ্যাস যোগের দ্বারা মন একাগ্র করতে হয়।

আত্মস্থ ও আত্মদর্শন কথা যা শোনা যায় এটা তো কেবল শোনাই মাত্র, ধরবার উপায় তো প্রয়োজন। স্থূলতঃ যে রাস্তাটি ধরে আমাদের এগোলে ধরবার সহায়তা হয় ঐ রাস্তাই তো আমাদের নেওয়া উচিত। এই যে দেখতে পাও—ধরো যে হাওয়া বইছে, যে হাওয়া না হলে আমাদের শরীর থাকে না। ধরো তো সে হাওয়াটা, গাছ পাথর জীব জন্তু ইত্যাদি কাকে ছাড়া? তোমরা ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম কি কি সব বলে থাকো না? তারই একটা দিক নিয়ে আমাদের বুঝবার সহায়তার জন্য কথা বলা হচ্ছে।

যেমন বলা হয় সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। সত্য যে চৈতন্য তবে তো আনন্দ। আমরা সব সময়ে জাগতিক হিসাবে যাতে স্থূলতঃ চেতন ও অচেতনের প্রকাশ দেখতে পাই আসলে তাতে কিন্তু সেই যে সত্য চৈতন্য নিত্য ওতপ্রোতভাবে সেটা সাধারণে প্রকাশ নেই। সেটা বিচারে এলে যেমন দেবপূজাদি করবার সময় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করতে হয় তেমন করে আমাদের প্রথমতঃ প্রাণবায়ু রূপেতে আমার ভেতরে (বাহির ভিতর বুদ্ধিটা আছে কি না, তাই ভিতর বলা হচ্ছে) সর্বক্ষণ ক্রিয়া করছে। তবে তো আমি তুমি সাকার নিরাকার বলে থাকি। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে প্রাণবায়ু যেমন আমাদের ব্যাপক ভাবেতে এক অবিচ্ছিন্ন রয়েছে, ইনি কে? ইনি আমাদের সেই সত্য চৈতন্যেরই এক রূপ। এই রূপেতে প্রকাশ। আমরা যদি গুরুদত্ত মন্ত্রাদি নিয়ে সেই প্রাণের সঙ্গ করতে পারি এবং যদি কোনো সময়ে মন্ত্রও না থাকে, শুধু প্রাণের সঙ্গ করতে পারি। তা হলেও আমাদের মন স্থিরের সহায়ক ও প্রাণের প্রাণ

যিনি অখণ্ড নিত্য রয়েছেন তার সন্ধানের সহায়ক হতে পারে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেখানে নিত্য লীলা সেই দর্শন তো জিতেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ না হলে হতে পারে না। আর তা না হওয়া পর্যন্ত আত্মদর্শন অন্তঃস্থিতি প্রকাশ কোথায়?

আত্মারামের নিত্য লীলারূপে প্রকাশ তবে তো একাত্মবোধ। এই যে চঞ্চল বায়ু—আমরা যাই করি যে দিকেই মন দিই না কেন, তার তালটি ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতন অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। সেইরূপ প্রাণবায়ুর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা করো। তাহলে মনটা বাইরের দৃশ্যে ঘুরবার ফেরবার পক্ষে একটু বেড়ার আড়াল হয়।

দ্যাখো না, চঞ্চল ছেলেপুলেকে একবার ধরে নিয়ে এসে খেলা দিলে সাময়িক হলেও স্থির ভাব ধারণ করে। চঞ্চলকে শান্ত করবার জন্য এক লক্ষ্যেরই একমাত্র আশ্রয় প্রয়োজন। সৎভাবের স্বরূপ যে সৎসঙ্গ তার যতই সঙ্গ হবে ততই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে শান্তরূপ ধারণ করবে। আসলে কথাটা কি জানো— অখণ্ড ধারাই অখণ্ডের প্রকাশ জানবে। এ জীবনে এক তাঁকেই পাবার যার একমাত্র লক্ষ্য সে তো তাঁর আশ্রয় পেয়ে বসে আছে, যদিও উপস্থিত অভাব রূপেতে তাঁর প্রকাশ।'

'—মা, তোমাকে দেখে আমার বড়ই ভালই লাগছে। বাড়ি বাড়ি গান অনেক করেছি, কিন্তু এই সুন্দর স্থানে বসে গান করবার একান্ত ইচ্ছা।'

বলছেন দিলীপ রায় শ্রীশ্রীমাকে। কলকাতায় বিড়লা পার্কের শিবমন্দিরে। মা উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে এসেছেন কলকাতায়। ভক্তরা ঘিরে বসে আছে মাকে নিয়ে। এসেছেন দীঘাপাতিয়ার রাণী, গায়িকা রেণুকা সেন, ভক্ত দীনেশ ঠাকুর, নিবারণ সমাজপতি, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, সংজ্ঞা দেবী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও কন্যা অপর্ণা দেবী।

মা হাসি হাসি মুখে গান শুনবার ইচ্ছা জানালেন। শুরু হলো দিলীপ রায়ের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গীত।

—সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি,
আজিও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলি ॥
ওরা জানে না তাই মানে না
আমি জানি তাই মানি,
আমি অন্তরে তাঁর বাঁশরী শুনেছি
তাই ওগো আমি মানি ॥

দিলীপ রায়ের সেই উন্মাদ দুরন্ত সঙ্গীত আর অনুরাগমত্ত অন্তরের আর্তস্পন্দনে আনন্দময়ী মা-ও হলেন ভাবাবিষ্ট। সঙ্গীত শেষে ভাবানন্দে বিভোর আনন্দময়ী মা দিলীপ রায়ের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

ভক্তপ্রবর দিলীপ রায় আনন্দিত চিত্তে বললেন, মা এখন তুমি কথা বলো। তোমার কথা শুনতেই আমার সঙ্গীরা এসেছে। তোমার কথা শুনতে আমার বড়ই মিষ্টি লাগে তাই আমি এদের এনেছি তোমার কথা শোনাতে।

'—তোমাদের কান মিষ্টি তাই আমার কথা মিষ্টি শোনো।' মৃদু হেসে মা বললেন। মায়ের মিষ্টি রসিকতায় সকলেই হেসে উঠলেন। অবশেষে বাসন্তীদেবী শ্রীশ্রীমাকে কোলে নিয়ে বসলেন, আর শুরু হলো ভজন, কীর্তন। একে একে ভক্ত দীনেশ ঠাকুর, রেণুকা সেন, মন্মথনাথ, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সকলেই মাকে গান শোনাতে লাগলেন। এ যেন সঙ্গীতের দেবীর সম্মুখে অবিরাম চলেছে গীতাঞ্জলি প্রদান। গীতাঞ্জলি অর্পণ করছেন ভক্তরা সঙ্গীতের বরদাত্রী দেবীর শ্রীচরণ কমলে। আর সেই ভক্তির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো শিবমন্দির। শিবমন্দির নয়, এ যেন মাতৃমন্দির!

মা শুধু উপদেশই দেন না, দেন চৈতন্য। দুর্ভেদ্য অন্ধকার সরিয়ে পথ দেখান আলোকের। সে আলোকের স্পর্শে হাজার বছরের বন্ধ ঘরের অন্ধকার এক পলকে যায় পালিয়ে। আলো জ্বললে সঞ্চিত পুঞ্জিত অন্ধকার একটু একটু করে যায় না। সম্পূর্ণটাই অদৃশ্য হয়ে যায় এক মুহূর্তে। গ্রন্থিমোচন, দৃষ্টির গ্রন্থি। স্পর্শের গ্রন্থি। আকাঙ্ক্ষার গ্রন্থি!

তারপর সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে মা বললেন :

তাঁহারি গান গেয়ে
চল তাঁহার দিকে ধেয়ে
যায় দিন বয়ে—

মা এখন কাশীতে। বহু লোক সমাগম হয়েছে। কীর্তনে মায়ের ভাবোন্মাদনা হলো। ভাব-সমাধি। অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো, ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। চোখে মুখে অস্বাভাবিক জ্যোতি ফুটে উঠলো। শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগলো স্তোত্র। নিকটেই বসেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ। মায়েরই স্নেহধন্য গোপীবাবা। তিনি স্তোত্রাদি শুনে বললেন, 'এ হলো দেবভাষা, মর্তলোকের সংস্কার নিয়ে এ বোঝা অসম্ভব।'

পরবর্তীকালে আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'ওঁর স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সেজেছে বটে,—যখন যেভাবে সেজেছে তখন সেই অভিনয়ই যথাবৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি জানেন, তিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আছেন। সেইখানে থেকেই সাক্ষীরূপে নির্বিকার ভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংস্কারের অভিনয় দেখে যাচ্ছেন। এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্তা হয়ে শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থান, সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব বুঝে ওঠা কঠিন। এসব সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির অগম্য রহস্য।'

প্রতিদিন বিকালে খোলা জায়গায় সভা করে আনন্দময়ী মাকে বসানো হয়। আর মাকে ঘিরে বসে ভক্তবৃন্দ। গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একখানি পাখা হাতে করে মাকে বাতাস করেন আর শুনতে থাকেন শ্রীমুখের কথামৃত।

মা-ও তত্ত্বকথা সরল করে সহজ করে গোপীবাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কি বাবা! ঠিক বললাম তো?'

গোপীনাথ কবিরাজও বেশী কথা বলেন না। স্বভাবতঃই খুব কম কথা বলেন। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেন, হুঁ।

মা হাসতে হাসতে আবার অন্য প্রসঙ্গ শুরু করেন। এইভাবেই মা ভক্তসনে লীলা করে চলেন দিনের পর দিন। মা যে লীলাময়ী! লীলাময়ী আনন্দময়ী মা!

আবার একদিন গোপীবাবার অনুরোধে শ্রীশ্রীমা এলেন বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের আশ্রমে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সিদ্ধপুরুষ, গোপীনাথ কবিরাজের গুরু। কাশীতে তিনি 'গন্ধবাবা' নামে পরিচিত।

দুই মহাসাধক-মহাসাধিকার মিলনে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। 'গন্ধবাবা' আনন্দময়ী মাকে জগজ্জননীরূপে দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

আনন্দময়ী মা স্বামীজীর বিভূতিদর্শন করে বললেন, 'বাবা! তুমি এসব কি দেখাও? এর চেয়ে তোমার ভিতর যে বস্তু আছে তা এদের দাও না কেন?'

স্বামীজী বললেন, নেয় কে?

মা গোপীনাথ কবিরাজকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবাজী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। তোমরা এসব দেখে ভুলে থেকো না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তা শীগগির আদায় করে নাও।

*

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে আনন্দময়ী মা বলছেন, 'আর দ্বিধা নয়। দ্বন্দ্ব নয়। শুধু সমর্পণ। সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাকো। তবে যা ছাড়বার তা ছেড়েই যাবে। আর যা কখনও ছাড়ে না, তা থেকেই যাবে।

বসে থেকো না। চলতে থাকো। উদ্দেশ্য ঠিক রেখে পথ ধরে চললেই হবে। ভগবান সকল স্থানেই সর্বাবস্থায়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

তাইতো বলা হয় সর্বাবস্থায় ভগবানকে স্মরণ নিজ কর্তব্য পালন।

ভগবানকে ভাবতে ভাবতে তৎভাবাপন্ন হয়ে যায়, তাই 'হবে না—হবে না' ভাবতে নেই। হবে হবে ভাবতে ভাবতে সবই হয়ে যায়। সংশয় আনা পাপ। নিরাশ হয়ো না। ভয়েরও কিছু নেই। সকলেরই হতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই ভগবানকে সমর্পণ করা। আর ধৈর্য ধরে সময়ের অপেক্ষায় থাকা।

সবই দরকার। কিছুই উপেক্ষা করতে নেই। দ্যাখো না, প্রথম কোনো গাছ বা লতা উপরদিকে উঠাতে হলে কতকগুলি আগাছার বা শুখ্না ডাল ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়। সেইগুলির সাহায্যে গাছ বা লতা বড় হতে থাকে। গাছ বড় হলে আর সেগুলির সাহায্যের দরকার হয় না।

পরে কিন্তু সেই গাছ বা লতা থেকে কত ফল ফুলের সৃষ্টি হয়। তাই তো বলা হয় সবই দরকার।

আবার দ্যাখো, সময় না হলে কিছুই হয় না। দ্যাখো না বীজ পুতে যতই যত্ন করো সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। টেনে তো আর গাছ ওঠাতে পারো না। শুধু সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে সেবা করে যাওয়া। তবেই যথা সময়ে গাছ

এবং ফল ফুল সব পাওয়া যাবে। সাধনার প্রধান অঙ্গই হলো ধৈর্য।

ভগবান তো সর্বদাই তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। বাপ মা যেমন চড় মেরে ছেলেপেলেদের অসৎ পথ থেকে সৎ পথে আনতে চেষ্টা করেন সেই রকম আর কি।

তাইতো তিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখ হরণ করার চেষ্টা করেন। সংসারী মানুষ বোঝে কই?

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, হে প্রভু, আমাকে তুমি দুঃখের মধ্যেই রেখো, তাহলে তোমার কথা আমার মনে থাকবে। সুখের মধ্যে থাকলে যে তোমাকে ভুলে যাবো।

সংসারী মানুষ বুঝতে পারে না, তাই দুঃখ অশান্তি পেলে মনে করে মঙ্গলময় করুণাময় ভগবান বুঝি অমঙ্গল করছেন। তিনি বুঝি নির্দয়। কিন্তু তা নয়।

সুখ-দুঃখের অনুভূতিরও উপরের স্তরে না গেলে প্রেমময় ভগবানের প্রেমকে কেমন করে চেনা যাবে? তাঁর সঙ্গে যুক্তাত্মা হওয়া দরকার। তার জন্য মন স্থির হওয়া দরকার। যদিও মস্তক হলো স্থান, তবুও সুখ-দুঃখ অনুভব হয় হৃদয়ে। তাই শ্বাসের গতি হৃদয় হতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে—সেই দিকে লক্ষ্য রাখলে কাজ হয়। এক সময়েতে তো সে বসবেই। হৃদয়েই বসুক কি ভ্রূমধ্যেই বসুক—যেমন জলও গাছের গোড়ায় মাটির উপরিভাগেই দেওয়া হয় কিন্তু পায় মূলে। তার মূলে গেলেই সমস্ত বৃক্ষটিই তাতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। পত্র পুষ্পে ভরে ওঠে। তেমনই মন হৃদয়ে বসলেই ভ্রূমধ্যে যাবে। আবার ভ্রূমধ্যে গেলেই সহস্রারে যাবে। এই তার স্বাভাবিক গতি। তাইতো মনস্থির করাই হলো উদ্দেশ্য। দেহের মধ্যেই প্রথম নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা।

আবার দ্যাখো, যেমন প্রাণবায়ুর স্পন্দন হচ্ছে। যদিও বলা হয় যে প্রকৃতি-জাত চঞ্চলগতি। তবুও এই চঞ্চল গতির ভিতর দিয়েই রাস্তা করে সেই চঞ্চল অচঞ্চলের প্রশ্নই যেখানে ওঠে না সেই তত্ত্বের সন্ধানে স্থিত হবে।

আরও দ্যাখো, এই জগতে যত কিছু সবই এক প্রাণবায়ুর খেলা, নিজের প্রাণবায়ু যদি সেই ধারায় মিলাতে পারা যায় তাহলেই পড়বে ঐ যে সে ধরা। সেই এক। তবেই হলো যুক্তাত্মা।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় ভুলে শুধু সমর্পণের ভাব না এলে তাঁকে কি পাওয়া যায়?

তাইতো বলা হয়, 'মানুষেরই ভগবানেতে মন রাখার চেষ্টা।'

'আবার আছে বাধা। সৎপথের—ভগবৎ সাধনার পথে অনেক বাধা। শুধু মনের সংশয় নয়। নিন্দাও আছে। প্রশংসা নয় নিন্দা আর নিন্দা। অসৎ

কাজে, অসৎ পথে অনেক বন্ধু মেলে। সৎ পথের বন্ধুও কম। প্রশংসাও কম।'

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা আবার বলছেন :

'নিন্দাটা গোবরের মতন। গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই গোবরই যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয়, তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল এবং শস্য হয়। সেইরূপ নিন্দাটা যদি সাধক সহন করে নিতে পারে, মানে, গায়ে মেখে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়। জমি উর্বরা হয় কি। তবেই ছাখো নিন্দাটাও কত ভাল জিনিষ। নিন্দাটাও সেই একই তো।'

'সবকিছু ঝেড়ে ফেলে সকল বহুমুখী বাসনা কামনাকে একতানে আরাধ্য দেবতার দিকে উদগ্র করে তোলাই উদ্দেশ্য। মনকে যদি সেই এক লক্ষ্যে প্রবাহিত করে দেওয়া যায় তাহলে সমর্পণের ভাব প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসবে এবং চিত্ত একটি পরম আশ্রয় স্থান লাভ করতে পারবে। নিষ্ঠা থাকলে সিদ্ধিলাভ হবেই।

যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পথে দৃঢ় নিষ্ঠায় এক লক্ষ্যে চললেই আত্মানুসন্ধান সহজ হয়।'

শ্রীশ্রীমা এবারে দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে বহির্গত হলেন। বিশ্বজননী বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হয়ে ঝটিকাবেগে ছুটে চললেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। কর্মমুখরতার মধ্যে করলেন আত্মদান। জগজ্জননী যে তাঁর সন্তানের জন্য দুঃখ দুর্গম সাধনাপথই নিয়েছেন বেছে।

কলকাতা থেকে প্রথম এলেন ওয়ালটেয়ারে। সেখান থেকে মাদ্রাজ। মাদ্রাজে সাতদিন লীলা করে চলে এলেন পরম পবিত্রভূমি গোদাবরী তীরে। এই স্থানের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর করে একদিন নদীয়ার শ্রীগৌর-সুন্দর—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অপার্থিব উল্লাসে হয়ে উঠেছিলেন উল্লসিত। মা-ও ব্রহ্মানন্দে বিভোর হলেন। অবশেষে চিদাম্বরমে—আকাশ লিঙ্গ, ত্রিচিতে—শ্রীরঙ্গমে অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্তি, মাদুরায় মীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করে এলেন কাঞ্চীপুরমে। কাঞ্চী! কাঞ্চীপুরী! কাঞ্চীপুরম্! সত্যব্রত ক্ষেত্রম্! আর মহাকবি কালিদাসের সেই নগরীষু কাঞ্চী! সহস্র মন্দিরময়ী

স্বর্ণপুরীতে। এই কাঞ্চীপুরমেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৌটিল্য-শ্রীচাণক্য। এক সময়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধভিক্ষু বোধিধর্ম, দিঙ্‌নাগ্‌ প্রভৃতি খ্যাতিমান দার্শনিক পণ্ডিত ও সাধক এখানে বাস করে ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারে করেছিলেন মনোনিবেশ। সেই বহু মনীষার বহু সাধুসন্তের চরণপূত প্রাচীন কাঞ্চিপুরমে আজ পদার্পণ করলেন সরলা অবলা শাহবাগের 'সেই বউটি' ঢাকার মা, শাহবাগের মা, বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

তারপর রামেশ্বর সেতুবন্ধ দর্শন করে এলেন কন্যাকুমারীতে।

এইভাবে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন দক্ষিণা-পথের সমুদয় তীর্থ নদী বনভূমি আর ধর্মনিষ্ঠ সাধুরা যুগ যুগ ধরে যে সব প্রাচীন মন্দিরে সাধন ভজন করে গেছেন তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত সেই সব পুণ্য স্থানগুলিতে। চারমাস ধরে দক্ষিণাপথের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সমুদ্রপথে মা এলেন দ্বারকাতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরিক লীলাস্থলে। যাঁর আদিলীলা শুরু হয়েছিল বৃন্দাবনে যশোদার অঙ্কে, রাধার কুঞ্জে, তাঁর অন্ত্যলীলার সমাপ্তি ঘটেছিল এই দ্বারকায় সত্যভামা ও রুক্মিণীর বিয়োগবিধুর প্রেমাশ্রুসলিলে।

দ্বারকা থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে মা এলেন বিন্ধ্যাচলে। আবার মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো বিন্ধ্যাচল আশ্রম। ঢাকা কলকাতা কাশী এলাহাবাদ থেকে এলেন ভক্তবৃন্দ। এলেন সাধু সন্ন্যাসীরা। উত্তরকাশী থেকে এলেন তপস্যাভাস্বর স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহানন্দে দুর্গাপূজার উৎসব সম্পন্ন হলো বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। আনন্দময়ী মাকে ঘিরে শুরু হলো আনন্দলীলা। আনন্দ আনন্দ আনন্দ, ওগো মহানন্দ অনন্ত অপার··· । মা যে নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ! ব্রহ্মলোকের অন্তহীন রসোল্লাস! অখণ্ড সচ্চিদানন্দ!

'যে শক্তি সঞ্চারিত হলে দীক্ষা, সেই শক্তি সঞ্চারিত হলেই হলো। গুরুশক্তির প্রকাশটা স্বপ্নেই হোক বা বাহ্যেই হোক। ভিতরে খাঁটি প্রকাশ হলে তখন আর বাইরের অভাব থাকে না।'

'যারা ভিতরে পায় ভিতরে পেয়েও হয়ত অভাব ছিল। পরে মিটে গেল। যেমন যেমন যোগাযোগ। যেমন কারো প্রকাশটা ভিতরে ছিল না হয়ে গেল। আবার আস্তে আস্তে ভিতরে ফোটা সেটাও সম্ভব। আবার হয়ত পাওয়া মাত্রই হলো না। দীর্ঘ জীবন গেলেও হলো না। আবার দীক্ষামাত্রই তার পরিবর্তন হয়ে গেল। দীক্ষার ফলটা প্রকাশ পেল! এ হলে তো কথাই নেই। যে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাচ্ছে প্রকাশ হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রেও ভিতরে ক্রিয়া হয়েই যাচ্ছে।

স্বপ্নে মন্ত্র পেল। একজন দর্শন দিয়ে মন্ত্রটা দিয়ে গেল বা মন্ত্রটাই দর্শন হলো। জাগবার পর মন্ত্রের ঐ অনুভূতিটাই শুধু রয়ে গেল। অর্থাৎ জাগ্রত ভাবেও ঐ ভাবটা রয়ে গেল। ফলে তার হলো কি? না, বহুদিনের সমস্যা মীমাংসা হয়ে গেল। নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। এইভাবেই সে চলতে লাগল। দীক্ষা নেবার আর তার ইচ্ছাই নাই।

তবে সকলের জন্য সবটা নয়। একজন বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিল। দণ্ড নিল। কিন্তু কোনও অনুভূতি হলো না। নিতান্ত নিরাশ হয়ে শেষে দণ্ড ত্যাগ করল। নাস্তিকের মতোই যেন হয়ে গেল। এতটা হতাশ এসে গেল যে শরীর তোলবারও আর ইচ্ছা নেই। এই সময়ে হঠাৎ একদিন তার দর্শন হলো। অনুভূতি পেল—'আমার মধ্যেই সব'। নৈরাশ্য চলে গেল। সব দুঃখের অবসান হলো।

পূর্বের ঐ সন্ন্যাস গ্রহণ কর্মাদি বাদ দিয়ে যদি শেষের ঐ অনুভূতিটাই পায়, তাহলে তার আর দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রইল কি? অবশ্য এরকমও হয় স্বপ্নে মন্ত্র পেল আবার দীক্ষাও নিল।

দীক্ষার ফলে বাইরে ভিতরে তখনই স্ফুরণ হয়। তোমার ভিতরে সমগ্রটাই রয়েছে। শুধু প্রকাশের জন্য। বাহির ভিতর এক করবার জন্য। স্থূলে হয়ত কেউ কৃপা করে গেল। দীক্ষা পেয়ে সাধনায় কেউ হয়ত সিদ্ধ হয়, কেউ বা কিছুই পেল না। তোমার শরীরে জাগতিক জাগরণের দিক থেকে বলা হয়—স্থূলেতে দীক্ষা পেলে যেমন তৃপ্তি স্বপ্নেও যদি সেইরূপ পায়। যদি প্রকাশ হয় সেই তৃপ্তি—আমার দীক্ষার আর প্রয়োজন নেই। তখন বাইরে পেলেও যেমন কাজের হলো স্বপ্নে পেয়েও তেমন কাজই হলো।

এক্ষেত্রে বাইরের দীক্ষার প্রয়োজন কেন?

আরও বিশদভাবে বলা যাক।

দীক্ষা অর্থ শক্তিপাত। অর্থাৎ ভগবৎ অনুগ্রহ। ভগবৎ অনুগ্রহের ক্রিয়া-বিশেষকেই শাস্ত্রে দীক্ষারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ মূলে শক্তিপাত না হলে বাহ্য ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হতে পারে না। পৌরুষ অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। পৌরুষ অজ্ঞানের অর্থ, যে অজ্ঞানের ফলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে। শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় বহু হওয়ার জন্য যে অজ্ঞান দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন তাইতো আত্মবিস্মৃতি। ভগবানের নিগ্রহশক্তি, যার দ্বারা তিনি নিজেকে নিজে আচ্ছন্ন করে বিভিন্নরূপে প্রকট হন। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি যোগ সাধনার দ্বারা হয় না। এর নিবৃত্তি হতে পারে যদি পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের আবরণ নিজে অপসারণ করেন। তাইতো এই অপসারণ ক্রিয়াকে তাঁর অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করা হয়। তবে কি সাধনার কোনো উপযোগিতা নেই? উপযোগিতা আছে। সাধনের সার্থকতা উক্ত আবরণের নিবৃত্তিতে নয়। বুদ্ধিতে মূল অজ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপে যে অজ্ঞান ভাসমান হয় সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে। এই অজ্ঞানকেই 'বৌদ্ধ অজ্ঞান' বলে। আবার মূলে পৌরুষ অজ্ঞান না থাকলে বৌদ্ধ অজ্ঞান হতেই পারে না। পৌরুষ অজ্ঞান জাগতিক দৃষ্টিতে অনাদিকাল থেকে রয়েছে। বুদ্ধি প্রকৃতির বিকার। সুতরাং দেহ গ্রহণকালে যখন বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয় তখন তাতে ঐ অনাদি কালের মূল অজ্ঞানও প্রতিবিম্বিত হয়।

দীক্ষা ভিন্ন কোনও উপায়েই পৌরুষ-অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। এমনকি স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আবির্ভূত নির্মল মহাজ্ঞান দ্বারা ঐ অজ্ঞানের নাশ ঘটে না। বৌদ্ধ অজ্ঞান বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তার পূর্বে ভগবৎ অনুগ্রহ শক্তির প্রভাবে দীক্ষা দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

দীক্ষার প্রভাবে পূর্ণত্বের উদয় হয়। কিন্তু দেহগত ও বুদ্ধিগত মলিনতা বশতঃ উহার অভিব্যক্তি হয় না। সাধনার প্রভাবে বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে দীক্ষা প্রাপ্ত পূর্ণত্ব অনুভূতি গোচর হয়। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে স্ফূরণ না হয়ে পারে না। পৌরুষ অজ্ঞানবশতঃই মানুষ নিজেকে পরমাত্মারূপে না দেখে অনন্ত প্রকার বিভিন্ন ভাবে দেখে থাকে। যখন এই অজ্ঞান দূর হয়ে যায় তখন ভিতরে ভিতরে এই নানাভাব অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং নিজের স্বকীয়ভাব বা স্বভাবের স্ফূরণ হয়।

তাইতো মা বলছেন:

'দীক্ষার ফলে বাইরে ভিতরে তখনই স্ফূরণ হয়।'

শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন জপ সমর্পণ সম্বন্ধে :

'জপ করে অর্পণ করতে হয়। অর্পণ না করে যদি নিজের কাছেই রাখা হয়,—ভাল জিনিষটার বোধ না থাকায় তার দ্বারা সেই জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন ছোট ছেলের কাছে বহুমূল্য রত্ন থাকলে সে বুঝতে না পেরে ধনটি হয়তো ফেলে দিল। তবে নিজের কাছে রাখলেও কতকটা ফল হবে। রক্ষার ফলটা পূর্ণাঙ্গীন ভাবে পাবে না। পাত্রের মধ্যে থাকলে যেমনটা হবে। তোমার কাছে থাকলে সম্পূর্ণ ফলটা পেলে যেমন হয়, তা হলো না। এই জন্যই অর্পণ করে দেওয়া।

ছেলে একটা জিনিষ পেলে মার কাছে এনে দেয়। সে তো জানে না একি জিনিষ। মা জিনিষটা দেখে বুঝেন, আরে, এ তো অমূল্য বস্তু। তাই তিনি তখন ছেলের হাত থেকে তুলে নিয়ে রেখে দেন। ছেলে বড় হলে, বুঝতে শিখল, তখন বস্তুটা আবার তাকে ফিরিয়ে দেন, বলে দেন—তোর জিনিষ আমি তুলে রেখেছিলাম। এখন নে।

যখন অধিকারী হলো, এক্ষেত্রে না বুঝার দিকটা পূর্ণ হয়ে এসেছে। বয়স আর জ্ঞান হওয়ায় জানার দিকটা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলো। অর্পণ করতে করতে আস্তে আস্তে প্রকাশ হতে লাগল। নাম নামী কি?

আমি কে? নিজেকে পাওয়াটা কি? এটা যখন প্রকাশ হলো, জপে পরিপূর্ণতা এলো। কোন্ মুহূর্তে যে এটা হবে জানা যায় না—তাই করেই যাওয়া।

অনন্ত সাধনা। অনন্ত অনুভূতি। অনন্ত প্রকাশ। আবার অব্যক্ত। যে যে লাইনে চলে যায় জপ করে। অনন্ত বললাম কেন? গাছের পাতা অনন্ত, আবার পাতার একটা সাধারণ আকার থাকলেও আকারের মধ্যে অনন্ত পরিবর্তন। এদিকেও অনন্ত। পরে অন্তে আর তখনই অনন্ত মাঝে বলে তার প্রকাশ। যেমন বীজটি ঠিকই আছে। শাখা প্রশাখা ঠিকই আছে। আবার সবটাই কিন্তু অনন্ত। এইরকম সাধনার দিক দিয়ে সবই অনন্ত। সংখ্যা জপ করতে করতে কোনো মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠবে। আগুনটা সব জায়গাতেই আছে। কেবল ঘসা। কোন মুহূর্তে ঠিক হবে জানা নেই। তাই উন্মুখ হয়ে থাকা। কোনও যোগী হয়তো বলতে পারেন এতো জপের পরে প্রকাশ হবে।'

'কাজেই বলা হয়, জপ করো।'

'এটাও মার নিকট রাখার মতো অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হবে। কোনো মুহূর্তে

প্রকাশ হবে—একেতে অনন্ত, অনন্ততে এক। কখন যে জপের সংখ্যা পূর্ণ হবে ?

তখন কি পাবে ?

নাম নামী অভিন্ন পাবে। তোমার অর্পণ যা সব কিছু ফিরে পাবে।

আবার দেখা যায় নিষ্ঠা নিয়ম জপতপ করে কিছুই হলো না। গভীর নৈরাশ্যে সব ছেড়ে দিল। দুঃখের বেদনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। এখানে উন্মুখতা এতটা হলো, কর্মটা ছেড়ে দিল, কিন্তু ধ্যানটা যদি কারো একমুখী হলো—তখনই প্রকাশ।'

শ্রীশ্রীমা প্রকাশ করছেন সাধনার গভীর রহস্য ও কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে সরলভাষায়। ভক্তদের জন্য। সকলের জন্য।

মা বলেন :

'ভগবানের সঙ্গে যে নিত্যযুক্ত ইহা প্রকাশ করবার জন্য যে মহাযোগ সেই চেষ্টা মানুষের সর্বদাই করণীয়।'

'তোমার গুরু যিনি জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি তোমারই গুরু তিনি। তাইতো গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে গুরুদত্ত বীজ জপ করা, ইষ্ট ধ্যান করা, ইষ্ট নিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশের দিকে যাওয়া।'

জ্ঞানলাভ কি গুরুশক্তি সাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ ?

মা বিস্তারিত করছেন :

একটা কথা খেয়াল রাখবে—গুরু শক্তির ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির গ্রহণ। এই যে ইচ্ছাশক্তি সেটাও বলা যেতে পারে গুরুশক্তি থেকেই। তাহলে স্বয়ংই প্রকাশ দুদিকেই। স্বয়ং কে ? প্রকাশ তো তিনিই একমাত্র তাহলে পুরুষকার বলে সে কথা হয় আলাদা করা কেন ? হাঁ, হতে পারে অন্তর্গুরুর আশ্রয় বলে। কেহ গুরু নামটা বাদ দিতে চায়। কারণ পুরুষকার নিজের কর্মের উপরে বিশ্বাস যার

প্রকাশ। যদি ভাল করে বলাও হয় তবে যিনি পুরুষকারে তীব্র ইচ্ছার ক্রিয়া করছেন সেইরূপেতে তিনি স্বয়ং প্রকাশ বিশেষরূপে। তাহলেই-বা আর কোনোদিকে আপত্তি উঠবার কারণ থাকে কি? এই সবই তো সাধারণ ভাবে যারা বলবে, প্রশ্ন তুলবে মনের নিয়মিত গতির কথা।

আর সেখানে যে সবই সম্ভব।

পুরুষকারেও যে গতি তাতেও ঐ শক্তিরই তো ক্রিয়া। সেই গুরুশক্তি তার ভিতর দিয়েও বিশেষ কাজ প্রকাশ করতে পারে তো? বহিঃশব্দের প্রয়োজন হলো না। কাহারও বহিঃশব্দের অপেক্ষা থাকতে পারে, আবার আবার কাহারও বহিঃশব্দ ভেদ করে অন্তরে প্রকাশিত হতে পারে না কি? এত আবরণ নষ্ট হতে পারে আর এটা হতে পারে না? গুরুর উপদেশ অন্তরে ক্রিয়া করল।

একবার যখন গুরুধারণ হয় সাধারণতঃ ছেলেদের দেখা যায়, বার বার বলে দিতে হয়, আবার একবার বললেও স্মরণ থাকে। কোনো কোনো ছেলের সব বিষয় না বললেও পড়ার ধারায় তার ভিতর স্ফুরিত হয়ে ধরা পড়ে, দেখো না কি? ঐরূপ চতুর ছেলেও হয় না কি?

যেমন সকলেই উপাসনা করে একসঙ্গে অনেকেই দীক্ষা নিয়ে। দুই একজন যেন একা সমভাবে আশ্রয়লাভ করেও বেশী উন্নত হয়ে যায় জগৎগুরুরূপেও তো। তবে পূর্ব পূর্ব জন্মের উপদেশ এই সময়ে স্ফুরণ মেনে নেওয়া যেতে পারে। আবার তার উপাসনায় সময়ের মহাযোগে বিশেষ প্রকাশ, এটা হতে পারে না কি? কারো কোনো মুহূর্তে প্রকাশ। কাউকে তীব্র উপাসক দেখা যায় তো! যোগ যা আছে যে যোগের চেষ্টা তিনি স্বয়ং প্রকাশ হবেন বলেই নয় কি?

কত ছেলে কলেজে পড়ে First আর ক'টি হয়, একই Professor-এর তো যোগাযোগ। কোন মুহূর্তে কার যোগাযোগ হবে বলা যায় না। যেমন প্রথম দিক দিয়ে ফেল্ করে গেল, কিন্তু শেষ রক্ষাই রক্ষা। প্রথম দিকেই তাকে বিচার করে শেষ করা যায় না পরমার্থ ক্ষেত্রে—শেষ রক্ষাই তো প্রথমত রক্ষা। আর মন্ত্রটা কি?

মন্ত্রটা তো ঐ 'তুমি'—'আমি' যে বোধে রয়েছ সেই অহংকার যুক্ত হয়েছ, আর স্বয়ং হয়েছেন ঐ শব্দরূপে। ছাখো না, সেই শব্দগুলির কি সুন্দর যোজনা মহাবাক্য রূপেতে। যেমন অখণ্ড বাঁধে আছ বলে মনে করো, এখানে মনের ব্যাপার তো? তা থেকেই তো ঐ দুচার টুকরো অক্ষর যোজনা। যে শব্দ তা

বলা মাত্রই জ্ঞান। সেই যে অক্ষর, সেই অক্ষর পুরুষের সঙ্গে কেমন যুক্ত। ঐ দেখো এখন শব্দ ব্রহ্ম—শব্দ মাত্রে আত্মস্থিতি। দেখো বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু। এই টুকরো আগুনের টুকরো আর কি—সেই যে জ্ঞান স্বরূপ।

ধরো না যে বন্ধনে ধরেছিলে অখণ্ড মনে 'আমি'—'তুমি' নিয়ে আবার ঐ শব্দেই উদ্ঘাটিত করল সেই শব্দ যোজনাযুক্তই। শব্দ দ্বারাই তো নিঃশব্দে ঐ যে অখণ্ডরূপেরই প্রকাশ। আরে ঐখানে সবই সম্ভব নয় কি জ্ঞান অজ্ঞানের পার যেখানে ?

যতক্ষণ সেই জ্ঞানে স্থিতি না হয়, তরঙ্গ ও শব্দের মধ্যে সকলেই আছ। এক শব্দ বাইরে এনে দেয়, এক শব্দ অন্তর্মুখ করে দেয়। এই যে বাইরে এনে দেয় এর মধ্যেও অন্তর্মুখের সঙ্গে যোগ রয়েছে। সেই জন্য সেই অন্তর্মুখে যে যোগ রয়েছে তা কোনো শুভ মুহূর্তে মহান যোগে যুক্ত হয়ে সেই মহাপ্রকাশ অর্থাৎ যা-তা। যেমন স্বয়ং প্রকাশ তেমন এও আবার সম্ভব নয় কি ? এটাও প্রকাশ। যেমন স্বয়ং কোনো স্থানে বহিঃশব্দ বিনাও স্বয়ং প্রকাশ মানতে আপত্তি কি ? কোনো স্থানে অপেক্ষা রাখে, কোনো স্থানে অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাধারণতঃ জীবজগতে আপোক্ষকই। যেখানে থাকে না পূর্বজন্মে শোনা ও সংস্কার আছে তাও হতে পারেই জীবজগতে। আবার পূর্বজন্মে শোনা ও সংস্কার না হয়েও হতে পারে কোথায়, ভাববার বিষয় নয় কি ?

স্বয়ং প্রকাশ সেখানে বাধে কোথায় ? রকমারী তো নিজেদের রকমারী দৃষ্টি বোধে দেখা ও বলা।'

আরও বিশদভাবে বলা যাক।

কৃপা শব্দে গুরুশক্তিই লক্ষিত হচ্ছে। গুরুশক্তি আবার অন্যকিছু নয় ঈশ্বরের নিজশক্তি যা তিনি আর্তও অজ্ঞানী জীবকে উদ্ধার করবার জন্য প্রয়োগ করেন। পুরুষকার বলতে জীবের অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যমকে বোঝায়। এখন প্রশ্ন হলো যে কোনো সাধক নিজে চেষ্টা করে জ্ঞানলাভ করতে পারে কি না ? অথবা গুরুকৃপাশক্তিবলে সাধকের বিনা উদ্যমে জ্ঞানপ্রাপ্তি হতে পারে কি না ?

দ্বৈত দৃষ্টি থেকে দেখলে বলতে হয় উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। কারণ গুরুকৃপা শুধু নয়। কৃপার সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যের ধৃতি শক্তির অভাবে যথোচিত ভাবে তা কাজ করতে পারে না। শিষ্য বা আধারের ধারণশক্তির অভাব হলে গুরুদত্ত কৃপার সম্পূর্ণ সফলতা ঘটে না। আবার আধার যতই

প্রবল হোক এবং সাধকের ধারণ সামর্থ্য যতই অধিক হোক, কার্যকারিণী শক্তি গুরু থেকে সংক্রান্ত না হলে শুধু আধারের শক্তি দিয়ে ফললাভ ঘটে না।

এইজন্য বলা হয় যে যদিও কৃপা পুরুষকার পরস্পর সাপেক্ষ তবুও কৃপার মহিমা অধিক। কারণ পুরুষকারের ক্ষীণতা বা দুর্বলতা কৃপার বলে দূরীভূত হতে পারে। তা ছাড়া এও সত্য যে যতটুকু পুরুষকার জীবে নিহিত আছে তার মূলেও কৃপা বিদ্যমান।

পুরুষকারের মূলে ইচ্ছাশক্তি এবং কৃপার মূলে গুরুশক্তি। এবং গুরুশক্তি ইচ্ছাশক্তিরও মূল। গুরুশক্তি থেকেই ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা গুরুশক্তির উপর নির্ভর করে। গুরুশক্তি মহাশক্তি।

মহাশক্তিতে ইচ্ছাই নেই। তা ইচ্ছাহীন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা। তাইতো শ্রীশ্রীমা ইচ্ছাকে গুরুশক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করছেন। গুরুশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই দুই ক্ষেত্রেই একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ মহাশক্তিই কাজ করে থাকে। মূলে একমাত্র মহাশক্তির স্বভাবই খেলা করছে। গুরুভাব স্বীকার করলেই ইহা যেমন সত্য, গুরুভাব অস্বীকার করলেও ইহা তেমনই সত্য।'

তাইতো মা বলছেন :

'এই যে ইচ্ছাশক্তি সেটাও বলা যেতে পারে, গুরুশক্তি মেনেই ; তাহলে স্বয়ং প্রকাশ দুদিকে।—

কিন্তু গুরুশক্তি যদি এক হয় তবে আর আলাদা ভাব কোথায়? একজনের কাছে দীক্ষা নিয়ে যে আবার অপরের কাছে কিছু লাভ করলো বলে মনে করে, এখানেও কিন্তু সে একই শক্তির খেলা হতে পারে। কারণ পরে সে যা কিছু লাভ করলো তা যে তার দীক্ষার জন্যই নয় তা কে বলতে পারে? আবার এমনও হয় যে কেউ দীক্ষার পর অপরের নিকট গিয়ে এমন কোনো উপদেশ লাভ করলো যাতে তার গুরু নিষ্ঠাই বেড়ে গেল। এরকম কতই হতে পারে। কাজেই অজ্ঞান অবস্থায় যা ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়, জ্ঞান হলে দেখা যায় তা এক গুরু শক্তিরই কাজ। কাউকে হয়তো দেখলে যে সে সাধন ভজনে উন্নতিলাভ করে এমন একটি অবস্থায় পড়লো যাতে পড়ে সে বেশ ঘুরপাক খেতে লাগলো। তখন হয়তো মনে হয় তার জীবনটাই বৃথা গেল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। এই যে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়, তাও কিন্তু গুরুর ইচ্ছায় হচ্ছে এবং এই অবস্থাও তার দরকার আছে বলেই হচ্ছে। আবার হঠাৎ এক সময় এই অবস্থা থেকেই ইষ্টের সাক্ষাৎকার হয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই বলা হয় যে

একবার গুরুর আশ্রয় লাভ করলে তিনি নিরাশ করেন না।'

আবার অনেক সময় বলা হয় যে, গুরুবাক্য লাভ না করলে কিছুই হয় না। সেইজন্য দীক্ষা নেওয়ার অর্থই হলো গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। এখানে দীক্ষা নিয়ে সে যে গুরুর আশ্রয় পেয়েছে এই ভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। এবং এই ভাবধারাই তাকে পরমপদ প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে চলে। সাধারণ লোকের মধ্যে জীবভাব প্রবল বলে সে নিজের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। সে আজ হয়তো মনে করলো যে সে একটা বিশেষ মন্ত্রলাভ করেছে এবং তাই তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। কিন্তু কিছুদিন পর তার নিজের উপর অবিশ্বাস আসবে। সে হয়তো তখন মনে করবে যে ঐ মন্ত্র সে নিজেই বেছে নিয়েছে কাজেই তাতে যে ফল হচ্ছে না তা আর আশ্চর্য কি? এ শরীরটার কাছে এলে এ শরীরটা অনেককে বলে, তাদের যে নাম ভাল লাগে সেই নাম যেন তারা করে। এতে অনেকেই বলে, 'মা তুমি তো কোনো নাম বলিয়া দিতেছ না। আমার নাম যে আমাকেই ঠিক করিতে বলিতেছ। এ থেকেই বুঝা যায় যে জীবভাবের জন্য লোকের দুর্বলতা সহজে যায় না।

পুঁথিতে যে মন্ত্র আছে তা কোনো মহাপুরুষেরই বাক্য। কাগজে লেখা আছে বলেই সেটা কাগজ নয়। সেটাও শক্তিযুক্ত বাক্য। সাক্ষাৎভাবে কোনো মহাপুরুষের বাক্যলাভ এবং পুঁথি থেকে কোনো মন্ত্র লাভের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুঁথি থেকে মন্ত্র লাভ করলে, তা সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট থেকে লাভ করা হলো না। এখানে মহাপুরুষ ও তাঁর বাক্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়ে গেল। কিন্তু কারো কারো পক্ষে এই ব্যবধানই নয়। সে পুঁথি থেকে মন্ত্র লাভ করেই মনে করে যে, সে সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট থেকেই তা লাভ করেছে। এরূপ ভাব যার হয়, তার ঐ ভাবেই কার্য সিদ্ধি হতে পারে। এ দেহের কাছেও অনেকে এসে বলেছে, 'মা, এই মন্ত্র জপ করতে চাই, এতে কি অমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না?' এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে এই শরীরটা হয়ত কখনো কখনো বলছে, 'হ্যাঁ হইবে।' এগুলি কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা। সাধারণতঃ এরূপ বলা বড় হয় না।

স্বপ্নের দীক্ষা সম্বন্ধেও এই জাতীয় কথা শুনা যায়। কেউ কেউ বলেন যে স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করলে ঐ দীক্ষা ততক্ষণ কার্যকরী হয় না যতক্ষণ না ঐ দীক্ষামন্ত্র কোনো জীবিত গুরুর মুখ থেকে লাভ করা যায়। আবার এমনও হতে পারে যে গুরুর নিকটে সাক্ষাৎভাবে দীক্ষা লাভ করলে যে শক্তি লাভ হয়, উহা পূর্ণভাবে স্বপ্নেও হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে কিন্তু একথা বলা চলে না যে,

আবার গুরুর মুখ হতে ঐ স্বপ্নের মন্ত্র নিতে হবে। এ দেহ তো কিছুই ফেলতে পারে না। এ দেহ বলি কেন? বাস্তবিক পক্ষে কিছুই মিথ্যা নয়। সবই যে সত্য! সব সত্য বলেই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো নাম জপ করে কেউ কেউ শীঘ্র ফল লাভ করে। আবার কারো বিলম্ব হয়। এই যে শীঘ্র এবং বিলম্ব হওয়া যা কিছু দেখো তা তোমরা কালের মধ্যে আছ বলেই দেখো, তা না হলে শক্তি হিসাবে সবই সমান।'

মহাপুরুষের দীক্ষা, সাধারণ লোকের দীক্ষা ও বই থেকে কোনো মন্ত্র নিজেই নির্বাচন করে জপ করা—এই প্রসঙ্গেই মা বিস্তারিতভাবে বললেন।

আবার প্রশ্ন হচ্ছে যাঁর মন্ত্র চৈতন্য হয় নি সে যদি দীক্ষা দেয় তবে ঐ দীক্ষার কোনো ফল হয় কি না?

মা বলছেন:

'বাস্তবিক এমন একটা অবস্থা আসে যখন মনে হয় এ জাতীয় দীক্ষা থেকে কোনোই কাজ হয় না। আবার এমনও দেখা যায় যে, গুরুর নিকট যে মন্ত্রের চেতন হয় নি, উহাই আবার শিষ্যের নিকট চেতন হয়ে গেছে। বারদীর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধেও এইরূপ কথা শুনা যায়। তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করে জ্ঞান লাভ করলেন অথচ গুরু নিজে অজ্ঞান রয়ে গেলেন। সর্বত্রই এক আত্মা বা এক সত্তা। তিনি কার নিকট কিভাবে প্রকাশিত হবেন তা কি বলা যায়? অনেক সময় দেখা যায় যে কেহ কয়েকজনের কাছে দীক্ষা নিল কিন্তু কিছুদিন জপাদি করে কোনো ফল না পেয়ে অন্য কারো নিকট থেকে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যাকুল হলো। এখানে তোমরা দেখেছো যে একজনই ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট যাচ্ছে। কিন্তু গুরুশক্তি যখন তার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে তখন সে বুঝবে যে একমাত্র গুরু যিনি তিনিই তাকে বার বার কৃপা করছেন। দীক্ষা পেয়ে কিছুই হলো না বলে যে ব্যাকুলতা আসে, এ থেকেই বুঝা যায়—দীক্ষাটা বৃথা হয় নি। দীক্ষা না হলে হয়তো ব্যাকুলতা আসতো না।

গাছের জন্য তোমরা তো বীজ বপন করো। বীজটিকে তো মাটিতে চাপা দিয়ে রাখলে, মাটির নীচে থেকে ঐ বীজ কি ভাবে বৃক্ষ হয়ে উপরে উঠবে তা কিন্তু সে নিজেই ঠিক করে নেয়। আবার ছাখো, এক সময় কতকগুলি বীজ বুনলে, কিন্তু সব গাছ একই সময় সমানভাবে বেড়ে ওঠে না। কোনটি সবল আবার কোনটি দুর্বল হয়ে ওঠে। কিছুদিন পর দেখা যায় ঐ দুর্বল চারাটিই

সবল হয়ে অন্ত চারাগাছগুলিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠছে। কাজেই কখন কি ভাবে যে কার বীজ কাজ করবে তা বলা যায় না। তোমরা অনেক সময় বল যে বীজ পুরাতন হলে উহা হতে গাছ হয় না। সেইজন্য গাছ করতে নূতন বীজের খোঁজ করা হয়। সেইরূপ বলা হয় যে সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট বীজ পেলে উহা চেতন বলে সহজেই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কুলগুরুর বা সাধারণ লোকের নিকট থেকে কোনো বীজ পেলে উহাতে কোনো ফল হয় না, কারণ ঐ সব বীজের হয় তো এককালে চেতন ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে মনে রেখো এই জাতীয় বীজ নষ্ট হয় না। কারণ ইহা যে নিত্যবস্তু। এখানে যে বীজরূপে স্বয়ং ভগবানই বিরাজ করছেন। ভগবান কি নষ্ট হবার জিনিষ? আর মাটিতে বীজ বুনলে যা নষ্ট হতে দেখা যায় তা কি বাস্তবিকই বৃথা যায়। বৃথা কিছুই যায় না। ঐ বীজ মাটিতে পচে সার হয়ে থাকে। যদি ছাখো যে ঐ বীজ পিঁপড়ায় খেয়ে ফেলেছে তাহলেও বলা যায় যে উহা নষ্ট হয় নাই। ভগবানই বীজের শক্তিটা উঠাইয়া নিয়া উহা পিঁপড়ার পুষ্টিসাধনে লাগাইয়া দিয়াছেন। সকল বীজই—সকল নামেই আছে ভগবানের পূর্ণশক্তি।

ভগবানের উপর তো কেহই নাই। যা কারণ তিনিই স্বয়ং। কারও শক্তি নাই কিছু করার, এইটিই মনে রাখা।'

'যিনি স্থূলে রয়েছেন তিনিই সর্বমূলে। যিনি মূলে তিনি স্থূলে। এখন ইহাতে নাই কি আর আছে কি? যেখানে স্বয়ং তুমিই বল আমিই বল, সেও যে স্বয়ং। একমাত্র স্বয়ং। তিনি ছাড়া তো আর কেহ নাই, কিছু না, স্বয়ং সম্পূর্ণ। যে যে তত্ত্ব স্বরূপ বা যে দিক দিয়া যে মানিয়া চলে। বিগ্রহ আকারে চিন্ময় অপ্রাকৃত—যেখানে স্ব স্ব ধাম। আর বিগ্রহ অতীতে অনতীতে স্বয়ং। আচ্ছা, যেখানে স্বয়ংই সেখানে কি ভাবায়—কার অভাব? কান্নাই বা কোথায় আর নাই বা কোথায়? স্বয়ংই যদি সবেতে, অভাবে আছে নাই। আছেও না—না ও না, হাঁ ও না,—যা বলবে তাই। সেখানে বুঝিয়া লওয়া অবাধ। এই যে ব্যক্ত শক্তি যাহা সুখ দুঃখের পরিমাণ ভাবায় যাহা

কিছুটা ব্যক্ত হয়। আর অব্যক্ত শক্তি যা, কি হয় আর নয়—ভাব।

স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। স্ব বা স্বয়ং এইরূপ নিজ বোধাত্মক ভাবটি যাতে সুপরিস্ফুট, তাহাই স্বভাব। 'নিজে' বলতে যা বুঝ, তাই স্বভাব বা অধ্যাত্মনামীয় চেতনভূমি। আর 'ভূত'—হইয়াছে' বা 'হইয়াছি' এইরূপ ভাব যা দেখে অদ্ভূত হয়, তার নাম ভূতভাবোদ্ভবকর। কোনো ক্রিয়া বা গতি প্রকাশিত হয়ে, তার ফলস্বরূপ বা পরিলক্ষিত হয় তাহাই ভূত। পদার্থ সকলকে সাধারণতঃ ভূত বলা হয়। পদার্থ বলে যা তোমরা বুঝ, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াময়। মাটি জল বাতাস প্রভৃতি যা কিছু, সে সমস্ত সর্বদাই স্পন্দনময়, ক্রিয়াময় তার বাহ্য ভূতমূর্তির অন্তরে অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়াময়মূর্তি রয়েছে। সেই ক্রিয়াময় ভাবটি স্থূল ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু সেই ক্রিয়ার রূপটি ভূতরূপে বা বস্তুরূপে পরিদৃষ্ট হয়। ক্রিয়া যে আকারে বা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাহাই সেইজন্য ভূত নামে অভিহিত। ভূতশক্তিটি ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপে প্রকটিতা শক্তি বর্তমান এবং ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া অতিক্রম করে তার বাহ্যে যে মূর্তি ফুটে থাকে, তাহাই ভূত।

সাধারণ বীজ থেকে যে বৃক্ষ হয় সেই ক্রিয়াটি কি দেখতে পাও—কি? অনুভবেই বুঝ? গাছ ও গাছের যা প্রকাণ্ডে ছোট বড় কাঁচা পাকা ফলটি হয়, সেইটি কি কি ভাবের কোন গতিতে প্রকাশ তাও কি দেখতে পাও বা ধরতে পারো? এই যে বিকাশের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সব সময় তার অন্তর্নিহিত সূত্ররূপে বীজটি রক্ষিত আবহমান কালের ভিতর দিয়ে চলে আসছে—কালে কালাতীতে। সর্ববীজ যাতে রক্ষিত স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কারণাতীতে, বীজ বীজাদিতেও। ঐ যে বীজ বৃক্ষ আকারে তোমরা দেখে আসছো প্রাকৃত জগতের ভিতরে, নিজে নষ্ট দেখছো। কারণ যে স্থিতিতে যেখানে বীজ সেখানেই এই দেখা। যা অবিনাশী যা নষ্ট হয় না তার সঙ্গে যতক্ষণ পরিচয় না হয় ততক্ষণ প্রশ্নের অন্ত কোথায়? এখানে প্রশ্ন আসাই তো নিজেকে পাবার সত্য জগদ্দৃষ্টে। সেইজন্যই বলা হয় 'হরিরেব জগৎ'। জগদেব হরি। যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ। যত্র নারী তত্র গৌরী। শাস্ত্রে শোনা পড়া কথায় অনুভব যাহা ইহাও। এখন সেদিক দিয়া যাহা তোমাদের প্রকাশ—তুমি আমি এই প্রকাশে অপ্রকাশ। যেমন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে যুগে যে প্রকাশ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেটি যে প্রকাশ যেখানে আপেক্ষিক। কোনটি বাদ দিয়া কোনটি নয়। সেইরূপ আপেক্ষিক এবং অনপেক্ষিক নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিত অবাধ স্বয়ং যেখানে ঐ।

জাগতিক অভাবের দিক্ বহিঃপ্রকাশ প্রাকৃত জগতেই। কিন্তু অভাবের তাড়নায় যে স্থলে স্ফুরণ সেইটি বুঝিয়া লওয়া। ঐ সেইটিও নিয়া মহা-যোগিত্বেও। কাজেই বহির্জগতে যে বন্ধনের বাধনের ক্রিয়ার অপেক্ষা যেখানে রাখে না, যদিও সেখানে হয় না, বুঝতে হবে অব্যক্ত হতে মূলে স্বক্রিয়ার, অতএব তিনি যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে যা তাই ধরে নিতে। ওখানে নাই কি ? সবই যে আছে। যে ভাবে সে ভাবে স্থান স্থিতি অনুসারেও। কাজেই শারীরিক এবং সবকিছু যেমন দেখে আসছো তেমনই।

জগতের অভাব বোধ, তাপিত হাহাকার আকুলি বিকুলি—ইহা জীব জগতেই। একটা কথা মনে রাখা সবখানেই সব দিক দিয়া অনন্ত। এ যেহেতু অন্তিম এক একটির মধ্যে আছে। যে স্থলে অন্তিম অনন্ত সান্ত বল, সেই অন্তিম মনে হাহাকারেও অন্তিম। অর্থাৎ যে হাহাকারে তোমার প্রকাশ সেইটি কি রূপ, কোন শক্তির ক্রিয়া জানো কি ? যেমন পাথরে পাথরে ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করে, পাথর কি আকার কি রকম অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু অগ্নি উৎপন্ন হওয়া স্থিতি যে মুহূর্তে। সবেতে সব, সেই স্থান রয়েছে তো। পূর্বেই বলা আছে এখানে কিন্তু সবই সম্ভব—সব দিক দিয়া সবখানে সব সময় সবকিছু প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু যেখানে থেকে সেইটি খেয়াল হওয়া সেই দিক নিয়া। খণ্ডেতে অখণ্ড, অখণ্ডেতে খণ্ড—কোন দিক দিয়া ধরিবে ? যে দিক দিয়ে যা বলবে তাই তো ঐখানে। যা ত্রিতাপ দগ্ধ জ্বালায় 'হা ভগবান' প্রাপ্তির ইচ্ছায় অনন্ত স্থানে স্থিতি অনুসারে বাসনার বাসায় স্থিত, সেই সেই স্থান হইতে হাহাকার জগতেই তো। যে সব হাহাকার যে মূল 'হা ভগবান পাইলাম না' বলে পরিস্ফুটিত হওয়া, সে হাহাকার রূপটি যখন যার পূর্ণাঙ্গীন তখনই তো তার প্রাপ্তি। যিনি অপ্রাপ্ত হাহাকার রূপে এসেছেন তিনি প্রাপ্তরূপেও যেখানে যেটি প্রত্যক্ষ জলন্ত জাগ্রত।

জীবজগতের অভাবের দিকগুলি—ত্রিতাপের জ্বালা, তার মধ্যে ভগবানকে পেলাম না, অতৃপ্তির জ্বালা। যে মুহূর্তে জীবাধারে পূর্ণ অভাবটি যে সংস্কারে যেখানে সেই অনুভব প্রকাশে ক্রমগতিতে ভগবান প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়ে যায়।'

শ্রীশ্রীমা আরও সহজ করে বলছেন :

'তাইতো বলা হয়, চাও—চাও আরও চাও। চাইলেই তো পাবে। চাওয়ার মতন চাইতে হয়। ত্যাখো হয় কি জানো ? আকাঙ্ক্ষার পরেই তো কর্ম

আসে। কিন্তু যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষা না হয় তাহলে আবার অন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে পূর্বের আকাঙ্ক্ষা চাপা পড়ে যায়। এক আকাঙ্ক্ষা যদি তেমন তীব্র হয় তবে তো আর অন্য আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে না। একমাত্র আকাঙ্ক্ষাই থাকে। অভাবও পুরোপুরি হওয়া চাই। যখন আর অভাব হওয়ার জায়গা থাকে না তখনই ধন লাভ হয়। তোমরা তেমন ভাবে চাও না, চাইলেই পাবে।

এ সংসার বন্ধন থেকে যদি মুক্তি চাও তবে তাঁকে বাঁধ। এ সংসারকে বাঁধা পরে উহাও আপনিই কাটিয়া যাইবে। মায়া—মোহ—ভালবাসা। এখন সংসারের দিকে ভালবাসা আছে, উহা ঘুরাইয়া তাঁর দিকে দাও। তাঁকে ভালবাস। তাঁর প্রতি মায়া করো। সংসার মায়া ছুটিয়া যাইবে। পরে তাঁর মায়াও থাকিবে না।

বন্ধন—মুক্তি কি চাও? চাইলেই তো পাও। কিন্তু কই চাও তো না। বন্ধনই তো ভাল লাগিতেছে।'

কিন্তু যতই বলো, সংসারী জীব মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারে কই? সর্বদাই আমি, আমার আমার। মুখে হরিনাম করছে মন পড়ে আছে সংসারে। ছেলে-মেয়ের উপর। তীর্থ করতে এসেছে কিন্তু মন ঠিক আছে কবে বাড়ী ফিরবে। এই জন্যই তো সংসারী জীবের জ্বালা, যন্ত্রণা আর অশান্তি যেতে চায় না। সংসারীর কত দুঃখ, কত নৈরাশ্য। কত লজ্জা, কত লাঞ্ছনা। কত দায়, কত ক্লেশ।

তাই আনন্দময়ী মা বলছেন:

'মায়া ছেড়ে সেবার দিকে যাও। সংসারের কাজ করো, সেবার ভাবে করো। নিজেকে ভগবানের সেবক বলে মনে করো। ভগবৎ জ্ঞানে সকলেরই সেবা করে যাও। নিজেকে সমর্পণ করো ভগবৎ চরণে ভগবৎ সেবায়। তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে, সংসারে থেকেও শান্তি লাভ করতে পারবে।'

এই সম্বন্ধে আবার একটি গল্পের অবতারণা করলেন শ্রীশ্রীমা :

হঠাৎ একদিন নারদ এসে উপস্থিত হলেন শিবঠাকুরের কাছে। তারপর নানা কথাবার্তা চলতে লাগলো।

কথায় কথায় শিবজী বললেন নারদকে, দেখো নারদ, সুখ দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তা যদি পারতো তবে বোধ হয় আমার মতো দুঃখী আমি আর কাকেও দেখতে পেতাম না। কারণ আমি যাদের নিয়ে ঘর সংসার করি তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে। আমার ভগবতীর বাহন হলো সিংহ আর আমার পুত্র গণেশের মুণ্ডটি হলো হস্তির। কোনদিন যে সিংহ ক্ষুধার জ্বালায় দিগ্‌বিদিক্ শূন্য হয়ে আমার পুত্রের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠিকানা নেই। আমার নিজের গলায় সর্প আর আমার পুত্র কার্তিকের বাহন হলো ময়ূর। এদের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। তা ছাড়া আমার আবার দুই পত্নী ভগবতী এবং গঙ্গা। এদের ঝগড়া তো লেগেই আছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছো আমার পরিবারস্থ কারো মনেই শান্তি নেই। আমি যদি সুখ দুঃখের অতীত না হতাম তবে আমাকেও সর্বদাই অশান্তি ভোগ করতে হতো সংসারী জীবের মতো।

অবশেষে নারদ শিবঠাকুরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন বৈকুণ্ঠে।

এখানে এসে দেখা করলেন নারায়ণের সঙ্গে এবং শিবঠাকুরের সঙ্গে যে কথা হয়েছিলো বললেন।

নারায়ণ সবকিছু শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং বললেন, নারদ, আমারও তো সেই অবস্থা। আমিও যদি নিজে সুখ দুঃখের অতীত না হতাম তবে আমার মতো দুঃখীই বা কে ? আমার পত্নী হলেন কমলা। তিনি সদাই চঞ্চলা। কখন যে তিনি কাকে অনুগৃহীত করবেন তা কে বলতে পারে ? যার পত্নী এইরূপ তার কি মনে সুখ থাকতে পারে ?

শিবজী আর বিষ্ণুর কথা শুনে নারদ ভাবতে লাগলেন যে, শিব, আর বিষ্ণুরই যদি সাংসারিক জীবন এই তবে জাগতিক জীবের সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে ? জীবের শান্তিলাভের উপায় কি ? কি করলে জীব সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে পারে ? অবশেষে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে উত্তরও পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন মায়া, মমত্ববোধই জীবের দুঃখের কারণ। জীব সংসারের সকল জিনিষকেই নিজের বলে ভাবে এবং ঐ সকল জিনিষের অভাব হলেই দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং সেবক ভাবে সংসারে থাকাই হলো দুঃখ থেকে পরিত্রাণ

লাভের একমাত্র উপায়।

তাই তো আনন্দময়ী মা বলছেন :

'সংসারে এসেছো, সংসারেই থাকো। ঈশ্বরে ভক্তি নিয়ে, সেবার ভাবে থাকো। সঙ ছেড়ে সারটুকু নিয়ে থাকো। থাকো জীবন্মুক্ত হয়ে, ঈশ্বরযুক্ত হয়ে।'

আবার বলছেন :

'মিশ্রি মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের হবেই, অর্থাৎ নাম নিতে নিতে মনটা ঐ দিকে যাবেই। বাইরের ভাবগুলিকে সরিয়ে মনটাকে তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়াই তো উদ্দেশ্য।'

'জীবন যাত্রা সকল ভাল। তৎস্মরণ জপধ্যানে।'

*

শ্রীশ্রীহরিবাবা কলকাতায় এসেছেন। মাতৃদর্শনে। মা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দর্শন দিলেন পরম বৈষ্ণব রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হয়ে। বয়স তাঁর ১০৮ বৎসর। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীহরিবাবাকে নিজ গৃহে পেয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাবাবেগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নানাভাবে মায়ের স্তুতি করলেন। শ্রদ্ধা জানালেন হরিবাবাকে।

শ্রীশ্রীহরিবাবা যোগী ও সিদ্ধপুরুষ। পাঞ্জাব তাঁর সাধনক্ষেত্র। পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে তাঁর আশ্রম আছে। সম্প্রতি মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলা ভাষাও শিখেছেন। স্বপ্নাবেশের অবস্থায় গৌরসুন্দর স্বয়ং এসে তাঁর কানে কৃষ্ণনাম শুনিয়ে গেছেন। আনন্দময়ী মা তাঁকে বাবা-বাবা বলে ডাকেন।

ভাবস্থ অবস্থায় হরিবাবা ভক্ত শিষ্য মনোহরকে বলেছিলেন, 'এবারে মহাপ্রভু গুপ্তভাবে এসেছেন। তিনিই 'আনন্দময়ী মা'।'

'আনন্দময়ী মা' শ্রীশ্রীহরিবাবাসহ কলকাতা ও আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে ভক্তসনে লীলা করে চললেন। বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে এলেন আদ্যাপীঠে। রামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই আদ্যাপীঠ। আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন ১৩৩৪ সনে। পর বৎসর তিনি দেহত্যাগ করেন। মন্দির অবশ্য অনেক পরে গড়ে ওঠে। এই পবিত্র কালী মায়ের পীঠস্থানে এসে আনন্দময়ী মা-ও ভাবানন্দে বিভোর হলেন। সেই মহাভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মা বলছেন ঃ

'ছ্যাখো, সকলেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু এ কথা খুব কম লোকেই ভাবে যে 'তিনি হৃদয়ে না জাগলে পূর্ণ শান্তি কিছুতেই পাওয়া যায় না। ধনে শান্তি হয় না, পুত্র-পরিজনেও শান্তি হয় না, প্রতিষ্ঠা লাভেও শান্তি হয় না। কারণ সাংসারিক ভোগমাত্রেই দিনরাত্রির মতো পরিবর্তনশীল, আসতে আসতে চলে যায়। এই কারণে এমন ধনে ধনী হওয়া আবশ্যক যার ক্ষয় নেই। যা পেলে সকল আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিটে যায়। সে ধন একমাত্র ভগবান। যিনি সকলের হৃদয়ে থেকেও অপরিচিত আছেন। সৎ কর্মাদির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার দূর হলে পরম সুন্দরের মোহনরূপ আপনা থেকেই ফুটে ওঠে এবং চিত্তে পূর্ণ শান্তির রাজত্ব আরম্ভ হয়।'

সত্যানুসন্ধানীর বাসনা ভগবান পূর্ণ করেন। যেরূপ চাওয়া হয় সেইরূপেই প্রকাশিত হয়ে তিনি যা করবার করেন। মনের বাসনা জাগ্রত তিনি করেন। পূর্ণও তিনিই করেন। মানুষের কর্তব্য প্রাণময় করে ভগবানকে স্মরণ, জপে ধ্যানে নিত্যকর্মে নিয়মিত মনটা তৎপরিবেশে সুরক্ষিত রাখা। সৎসঙ্গে সৎ পরিবেশে স্থিত থাকার জন্য সৎক্রিয়ায় নিত্য মনকে ব্রতী রাখার চেষ্টা হওয়া। স্বরূপ প্রকাশের যাত্রায় চলা। স্বরূপ প্রকাশের জন্য দ্রুতবেগে রাস্তা খোলার দিক্ নেওয়া। জগতের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ জীবন-যাত্রার দিক্ না হওয়াই। বিশ্বজগতের অন্তর্গত কিরূপ পরিবেশ পাঁতি পাঁতি করে তো দেখা হয়েছে—আর ওদিকে মন রাখার দিক্ না নেওয়াই। 'অসার সংসার আসা যাওয়া বারবার কেউ নহে কার—তবু কি চাওয়া বারবার?' হেসে হেসে মা বললেন।

ভগবানের দিকে যত অগ্রসর হও ততই সমগ্র ক্লেশদায়ক ক্রিয়া শিথিলের দিক্—ইহা মনে রাখা। জগতের ক্রিয়ায় সাময়িক আনন্দ—আর ক্লেশদায়ক দুঃখ পিছনে ছায়ার মতন। নিজেকে পাওয়ার যাত্রী হওয়া।

যেদিন যায় সে তো আর আসে না। অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। দিন থাকতে দীননাথের দিকে। 'বৃদ্ধ বয়সে অলসে অবশে হয় না হরিনাম বলা—কালের কর্ম, কি করা যায় সেই বেলা?'

একান্ত নির্ভর ভাবই শক্তির প্রকাশের সহায়ক। শুভ মতি দিয়ে কর্ম করো, কর্মের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করো। সব কাজেই তাঁকে ধরে থাকা। তাহলে আর কিছুই ছাড়তে হয় না। তোমার কাজগুলোও সুচারু-রূপে সম্পন্ন হবে। লক্ষপতির সন্ধানও সহজ হবে। মা যেমন শিশুকে যত্নের দ্বারা বড় করেন, দেখবে তুমিও তখন বড় হয়ে উঠবে। যখন যে কোনো কাজ করবে কায়মনোবাক্যে সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে, তাহলে কর্মে আসবে পূর্ণতা। সময় হলে শুকনো পাতাগুলি আপনা হতে ঝরে গিয়ে নূতন পাতা দেখা দেবে।

তোমরা বল না 'ভোগ শেষ করা ভাল, ধামা চাপা দেওয়া ভাল নয়'—সারাজীবনেও ভোগ শেষ হবে না। দেখতে দেখতে জীবনই শেষ হবে। ভোগ শেষ করতে গিয়ে ভোগ বুদ্ধিই ধারালো হবে। ভোগের নূতন পথ খুলে যাবে। তাইতো বলা হয়, ভোগে ত্যাগে থাকা ভাল।

জগতের এত সব পেয়ে থুয়ে কি হয়? এতদিন তো দেখলে, এ সবের পরিণাম তো এই। ধন-জন-যৌবন যেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি দারিদ্র্য এসবও তাঁর ভাণ্ডারে। এ সব ভোগ করতেই হবে। এই জায়গায় নিরাময় আরামের স্থান নাই। কেন এ সবের চিন্তা? ধর্মকে বাদ দিয়ে সংসার করলে দুঃখের সাগরে ভাসতে হয়। সংসার করলে ধর্মের সংসার করাই সকলের কর্তব্য।

অভয়ের শরণ লওয়া। সংসারটাই যে ভয়। ভয়ের আশ্রয়ে থাকবে, ভয় হবে? ওখানে নির্ভয়, এই আশা করাই বৃথা। সর্ব দুঃখ হতে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা চাই।

দুনিয়ার স্বভাবই অভাব জাগিয়ে রাখা। দুনিয়ার বস্তু পেয়ে শান্তি কখনও হতে পারে না। এজন্য চাই স্বভাবের জাগরণ। যতক্ষণ দুই ততক্ষণ দুঃখ। দুই হতেই দ্বন্দ্ব দুঃখ। নিজের ঘরে যাবার চেষ্টা করো। পরের ঘরে অপরের সাথে থাকলে দুঃখ দ্বন্দ্ব, মানে দুই নিয়ে অন্ধ।

অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায়? দুশ্চিন্তা হয় কেন জানো? ভগবানকে দূরে রাখলেই দুশ্চিন্তা। দুর্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখার নাম দুর্বুদ্ধি। অথবা তিনি দূরে এই যে বুদ্ধি এটাই দুর্বুদ্ধি।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছো, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছ পালা পশু পাখী কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নূতন গাছ পালা পশু পাখী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি কেবল তাই করলে তবে প্রভেদ রইলো কি? ভগবানের সেবাজ্ঞানে জগতে সবার কেবল সেবা করার

চেষ্টা করে যাওয়া। এইটিই মানব-জীবনের মহাব্রত।

ভগবানেতে মন যত বেশী থাকবে, ততই নিজেকে সুস্থ শান্ত অনুভব করবে। ভগবৎ কথা নিয়ে আলোচনা। ভাবতে হয় তাঁর ভাবনা. কাজ করতে হয় তাঁরই সেবা-বুদ্ধিতে। এই পথই তো স্বাস্থ্যের পথ—শরীরের মনের। অভাব অভিযোগের দিকে মনটাকে রাখবেই না। যখন যেমন তখন তেমন।

মন কর্ম করতে না চাইলেও কর্ম ছেড়ো না। কারণ মন তো আর চুপ করে থাকবে না। তোমাকে আবার অন্য কর্মের পিছনে দৌড়তে হবে। কর্মকে ছেড়ে যেতে দাও। যদি নামে তেমনভাবে মন ডুবে যায়, তবে দেখবে তোমার কর্ম পড়ে আছে, আর তুমি কোথায় ডুবে গিয়েছো। এখানে মন কিন্তু কর্ম ছাড়েনি, কর্ম তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে। কাজেই কর্ম করবে, ভগবানের সেবা হিসেবে করবে। ঘুমোবার সময়ও মনে করবে যে ভগবানের চরণে মাথা রেখে শুয়ে আছ। এইভাবে দিবারাত্র তাঁকে নিয়ে থাকবার চেষ্টা করবে।

পূর্ণঘট উপুড় করে জল ঢালার মতো নিজের হৃদয় মনের সকল ভাব উজাড় করে নমস্তকে ভগবানকে গুরুকে সমর্পণ করে দেওয়া।'

'ঘর থেকে বের হয়ে এক রাস্তায় চলতে হয় তবেই রাস্তা সকল জানা হয়।'

গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে ভেদজ্ঞান থাকে না। তবে কথা, সাধনার পথে শ্রেয় গ্রাহ্য ও প্রেয় ত্যজ্য। তাই সাধনার অনুকূল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সাধনার পথে প্রতিকূল সঙ্গ ভাল নয়। যারা জাতিভেদ মানে তাদের জন্য সাধনার পথ মানা উচিত। সাধকের মধ্যে তাই অনেক সময় ছুঁৎমার্গ, শুদ্ধাচার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নইলে সাধনে বিঘ্ন হয়। কিন্তু পূর্ণ অখণ্ডেতে প্রতিষ্ঠিত হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তখন জাতি মানলেও আসে যায় না। না মানলেও আসে যায় না। ভগবান যেমন সর্বরূপে আছেন তেমন ব্রহ্মজ্ঞানী যে কোনরূপ ব্যবহার করতে পারেন। তার ব্যবহারের সাথে সাধারণ সাধকের ব্যবহারের তুলনা হয় না।

যে লাইনে যে কাজ করে তার সেই লাইনেই গতিলাভ হয়। স্বাভাবিক কাজের দ্বারাই সে নিত্যযুক্ত হয়। তাঁর সাথে যুক্ত হলে সে যোগী হয়। সেই

পরম স্পর্শ লাভ করবার জন্য সাধনা হরিনাম করলে বা শুনলে বা জপ করলে শ্বাসের গতি নিয়মিত হয়। প্রাণায়াম হয়। আরাম হয়। স্বাভাবিক হয়। বৈষম্য থাকে না। রোগ থাকে না। যে গতিতে প্রাকৃত রাজ্যের কাজ হয় তাতে ব্যারাম। রোগ। চিন্তা হয়। তাতে আরাম নেই। সাম্য নেই। জগতের গতিতে থাকলে জগতের সৃষ্টি হয়। জগৎ বোধ হয়। জগৎ বুদ্ধি হয়। এটা হলো অভাবের গতি। ভগবৎপ্রাপ্তির গতি নয়। বাসনাময় জীবনে যে স্ব বাস করে না, তার মুক্তি হয় না। কামনা মানে return ticket-এর বন্দোবস্ত। আবার ফিরে আসা দুঃখময় দুনিয়ায়। বিষয় বাসনা—যা বিষ হয়, যাতে মৃত্যু হয়। এতে যে শ্বাসের গতি হয় তাতে আবার গমন হয়, ফিরে আসতে হয়। যার এটা পছন্দ নয়, সেটা দুর্বুদ্ধি অর্থাৎ দূর—বুদ্ধি ছাড়ে। আত্মাকে নিকটেই পায়। সে সৌভাগ্যশালী। সে চায় প্রাণের গতি বদলাতে। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধনা করলে শ্বাসের গতি আপনি বদলে যায়। কৃষ্ণনাম হোক, কালী নাম হোক, তাঁর যে কোনো নাম হোক না কেন তাতেই শ্বাসের গতি বদলাবে। শ্বাসের গতি বদলালে আপনি মন্ত্র-চৈতন্য হবে। একবার প্রাণগোপালবাবু এই শরীরের একটা ফটো নিয়ে বালানন্দ-ব্রহ্মচারীজীকে দেখান। তারপর এই শরীরটাকে দেওঘরে নিয়ে যায়। সেখানে শরীরটা পড়ে থাকতো যেখানে সেখানে। দিদি ওরা দেখল এই শরীরে নিত্যমন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠত। বসার সময়, কথা বলার সময় 'শিবোহহম্' মন্ত্র আপনা থেকে স্পষ্ট হতো। অনেকদিন গোপনে ছিল। পরে ধরা পড়লো। এই শরীরের এই ঘটনাটা বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য এই যে, শরীর শুদ্ধ হলে গৃহস্থাশ্রমে থেকেও প্রাণের গতির সাথে মনের গতি মিললে প্রাণায়ামের কাজ অনুভূতির কাজ আপনি হয়। চেষ্টা করে সাধনা করতে হয় না। প্রাণের কাজের ভিতর দিয়ে জ্যোতির্মন্ত্র সব প্রকট হয়। যার যেমন মনের গতি, তার তেমন সংসার ভোগ। যার যেমন সংসার তার প্রাণের স্পন্দন সেইমত। সকলের প্রাণায়াম ভিন্ন ভিন্ন। যে সৌভাগ্যবান ভাল সংস্কারবান্ সে আর return ticket চায় না। সে শ্বাসের গতি বদলাবার সাধন-ধারা অবলম্বন করে। যে নাম ভাল লাগে তাই নিয়ে সাধনা শুরু করতে হয়। গুরু পন্থায় চললে প্রাণের গতি বদলায়। গতি বদলাবার সময় টায়ারে (tube) পাম্প করবার মতো মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ কখনো আপনি সুষুম্নার মধ্যে কাজ হতে থাকে। যতক্ষণ আপনি না হয় ততক্ষণ চেষ্টা করা। যে যে লাইনে নেবে সে সেই লাইনে কথাটা বুঝে নেবে। ধ্যান করবার ধরনও সব স্বয়ং প্রকাশ হতে পারে। যতক্ষণ তা না হয়

ততক্ষণ বিক্ষেপ ছটফট্ হচ্ছে না পারছি না ভাব। ঠিক রাস্তার ধারা সময়ে আপনি ধরা যায়। যেমন এক জায়গায় জল ঢাললে ঠিক রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরে নেমে যাবে। মিলাবে। যতক্ষণ জলে জল না মেলে ততক্ষণ ধারা ঢেলে যেতে হবে। মাঝে শুকিয়ে যায় ক্ষতি নেই। কখন যে বন্যা আসবে কেউ জানে না। স্বভাবের ছোঁয়া একসময় লাগবেই। মিলনের কথা রহস্যময়। তার চার টুকরায় গতি। এক টুকরা অব্যক্ত তিন টুকরা ব্যক্ত। প্রাণায়ামের ক্রিয়ায় ঐ ধ্যানের দ্বারা তিন গতিকে এক অব্যক্ত গতিতে মেলাতে হবে। স্বাভাবিক ক্রিয়া জপের দ্বারা, নামের দ্বারা প্রাণায়ামের দ্বারা সেই গতি যোগ করতে হবে। নিষ্কাম সেবা তৎবুদ্ধিতে করতে পারলেও তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। যতক্ষণ ঐ স্বাভাবিক প্রকাশ না হয় ততক্ষণ নিজেকে খাটতে হবে। এক ছিলে। বহুর সংসার করে ফেললে। তোমার মধ্যেই তারা ছিল। এই পিণ্ডে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডেও তাই আছে। তাই নিজেকে খাটতে হবে নিজেকে পাবার জন্য। জনের মধ্যে জনার্দ্দন আছে। ভগবানকে পাওয়া তো নিজেকেই পাওয়া। তাই চলার পথটা ধরে থাকতে হবে। সব রাগই ঠিক—খোলা আছে মুক্তির জন্য। তিনি মুক্ত কিনা, তাঁর রাস্তাও মুক্ত। এক্ষেত্রেই সব। সর্বতেই এক।'

মা বলছেন সাধন তত্ত্ব কথা সহজ করে সরল ভাষায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে।

মা আবার বলছেন :

'আত্মদর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন মানে কি ? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন—এই তিন যেখানে সেখানে ব্রাহ্মীস্থিতি হয়। সেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নাই—তাই আত্মস্থিতি। আর যদি রূপ দৃষ্টিতে দেখো সর্বত্র। যেমন বলে না—'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'। কৃষ্ণ ছাড়া যা কিছু দেখো তা আসল দর্শন নয়। সর্বাঙ্গীন দর্শন ইষ্টের প্রকাশ।'

'জীবনটা একেবারে আমূল পরিবর্তন করে ফেলা। পরম পথের দিকে তেজস্বী সাধকরূপে এগিয়ে চলা। তিনি সর্বক্ষণ সাথে সহায়করূপে মনে রাখা।'

যাঁর সেবায় ব্রতী তিনি স্বয়ংই রক্ষক। মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে যে বলতে পারবে, 'মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না,'—তবে সত্যসত্যই মা নিজের রূপে তাকে দেখা দেবেন। তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তাকে তুলে নেবেন। তাহলে আর তোমার কিছুই করতে হবে না। তিনি তোমার সকল ভার নেবেন।

সব তাঁর, সব তিনি। তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে চেষ্টা করো। তাঁর নাম, তাঁর চিন্তা শুধু তাঁর স্মরণ, সংসারের কিছুর জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে শুধু নিজে তাঁর হয়ে যাবার চেষ্টা! যেখানে কোনো অভাব থাকে না, দুঃখ থাকে না, সব চাওয়া পরিপূর্ণ, সেখানে আরাম, আরাম। নির্ভরতা যে সবচেয়ে আনন্দদায়ক। তাঁরই আশ্রয় গ্রহণীয়। তিনি সর্বময় কিনা—সবখানেই তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকা। সব ডাক তাঁর কাছে পৌঁছায়।

যতই কষ্ট হোক না—ভাববার কি আছে? তুমি শুধু ডেকে যাও। মা তো আর সন্তানকে আছড়ে মারবেন না। ভয় কি? কাঁদার মতন নাছোড়বান্দা ভাবে কাঁদলে পাবে। মা তখন কোলে করবেনই।

সকলের পথ তো এক নয়। সংসার করো, তাঁর সংসার করো। সংসারের কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়েই পরমপথের দিকে অগ্রসর হওয়া। সবই তো সাধনা। ভোগের সাধনা বা ত্যাগের সাধনা। আর এ সংসার লীলা? সংসারলীলাও তো তাঁরই।'

আরও বিমুগ্ধ হই।

তাঁরই লীলা এই নাটক। বিশ্বপ্রপঞ্চের নট নটী হয়ে এ মায়াময় রঙ্গভূমিতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কারও খেলার হাতে নিস্তার নেই। যে কয়দিন থাকতে হবে, কোনো না কোনো খেলা খেলতেই হবে। খেলাও যেদিন ফুরাবে, আমার আমিত্বও সেদিন মিটবে। সংসারের মূল, অজ্ঞান বা অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মবিস্মৃতি। খেলার মূলও অজ্ঞান বা আত্মবিস্মৃতি। অজ্ঞান বা অবিদ্যাশক্তির মূল ও সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের আনন্দময়ী ইচ্ছাশক্তি। মূলে সেই এক ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিকে বুঝলে, সেই একমাত্র মোহিনীর মহাকাল মনোমোহিনীর মহাখেলাই অনুভূত হয়। অবিদ্যার কুহকে পড়ে মানুষ সেই পূর্ণজ্ঞানের অনধিকারী। তাইতো মানুষের আত্মতত্ত্ব বিস্মৃতি যতদিন অনুভূত না হয়, ততদিন সে, এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের মিথ্যা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসারের এই অনিত্য খেলাকেই সত্য বলে মনে করে। ভগবৎ প্রসাদেই, ভগবৎ কৃপাতেই মানুষের সেই আত্মবিস্মৃতির অনুভূতি জাগরিত হয়। যে মানুষটি সেই অনুভূতি লাভ

করে, তারই জন্মের মতো, জন্মের খেলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়! এ যে ঘুম ভাঙ্গার, কুল ভাঙ্গার অনুভূতি। ভগবানের হাতছানি। আহ্বান। তখন সংসারের এই বালির বাঁধে প্রেমের সেই মহাস্রোত কিছুতেই আর অবরুদ্ধ রাখতে পারে না। সবকিছু একাকার হয়ে যায়। সাধকের সিদ্ধিসাধনার পূর্ণাহুতি ক্ষেত্রে শাস্ত্র যাকে বলেছে আত্ম-সমর্পণ। মা-ও বারে বারে ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'শ্রেষ্ঠ দান—ভগবানকে আত্মসমর্পণ।' নির্ভরতাই এ পথের অনুকূল।

'প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সুখ দুঃখ। প্রকাশ হবার জন্যই তাঁর কৃপা, তাঁর নামরূপ চিন্তা। যদি একমুহূর্ত অন্য চিন্তা—বিষয় চিন্তা হয়, তবে তো মৃত্যু চিন্তা! বিষয় চিন্তায় যে শক্তিক্ষয়, ভগবচ্চিন্তায় শক্তিবৃদ্ধি। তাঁর কৃপা স্মরণ। নাম স্মরণ রূপ স্মরণ—অনুক্ষণ তাঁর স্মরণই অমৃতত্ত্ব।

জেনে রেখো নিজে নিজেই মনটাকে শক্ত করতেই হবে। কেবল মনে রাখা —'পারছি না, পারব না—, এদিকেই যাবো না। আসবেই এসব বাধা, আমি পারবই। তিনি যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকবো। যাঁর সৃষ্টি, যাঁর দেহ তাঁকেই তা সমর্পণ করে—ব্যাস্, শান্তভাবে থেকে, প্রায় সময়ে শবাসনে শ্বাসে চালিত মন্ত্রটি ভাবনা করে, 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি'—এইভাবে লেগে থাকা। অর্থাৎ শ্রেয় গ্রহণ প্রেয় ত্যাগ—এইভাবে চলতে থাকা। অনুকূল সাহায্য আসবেই.

শুষ্কতা অবসাদ আসলেও ওষুধ গেলার মতো গিলবি। এইরূপে সুসময়ে মনের মালার সন্ধান পাবি। তখন দেখবি যে মহাসমুদ্রের আওয়াজের মতো অবিশ্রান্ত সেই মালা একমাত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরের গুণগান করছে। এবং জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্রই সেই ধ্বনিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেই বলে নামময় হওয়া।'

'তোমরা বসে বসে কেবল অন্ধকারে হাতড়াচ্ছো। আলোর সন্ধান করো। আলো আলো মনের কুঠুরিতে। কেরোসিনের ল্যাম্পে বা বিদ্যুতের বাতিতে কতদিন আর আলো করে রাখতে পারবে? তেল ফুরিয়ে গেলে বা সুইচ খারাপ হয়ে গেলে বাতি নিভে যাবেই যাবে। এমন আলো নিয়ে সংসারটিকে আলোকিত করো যেটি আর কখনও নিভবে না। সে আলো কি জানো? ভগবৎ নিষ্ঠা। ভগবৎপ্রেম।'

'লক্ষ্য যখন প্রাণময় হতে থাকবে, যার যা আবশ্যক—"আপ্ সে আপ্ হো যায়েগা।" যে যে পথটি ধরে আছো সেই পথেই শুদ্ধভাব পরিপুষ্টি লাভের জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ কর।' বলছেন, আনন্দময়ী মা ভক্তদের।

শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন :

'শক্তি দাও, শক্তি দাও বলে চেঁচালে শক্তি লাভ হয় না। হাসপাতালে রোগীদের আনন্দ, আরাম দেবার জন্য কত রকম সুব্যবস্থা আছে! কিন্তু তা হলেও ভিতরের রোগের জ্বালা বাইরের ব্যবস্থায় কি কখনো দূর হতে পারে? ভিতরের ব্যবস্থা চাই। এবং ইহা নিজের চেষ্টার উপরই অনেকটা নির্ভর করে। শাস্ত্র ও সাধুবাক্য মনের মধ্যে ধারণ করে যাও। শক্তি সময় মতন তোমার ভিতরে দেখা যাবেই। কাজেই যাদের কর্তব্য বুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্প নেই, তারাই অন্যের নিকট খুঁজে বেড়ায় শক্তি। সংসারের সব কাজ যদি অহং-এর বলে পারো চালাতে, তাহলে ভগবৎ চিন্তার বেলায় কি কেবল শক্তি চাই? ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে সৎকার্যে মনোযোগ করো, শক্তি আপনি হবে উদয়। আর যদি বলো কাজ তো করতে পারি না, তবে কেন পারো না সে অন্তরায়গুলি অনুসন্ধান করে দৃঢ় মনে উচ্ছেদ করো। নতুবা তোমার ভিতর তুমি কেবল ভূতের বোঝা বাড়াবে, আর বাইরের শক্তি এসে তোমাকে গাধা-বোটের মতো টেনে নিয়ে যাবে, এও কি কখন সম্ভব? আঁকা বাঁকা পথে যেমন গাড়ীর চাকা ঘুরাতে ফেরাতে ঘোড়া বা ইঞ্জিনের উপর জোর দিতে হয়. সেইরকম বিষয়াসক্ত মনকেও সঙ্কল্পের দ্বারা মুচড়ে, ধর্ম-কাজে লাগাতে হয়।

সর্বদা জলের স্রোতের মতো একমুখী ও তরল হয়ে থাকতে পারলে কোনো ময়লা তোমার ভিতর আটকাবে না। পরের ময়লাও তোমার সংসর্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগুন দাউ দাউ করে শিখা নিয়ে অনেক উপরে ওঠে বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, যেখানে গিয়ে শিখা আপনার স্বরূপ বা অহংকার বজায় রাখতে না পেরে পরিণত হয় বাষ্পাকারে। কিন্তু জলের অবিরাম গতি এমন একটানা থাকে যে নদ নদীগুলি কত গাছ পাথর ঠেলে হাজার হাজার ক্রোশ অবিরোধে অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যায়। পরমতত্ত্বের সন্ধান বা

সম্মিলন লাভ করতে চাইলে নদীর মতো তরল হয়ে এক লক্ষ্যে চলতে থাকো।

বিশ্বপ্রকৃতি নিজে অস্থিরা হলেও কখনো কারো চাঞ্চল্যে সহায়তা করেন না। সীমার মধ্যে একটি ভাব নিয়ে চলতে চলতে যখন লক্ষ্য স্থির হয় তখন সীমার বন্ধন খুলে যায় এবং একই বহু এবং বহুই এক হয়ে দাঁড়ায়। অসীমে পৌঁছাবার শক্তিলাভের জন্য প্রথমে সীমাবদ্ধ হয়ে চলা উচিত। দেহাধ্যাস যতক্ষণ প্রবল, বিধিনিষেধের গণ্ডীতে নিজেকে ততক্ষণ বেঁধে রাখা আবশ্যক। এর জন্য চাই ধৈর্য, চাই সহিষ্ণুতা।'

'এই সহিষ্ণুতাই সংসারী লোকের ব্রত হওয়া দরকার যে!'

কঠিন তত্ত্বকথা সহজ করে শ্রীশ্রীমা বলছেন গৃহস্থ ভক্তদের।

মা আবার বলছেন :

'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানব জন্ম সব জন্মের সেরা। মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে যা জগতের আর কোথাও নেই। ডুবুরির মতন নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি সেই সব রত্ন উদ্ধারের যত্ন করো। অন্তরের জলদগ্নি প্রকাশ করে জীবন ও জগৎকে আলোকিত করো। ইহাই পরম পুরুষার্থ। ক্রমশঃ বাইরের সঙ্গে দেখা শুনা বলা কওয়া কমিয়ে দাও। তা না হলে তাঁকে পাবার পথে ব্যাঘাত হবে যে। হৃদয় আসনে তাঁকে বসিয়ে, চোখ কান যদি বাইরে ফেলে রাখো, তাঁর সত্তা কেমন করে উপলব্ধি করবে, মানস উপাসনাই তো উপাসনা।

বাইরের পূজা ইহার অংশ মাত্র। রুগ্ন শিশুকে পালন করতে গিয়ে জননী যেরূপ বুকে করে থাকে, সাধনার প্রথম অবস্থায় দেবতাকে সেইরকম রুগ্ন শিশুর মতন বুকে করে বসে থাকতে হয়। উপাসনার সময় বাইরের কর্মভাবনা পরিত্যাগ করে প্রাণ স্থির করতে না পারলে দেবতাকে প্রাণময়রূপে পাওয়া যায় না। টেলিফোনে কথা শুনবার সময় যেমন সব মন সঙ্কুচিত করে শ্রবণেন্দ্রিয়ে জোর রাখো ভগবৎ চিন্তায়ও সেইরকম সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে চিত্তশক্তির সংবেগ বৃদ্ধি করবে।

জীবন যাত্রার সকল চিন্তার ভিতর তাঁকে সর্বাগ্রে রেখে চলতে চলতে তাঁর প্রতি লক্ষ্য আসে। এরূপে যদি তাঁকে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থানে বসানো যেতে পারে, তিনি সকল ভার নিয়ে সেবককে কেবল তাঁর চিন্তার জন্য মুক্ত করে রাখেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর ভিতর, ভোগী—সংসারীর মধ্যে, এমন কি পশুপক্ষীতেও এরূপ কত উদাহরণ দেখবে। উদ্ভিদেরা পর্যন্ত তার এই কৃপার অধিকারী। ঘুড়ি

উড়িয়ে দিয়ে দড়ি ধরে তাঁর শরণে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে বসে থাকো। বাতাস তাকে আপনার গতিতেই চালিয়ে নেবে।

ভগবানের এক নাম চিন্তামণি।

তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা থাকে না এবং তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। অনর্থকামীর পুত্র-চিন্তা বা পুত্রকামীর পুত্র-চিন্তার মতো তাঁর চিন্তাও খুব তীব্র হওয়া দরকার যে।'

এবারে আনন্দময়ী মা মৃদু হেসে বললেন :

'তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকলে হবে কেন? তাঁর খুব কাছে যেতে হবে। ভালবাসতে হবে যে। তিনি যে প্রাণের ঠাকুর! প্রেমময় ভগবান। ভগবানকে ভালবাসতে পারলেই সব ভালবাসার সফলতা।'

'যার যতটা ভাব তার ততটা লাভ তো!'

'যতটা উন্নত হবে ততটা তার ইষ্টমূর্তিতে বিকাশ প্রকাশ পাবে, সেই সেই অনুসারে। এক রূপেতে আলাদা থাকবে না, ঠাকুর ধরা দেবে অনন্ত রূপেতে। নিজ সংস্কারবলে যখন প্রকাশ সর্ব হবে, আবার সর্বেতে যখন নিজের সংস্কার ধরা পড়বে। সেও একটি দিকের কথা। নিজেকেও আলাদা বাদ দিতে পারছ না।

এই যে নানারূপ পশু পাখী মানুষ ইত্যাদি সকল, এই সকলগুলি কি? আকার প্রকার প্রকাশটা কি? রূপগুলি যে বদলিয়ে যায় সেইগুলিই বা কি? আস্তে আস্তে যেহেতু তার ঠাকুর আর সেইভাবে বিভোর, তৎভাবে থাকে কি না সর্বরূপেতে আমার ঠাকুর প্রকাশিত। বালুকণাও বাদ যায় না। জলে স্থলে মানুষে উদ্ভিদে পশুপক্ষীতে মাত্র সেই ঠাকুর বনেছে। এক এক জনের এদিকটাও খুলে যায়। সকলের একরকম হয়ে প্রকাশ হয় না। অনন্ত কিনা, কাজেই কার যে কোনদিক দিয়ে গতি ধরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হবে সেটা সাধারণের

অগোচর। তিনি রূপে অনন্ত কি না, অন-অন্ত কি না, কোনো সংখ্যা দিতে পারে না। অতএব অনন্তরূপ তাঁর, যত ইতিরূপ সৃষ্টি হচ্ছে, লয় হচ্ছে আমার সেই ভগবানের। এই এই ভাবেতে বিশেষভাবে যত বিস্তার হবে ততই অসংখ্য রূপেতে স্থিতি আসবে। অসংখ্যেতে নানা আকার প্রকার নানারূপের প্রকাশে অন্তহীন সংখ্যাহীন এবং অন্ত ও সংখ্যা। সেই স্থিতিতে সাধকের যখন প্রবেশ হয় তখন রূপের যে পরিবর্তন, ভাবের যে পরিবর্তন এটার মধ্যে দৃষ্টি পড়ে। বিচার জাগরণ হয়, অর্থাৎ বিচার রূপেতে যে তিনি তার প্রকাশ হয়। স্বকৌশল বলে যে কথাটা আছে না—সকলের যে চিন্তার ধারা জগৎমুখী—সেই চিন্তা ধারাটা ফিরে স্বকৌশলে অর্থাৎ সেই স্বয়ং কৌশল রূপেতে বলেছেন তার প্রকাশ হয় তখনই! আচ্ছা এই যে পরিবর্তনশীল জগৎ নিত্যই বদলে যাচ্ছে, নাই হয়ে যাচ্ছে, সেই নাই রূপেতে কে? নাইটা যেমন আছে আবার যখন যেরূপের প্রকাশটা সেটা না হলে পাবে কি করে?

অন্তহীন রাজ্য যেখানে তুমি নাই বলে দেখতে পাচ্ছ, নাই রূপটাও সত্য, তাঁরই এক রূপ! যেখানে চিন্ময় রাজ্য—তখন যেরূপ নিত্য রয়েছে। কাজেই এক জায়গায় নাইও আছেও যুগপৎ নাইও না আছেও না, আরও চল।

তাহলে আমার ঠাকুর জল আর বরফ যেমন আছে। আমার ঠাকুরের কোনো রূপ নাই। গুণ নাই। কোনো প্রকাশের প্রশ্ন নাই। সেই স্থিতিতে যখন নিজেকে পাওয়া মানে ভগবানই তো আপন, এ আমার নিজস্ব নিজের। আর আত্মাই তো একমাত্র। তখন এর মধ্যে সময়োপযোগী ঋষিদের যেমন মন্ত্র দর্শন হতো তার ভিতর স্থানোপযোগী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের যেমন প্রকাশ, মন্ত্রের স্ফুরণ এবং বেদের পূর্ণাঙ্গীন যেখানে, যেটা প্রকাশ সেটা স্থানে স্থানে যার যার কর্ম ভাব অনুসারে প্রকাশ হতে বাধ্য হয়। যখন রূপ অরূপের আকার সাধকের কাছে প্রকাশ হলো, সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তো তাতে ভাবের যে রূপ, শব্দ, ব্রহ্মের যে যোগ—নানা জাতীয় ভাষা, অন্তহীন ভাষা, শব্দ ব্রহ্মরূপেতেও। অনন্ত শব্দের আকার প্রকার প্রকাশের দিকগুলি তার কাছে মূর্ত হয়ে প্রকাশ হওয়া তো।—সমস্ত আকার সাদৃশ্য হয়ে প্রকাশ যেখানে। হ্যাঁ, আকার শূন্য—আকার যে শূন্য এইরূপ—জগৎ শূন্য রূপ প্রকাশ হয়ে মহাশূন্যে যায়। কারণ এই যে জগতের মধ্যে শূন্য দেখতে পাচ্ছ, এটা প্রাকৃতিক রূপ তো, কাজেই এই শূন্যটাও একটা রূপই। এই শূন্য থেকে মহাশূন্যে যেতে হবে।

বোধ আসবে। যে বোধ তোমার জগৎ বোধে দেহ মন প্লাবিত করে এতো-

কাল তাতে ভাসিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সেই বোধগুলি বিশ্ববোধে পরিণত—বোধ-দেবরূপে প্রকাশ হলেন। বোধ স্বরূপ - সর্ববোধ 'স্বরূপ' যেখানে এসে গেল, স্বরূপেতে কি হলেন, ভাব। রূপ অরূপের বোধ অসংখ্য রূপেতে যেখানে প্রকাশ, যখন সমগ্র নির্মূল। আকার প্রকার প্রকাশ রূপের স্থানচ্যুত হয়ে অরূপের স্থিতিতে গেলেন, তখন কি বলবে?—পরমাত্মাই তো। জীবাত্মা যেখানে পর পর সেই সমগ্র বন্ধনরূপে সেই আবরণ মুক্ত কিনা—পরমাত্মা স্বরূপ। যেখানে স্বরূপ স্থিত।

আর সত্যিকথা তিনি ভেদ রূপেও, অভেদ রূপেও। এদিক দিয়েও জগৎ দৃষ্টিতে দেখো না, ভেদ তো মানছই। নিজেকে পাবার জন্য যেখানে চেষ্টা করছ, ভেদ দৃষ্টি তো বটেই। নিজে আলাদা করে মানছ জগৎ দৃষ্টিতে। হ্যাঁ, জগৎ তো নাশের দিক, সত্যি কথা– স্ব-না, সে না। নিত্য থাকছে না। এই রূপটাই বা কে?—ভাব। আচ্ছা, যায় কি? আসে কি?—গতি দেখো না, সমুদ্রের দিকে স্বয়ং স্ব মুদ্রারূপে। এই যে তরঙ্গ, জলেরই তো ঢেউ। জলেতেই তো লয়। আর জলই তো ঢেউতে। তারই সব অঙ্গ তো ঐ জলে তরঙ্গ। জল—বরফ, ঢেউ হবারও মূলে কি?—এটাও তো একটা স্থানের কথা,—ভেবে দেখো। জগৎ দৃষ্টিতেও দেখলে তো। আসলে কি পেলে দেখো। যেখানে তুমি আকার রূপেতে পেলে, নিরাকার রূপে পেলে। আবার তাকেই এই চিন্তায় ধরা যায় না, সেটাও তুমি পাবেই।'

আরও বিশদ ভাবে বলা যাক।

অনেকে ভ্রমবশতঃ মনে করে দেব দেবীর মধ্যে তারতম্য আছে। যতদিন ভ্রম না কাটে ততদিন আপন আপন প্রাক্তন সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে রুচিগত পার্থক্যবশতঃ এই ভেদ-জ্ঞান বর্তমান থাকে। ইহা জীবের ভেদ-ভাবনার ফল। কিন্তু বস্তুতঃ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সর্বত্রই একেকে দেখাই অভ্যাস করা উচিত। সুতরাং উপাস্য বা ইষ্টগত কল্পিত উৎকর্ষের উপর নিজের সাধনার উন্নতি নির্ভর করে না। উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তুলনামূলক বিচার না করলেই হয়। যার ইষ্ট যে মূর্তিই হোক না কেন তার ভাব ও সাধনাগত উৎকর্ষের পরিমাণ ঐ মূর্তির মধ্যেই ওঠে ফুটে। সময়ে সময়ে এমন একটা অবস্থার উদয় হয় যখন ঐ এক মূর্তিতেই ভগবানের বিশ্বরূপের হয় আবির্ভাব। ইহা মূর্তির উৎকর্ষবশতঃ নয়। সাধকের ভাবনার উৎকর্ষবশতঃ।

তাইতো মা বলছেন:

'জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি নাশ হলে একত্ব বোধ হয়। তার আগে আলাদা বোধ। যা গতি তাই জগৎ। যে বন্ধনের মধ্যে আছে সেই জীব। জীব জগতে যেমন ভাব তেমন লাভ। ভগবানের বিধান কেমন সুন্দর! বিভিন্নরূপে যে তাঁরই লীলা।'

'সাধনার ক্ষেত্রে প্রাপ্তিই অবলম্বন। সাধকের সর্বদা স্থিতি-লক্ষ্যে গতি থাকে, তাই চলবার সময় পথের কোনও খেয়াল আর থাকে না। লক্ষ্যে একবার যদি পৌঁছতে পারল তখন সে পথের কথা বলতে পারে। তখন এক আলোতে সব কিছু উদ্ভাসিত হয়ে যায়। যেমন প্রদীপ জ্বাললে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি একটি করে সব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এমনটাই আর কি।'

মা বলছেন ভক্তপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজকে। দর্শনশাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বকথা সরল ভাষায়।

আবার বলছেন নির্বাণ বুদ্ধত্ব সম্বন্ধে।

'যেখানে বুদ্ধত্ব বলছ সেখানে তো নির্বাণ লাভের পরও করুণা করা চলে। যেমন আগুন থেকে যতই তাপ নাও না কেন তার দাহিকা শক্তি কিন্তু তাতে কম হয় না। ভগবান—যাকে তোমরা পূর্ণ বলে মানো সেখানে তো কিছুই ক্ষুণ্ণ হবার নেই। নিজেই নিজের অধীন—স্বাধীন।'

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করছেন, একটা হচ্ছে করুণা করা আর একটা স্বভাবসিদ্ধ করুণা। যেমন সূর্যের প্রকাশ আর ঐ সূর্য থেকে কিরণ ধারার প্রবাহ। এই দুটির মধ্যে কি কোনও প্রভেদ আছে না দুই-ই এক?

প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে মা বললেন, 'দুই-ই এক। হওয়া আর করা একই স্বরূপতঃ। আর স্বরূপ থেকে পৃথক মানলে সেখানে পৃথকই। স্বরূপতঃ যিনি করছেন তিনিই হচ্ছেন। স্বরূপ থেকে পৃথক বললেই সেখানে ইচ্ছাশক্তি। মহাশক্তি আর ইচ্ছাশক্তি। জগৎজীবের পক্ষে যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা করা হয় তাই দিয়েই মূলটাকে ধরা। বাবা, মূল ধরা হওয়া আর করা একই কিন্তু।

দুই ভেবে সকলে কর্ম করে। কিন্তু দ্বিতীয় সেখানে কে? ঐ প্রকাশের জন্যই স্বক্রিয়া।'

কবিরাজ মহাশয় বললেন, এমন কোনও স্থিতি আছে যেখানে প্রকাশের কোনও শব্দ নেই।

শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন, 'এটা তো হতেই হবে। শব্দ অশব্দের কথাই নেই। ভাবা মানলে তবে শব্দ একদিকের কথা। বাবা, চলতে চলতে যাত্রী মিলে যায়। আবার কখনও যাত্রী পাওয়াও যায় না। তবে লক্ষ্য ঠিক থাকলে ধোঁকা খাওয়া আর হয় না। এই জন্যই বলা হয় গ্রন্থরূপে ও পথরূপে একমাত্র তিনিই।'

মা আবার বলছেন:

'তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না ইহা তো হইতেই পারে না। রাস্তা লম্বা কি ছোট এই প্রশ্ন মনে স্থান দিতে নাই। আমাকে প্রাপ্ত করিতেই হইবে এই ভাবনা রাখা। তোমার পূর্ণ শক্তি তুমি লাগাও তবে তো তুমি পাইবে। কি সুন্দর! ধরিলেই সব আসিয়া যায়।'

'আসা যাওয়া নাই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা যাওয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে হয়। কোথায় আসা? কোথায় যাওয়া? যাঁহার আশ্রয় নিলে মুক্তি তিনিই সর্বত্র স্বয়ং আছেন।'

'ভগবানের রাজ্যের খেলা কি সুন্দর! আত্মা—এক আত্মাই তো। তবুও তুমি, আমার, তোমার এই সব।'

'আসলে তো একটা বস্তুই। পথ লক্ষ্য যাই-ই বলো নিজ ভিন্ন তো আর কিছুই না।'

প্রশ্ন হচ্ছে, আমি ও ঈশ্বর এক কি করে হবে? আমি ক্ষর পুরুষভাবে আছি। মুক্ত হলে অক্ষর পুরুষ হব। দুটোই তো পরমাত্মার মধ্যে?

মা আরো সহজ করে বলছেন:

'যেখানে অদ্বৈত প্রকাশ হবে, সেখানে দ্বৈতও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। অক্ষর পুরুষ হলে ক্ষর পুরুষের জ্ঞানও পূর্ণ হবে। অ-লোচন (জ্ঞানচক্ষু নেই) যতক্ষণ ততক্ষণই আলোচনা। পরমাত্মাই একদৃষ্টিতে ক্ষরিত হয়েছেন, জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। হচ্ছেন। হবেন। আবার অন্তদৃষ্টিতে তিনি সদা অক্ষর। কখনও জগৎ হননি হবেন না। আসলে হওয়া না হওয়ার প্রশ্নই সেখানে নেই।'

'জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলে এক হন। ঘটিতে যে জল আছে তা সমুদ্রে

মিশে গেলেও তার জলত্ব নষ্ট হয় না। শুধু ঘটির জল না বলে তখন সমুদ্রের জল বলতে হয়। সেই রকম আর কি। অক্ষর ব্রহ্মে ভেদ নাই। আবার ভগবান নামরূপেও আছেন। বীজ ও গাছ যে দৃষ্টিতে এক মন্ত্র ও ইষ্ট সেই অর্থে এক। বীজের মধ্যেই গাছ। হৃদয় জমিতে মন্ত্র স্থাপন করলে নামী প্রকাশিত হন। যেমন বীজ তুলে দেখতে বা দেখাতে নেই। তেমন বীজমন্ত্র লোককে বলতে নেই। তাতে শক্তি নষ্ট হয়। না বললে হৃদয়ে পোষণ করলে মন্ত্রের বা নামের তত্ত্ব প্রকাশ হবে। তখন অক্ষররূপী ভগবানকে পাওয়া যায়। অনুকূল ক্রিয়াদির দ্বারা নামকে বা বীজমন্ত্রকে বেড়া দিতে হয় এবং হৃদয়জমিতে গুপ্ত রেখে প্রতিদিন জপ করে যেতে হয়। তাহলে শেষে সমগ্র আকারে তিনি প্রকাশিত হন।'

—যদি আমরা সকলেই ব্রহ্ম তাহলে গুরুকরণের দরকার কি ?

'প্রশ্ন করছো কেন ? সন্দেহ আছে বলেই তো। আমিই ব্রহ্ম এ বিষয়ে যখন সন্দেহ হবে তখন আর কে কার গুরু !'

'ব্রহ্ম জানা, না জানার মধ্যে নেই। যিনি বলেন যে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি কিছুই জানেন না। সাধক সাধনার বিভিন্ন অবস্থার কথা বলিতে পারে, কিন্তু উহা তো আর অদ্বৈত জ্ঞান নয়। যখন সে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে তখন তাহার প্রকাশ করিবার কিছুই থাকে না। তখন সে দেখে যে, যাহা আছে তাহাই আছে, যেমন সূর্যের আলো তো আছেই। এতোক্ষণ বাদলের জন্য দেখা যাইতেছিল না। যেই বাদল কাটিয়া গেল অমনি সূর্য দেখা গেল। অদ্বৈত জ্ঞানে নামা উঠা নাই। অদ্বৈত জ্ঞানী কিছুই বলেন না, করেন না। ব্রহ্মকে জানা যায় যে বলা হয় উহা ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বলা হয়। ব্রহ্মকে জানা যায় না কারণ তিনি স্বপ্রকাশ।'

এবারে মা হেসে হেসে বলছেন :

'গুরুকরণের প্রয়োজন আছে বৈকি। চুবানি খাইলেও স্নানের কাজ হয়। শরীরটা তো ভিজিয়া যায়। যদি গুরুর শরণাপন্ন হওয়া যায় তবে তিনিই যাহাই করেন না কেন তাহাতেই কাজ হয়।'

'গুরুতত্ত্ব বড় গভীর। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখা। গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। গুরু যেখানে ত্যাগ হয় সেখানে মনে কর যে গুরুকরণ করাই হয়নি। গুরুর দ্বারা অশোভন অন্যায় কাজ কখনও হয় না। জন্মজন্মান্তরের গুরু যেখানে বলা হয় সেখানে গুরু শক্তি গুরু ভক্তি শিথিল হয় না। সত্যানুসন্ধানে যিনি সত্যস্বরূপ ভগবান তাহার লক্ষ্যপূর্ণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।'

'চরমে একও নেই। এক তো আপেক্ষিক। এক দুই তিনের প্রশ্নই নেই। দ্বন্দ্বই দুনিয়ার নিয়ম। দ্বন্দ্ব মানেই দুই অন্ধ! দ্বন্দ্বের ভূমিতে এটা সত্য ওটি মিথ্যা। আপেক্ষিকতার পূর্ণাহুতি যেখানে সেখানে real-ও নেই, unreal-ও নেই। সেখানে সত্যও নেই, মিথ্যাও নেই। সত্য মিথ্যার প্রশ্ন নেই। সেখানে সাপেক্ষ নিরপেক্ষও প্রশ্ন নেই।'

মা আবার বলছেন পূর্ণতা সম্পর্কে :

'পূর্ণতা কৈবল্য নয়। পূর্ণতা একে নয়। পূর্ণতা এক আর বহু, খণ্ড আর অখণ্ড যুগপৎ।

তোমরা যাকে কৈবল্য ইত্যাদি বল না, যে অবস্থায় জগতের খণ্ড খণ্ড জ্ঞান লোপ হয়ে একাত্ম বোধ হয়, তাও পূর্ণতা নয়। পূর্ণতায় অংশ এবং পূর্ণের জ্ঞান যুগপৎ বর্তমান থাকে। অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত স্থিতি, অনন্ত লয়, পূর্ণভাবে প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে চলেছে। একে অপরের বাধক নয়, অথচ সবই পূর্ণ। এখানে মায়া মোহ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত সবই আছে। অথবা কি আছে কি নেই বলা যায় না, 'যা—তা'।'

পথের কথা বলতে গিয়ে মা আবার বলছেন :

'একটা লাইন ধরে চলতে হয়। যে প্রেমের লাইনে যাবে সে প্রেমস্বরূপ 'আনন্দময়,' ভগবৎরূপের প্রকাশ লাভ করবে। যে জ্ঞানের লাইনে যাবে, সে জ্ঞানস্বরূপ 'সৎব্রহ্মের' প্রকাশ পাবে, যে কর্মযোগের লাইনে যাবে, সে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা জগন্মাতার কৃপা লাভ করবে। আবার একই ব্যক্তি পিতা পতি পুত্র ইত্যাদি হতে পারে। সেইরকম একই ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। যে লাইনেই যাও সেই এককেই পাবে—যিনি একাধারে সবকিছু। যোগের মাধ্যমে নিত্যযুক্ত হতে হবে। যোগ বিয়োগের উপরে উঠে নিত্যযোগে থাকলে নিত্যস্বরূপ লাভ হয়।

তাইতো বলা হয় প্রথমে নাম। নাম করো। নামেও তো তিনিই প্রকাশিত। তাঁর অন্য যে সব প্রকাশ তাঁদের সঙ্গ পেতে হলে, মন্দিরে ছুটতে

হবে। আশ্রমে ছুটতে হবে। কিন্তু নামের সঙ্গ করতে কোথাও ছুটতে হয় না। সেই পরম প্রিয়ের অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ সর্বক্ষণ পাওয়া যায় সর্বাবস্থায়।'

হেসে হেসে মা এবার বলছেন :

'ঠাকুরের নাম হলো তেঁতুল। যতই নাম করো চিত্তশুদ্ধ হবে। তেঁতুল দিয়ে ময়লা ওঠে না? বাসন পরিষ্কার হলে তাতে পরিষ্কার মুখ দেখা যায়। নাম করা হচ্ছে মাজা। মেজে স্বরূপ দেখো। এই হলো জ্ঞান। জ্ঞান গঙ্গা এসে কর্ম টর্ম সবকিছু ধুয়ে দেন। পথ তো অনেকই আছে,—নূতন পথ আর কিছু চাই? খেলনা তো অনেক রকম আছে। তিনি কতরকমের খেলে গেছেন। সেই খেলা নাও, যে খেলা নিলে এটা যে খেলা তা ধরা পড়ে। হচ্ছে না হবে না বলে গা ঢালা দিয়ে থাকতে নেই। যে দিন যায়, সে আর ফিরে আসে না। খেলার ভিতর দিয়ে খেলা ভাঙ্গতে হয়। পথ অনন্ত। অনন্ত গতি। অনন্ত স্থিতি। তবে তারপরেও আছে, যেখানে গতিও নেই, স্থিতিও নেই। গতি স্থিতির প্রশ্নই নেই।

সেখানে ডোবা ভাসা নেই, একই স্থিতি। সব তাঁরই প্রকাশ। তিনিই। তিনি যা-তাই। তিনি যা-তা। বিচিত্র সংস্কার রয়েছে বিচিত্র জীবে। যার যে সংস্কার, সে যেখানে আছে সেখান থেকে তো এগোতে হবে তাকে। আপনাকে পাওয়া, সত্যকে পাওয়া, পূর্ণকে পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তাইতো সাধন। সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গ ও স্মরণ করণীয়। যাঁর সৃষ্টি তিনিই সব দিকে। দ্রুতগতিতে সেই লক্ষ্যপথে চলা। সবার মধ্যেই সব আছে। বীজের মধ্যে যেমন থাকে অনন্ত বৃক্ষ।'

তাইতো বলা হয় :

'তাঁরই ধ্যান করো। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করো। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম করো।

নিজেকে জানাই হলো ভগবানকে জানা। যাতে আমরা নিজেকে জানতে পারি সেইজন্য ভগবান কৃপা করে গুরুরূপে আমাদের পথ বলে দেন। তিনি মন্ত্র বা শক্তি দিয়ে আমাদের স্বরূপ জানবার উপায় করে দেন। এই তো দীক্ষা। একমাত্র তাঁকেই পাওয়া তাঁকেই জানা।

বিভিন্ন ভাব ও রুচি মানুষের। তাই বিভিন্নরূপে তিনি প্রকাশিত হন। তোমার যেরূপ ভগবৎ প্রাপ্তি হবে, ভগবান নিজে কৃপা করে সেইরূপে দেখা দেন।

ভগবান তো একই ! যেমন মানুষ এক, কিন্তু রূপ আলাদা আলাদা।

পরম সত্য একমাত্র তিনিই। প্রাকৃতরূপে বলো, অপ্রাকৃতরূপে বলো, সর্বরূপে।'

মা এবার বলছেন পুনর্জন্ম সম্পর্কে :

'পুনর্জন্ম আছে এবং নাই দুই-ই বলতে পারো। প্রতি মুহূর্তেই তোমার পরিবর্তন হচ্ছে। ঐ পরিবর্তনকে জন্ম মৃত্যু হিসাবে ধরা যায়। তুমি শিশু ছিলে, পরে যুবা হলে, এখন বৃদ্ধ হয়েছো। তোমার শিশুত্ব ও যুবত্ব মারা গিয়েছে, অথচ তুমি যে একই সে জ্ঞান আছে। সেইরূপ এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণকেও পুনর্জন্ম বলা হয়। আবার শিশু থেকে যুবা হলে যেমন উহাকে পুনর্জন্ম মনে করো না, সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণকেও পুনর্জন্ম মনে না করা যেতে পারে। এক কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরাও যেমন, এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ গ্রহণ করাও তেমন। এই ভাবে দেখলে জীবের একবারই জন্ম হয় এবং একবারই মৃত্যু হয়। জীব যখন প্রথম সৃষ্ট হলো – সেই তার জন্ম এবং যখন ভগবানে লয় পেল—সেই তার মৃত্যু।'

'জগতের শিশু হতে চাও কেন ? এমন শিশু হও যাতে আর বদলাবে না। শিশুত্ব বদলাবার কারণ হলো বাসনা।'

'প্রেয় পথ হলো আপাত মনোরম। আর শ্রেয় হলো আপাত দুঃখজনক, কিন্তু পরিণামে মঙ্গলদায়ক ও শান্তি। সেই শ্রেয়কে প্রেয় করতে হয়।

কেবল আত্মচিন্তায় মনটাকে লাগাবার চেষ্টা। নিরুপায়ের চেষ্টা করবে না। উপায়ের চিন্তা করো। নির্ধনী হতে চেও না। স্বধনের আকাঙ্ক্ষা সদা কর্তব্য। সময় যে বড় কম।

তাঁকে পাওয়াই লক্ষ্য, সেই একমাত্র ভগবান। তিনি যে পথে চালাবেন চলতে বাধ্য। ইচ্ছা করে কেউ কিছু করতে পারবে না। তিনি কৃপাময় দয়াময়। তাঁর দিকেই যে তিনি টেনে নিচ্ছেন।

আবার অন্য দিক থেকে দেখলে 'কৃপা' বলে কোনো কথাই নেই। সমস্তই

পুরুষকার হতে হয়। জগতে যদি মাত্র একটি সত্তাই থাকে তবে কে কাকে কৃপা করবে ?

কৃপা এবং পুরুষকার এই সব কথা যে হয় তা কেবল এক জিনিষকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা। কথা বলতে গেলেই এক একটা দিক নিয়ে কথা বলতে হয়। একদিক থেকে দেখলে সমস্তই তাঁরই কৃপা বলে মনে হয়। আমরা যে ভগবানকে পেতে চেষ্টা করছি এটাও তাঁরই কৃপা। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁকে চাইবার উপায় নেই। পুরুষকারের অভাবে আমরা যে তাঁকে পাচ্ছি না এটাও তিনি কৃপা করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন।

পূর্ণজ্ঞান হলেই এই দ্বন্দ্বের শেষ হয়। তবে একটা কথা, কর্ম করলে কর্মফল থাকবেই। আবার কর্মেরও শেষ নেই। সেই হিসাবে সাধনা অনন্ত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান বা অখণ্ডজ্ঞান কর্মদ্বারা পাবার নয়। এটা স্বয়ং প্রকাশ।'

মা আবার বলছেন :

'অনেকে সাধন ভজন করে এমন এক অবস্থায় এসে পড়ে যখন তার ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাস আসে। সে মনে করে ভগবান বলে কিছু নেই। ইহাও কিন্তু সাধনের একটি অবস্থা। ইহারও কতকগুলি লক্ষণ আছে যা দেখে বোঝা যায় যে সত্য সত্যই কেহ এই অবস্থায় এসেছে কি না। ভগবান কখন কি ভাবে কাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন তা বলা শক্ত।'

এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন :

এক সময়ে এক শেঠজীর কাছে এক যোগীরাজ ভিক্ষার জন্য এসে উপস্থিত হলো। শেঠজী তাঁর লোককে একটি পয়সা দিতে বললেন।

কিন্তু যোগীবর পয়সা গ্রহণ করলেন না। তিনি শেঠজীর কাছে ভিক্ষা চাইলেন, তিনি যেন ভগবানের নাম করেন।

কিন্তু ভগবানের দিকে মন দেবার অবসর কোথায় শেঠজীর! তিনি তো বিষয় নিয়ে মত্ত। সুতরাং যোগীবরের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। কিন্তু যোগীবরও নাছোড়বান্দা।

অবশেষে শেঠজী তাঁকে বললেন, বার বার আমাকে এমন অনুরোধ কোরো না। তোমার এই অনুরোধের পরিবর্তে তুমি বরং আরও একটি পয়সা বেশী নাও।

প্রত্যুত্তরে যোগীবর বললেন, শেঠজী, আমার পয়সার প্রয়োজন নেই।

অল্পসময়ের জন্য হলেও, দিনে অন্ততঃ একবার আপনি ভগবানের নাম করুন।

অবশেষে যোগীবরের অদ্ভুত জেদ দেখে, শেঠজী ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন এবং দারোয়ান দিয়ে তাঁকে গৃহ থেকে বের করে দিলেন।

সকাল বিকালে নিয়মিত বেড়ানো শেঠজীর অভ্যাস। এই ঘটনার পরদিন শেঠজী যখন বেড়াতে বের হয়েছেন তখন যোগীবর যোগবলে শেঠজীর আকৃতি এবং পোশাক গ্রহণ করে শেঠজীর গৃহে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে এত তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরতে দেখে তাঁর স্ত্রী কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, শুনলাম এখানে একজন বহুরূপী এসেছে। সে নানা লোকের আকৃতি ধরে এবং পোশাক পরে লোকদের প্রতারিত করছে। খুব সাবধান। আমার আকৃতি ও পোষাকে কেউ এলে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। এই বলে তিনি উপরে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই শেঠজী ফিরে এলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করতে গেলে ভৃত্য ও পুত্ররা বাধা দিতে লাগল। তিনি যতই তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, তিনিই বাড়ীর মালিক ততই তারা আরও উগ্র হয়ে ওঠে। বিস্মিত হয়ে শেঠজী স্ত্রীকে ডাকলেন। স্ত্রী আরও ক্রোধান্বিত হয়ে শেঠজীকে পাদুকা দিয়ে প্রহার করে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন।

নিরুপায় হয়ে শেঠজী তখন দারোগা বাবুর শরণাপন্ন হলেন। দারোগাবাবু শেঠজীর পূর্ব পরিচিত। তিনি সবকিছু শুনে, পুত্রদের থানায় ডেকে আনলেন।

ছেলেরা দারোগাবাবুর অভিযোগ শুনে প্রত্যুত্তরে বললো, তাদের পিতা তাদের ঘরেই আছেন। এই লোকটি তাদের পিতা নয়, একজন বোম্বেটে বহুরূপী মাত্র।

দারোগা তখন তাদের পিতাকে থানায় নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। পুত্ররা নিয়ে এলো তাদের পিতাকে অর্থাৎ শেঠজীর বেশধারী যোগীরাজকে।

নবাগত শেঠজীকে দেখে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন দারোগা। এই দুইজনের মধ্য থেকে প্রকৃত শেঠজীকে নির্ণয় করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য।

দারোগা যখন চিন্তিত, তখন যোগীরাজ প্রশ্ন করলেন শেঠজীকে, তুমি নিজেকে শেঠজী বলে পরিচয় দিচ্ছ, আচ্ছা বলতো তোমার বাড়ী তৈরী করতে কত খরচ পড়েছে?

প্রত্যুত্তরে শেঠজী বললেন, সে খবর আমি কি করে জানি। আমার কর্মচারীরা হিসাব রেখেছে। হিসাবের খাতা দেখলে বলা যেতে পারে।

আবার যোগীরাজ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো তোমার বড় ছেলের

বিবাহে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

প্রত্যুত্তরে শেঠজী ঐ একই কথা বললেন, খরচের হিসাব না দেখে আমি কিছুই বলতে পারি না।

এবারে যোগীবর মৃদু হেসে বাড়ী তৈরী ও পুত্রের বিবাহের সমস্ত খরচ বলে দিলেন। হিসাবের খাতার সঙ্গে টাকা আনা পাই মিলে গেল। সবকিছুই যোগবলের ব্যাপার।

এবারে দারোগাবাবু যোগীবরকেই শেঠজী বলে সাব্যস্ত করলেন। এবং শেঠজীকে তাড়িয়ে দিলেন।

শেঠজী সর্বস্ব হারিয়ে মনকষ্টে পথ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তিনি এমন একস্থানে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বসে বসে ভগবানের নাম করছেন। ভগবৎ তপস্যায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। ঐ সব সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি সেই যোগীরাজকে দেখতে পেলেন। যোগীরাজকে দর্শন করেই তাঁর চৈতন্য হলো। তিনি তাঁর চরণে পড়ে নিজের সর্বনাশের কারণ নিবেদন করলেন। এবং একদিন তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছেন তার জন্য কাতরভাবে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

যোগীরাজ শেঠজীকে অনুতপ্ত দেখে তাঁকে ক্ষমা করলেন এবং বললেন, ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসই তোমাকে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আনবার পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভগবানের নাম করবার ইচ্ছা এখন তোমার অন্তর থেকেই জাগ্রত হয়েছে। খুব ভাল কথা। তোমার আর দুঃখ থাকবে না। আমি আবার তোমাকে বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে ভোগ করবে এবং সর্বদা ভগবানের নাম করবে।

শেঠজী এবারে সম্মত হলেন এবং গুরু মনে করে যোগীবরের পদধূলি মস্তকে নিলেন। যোগীবরও তাঁকে আশীর্বাদ করে গৃহে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। শেঠজীও গৃহে ফিরে এলেন। কেউই বাধা দিল না। কারণ যোগীরাজ তো তখন আর গৃহে নেই।

শেঠজী এবারে ধর্মপ্রাণ শেঠজীতে রূপান্তরিত হলেন। জীবনধারায় হলো আমূল পরিবর্তন। বাড়ীতেই এক মন্দির নির্মাণ করে ধ্যান, জপ ও ভগবানের আরাধনাও করতে লাগলেন। সংসারে রইলেন ধার্মিক হয়ে। মালিক হয়ে নয়। মালিকের প্রতিনিধি হয়ে।'

তাইতো মা বলেন ঃ

'ভগবান ভিন্ন ভবমন্ত্রের মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা উদয় হয় না। রোগ শোক অভাব অনুতাপ ইত্যাদি মনুষ্য জীবনে খুবই দরকার। ত্রিতাপের দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা নষ্ট হয় এবং ভগবানের প্রতি একাগ্রতা আসে। এ কারণে দুঃখকে বরণ করো। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ চিত্তে চন্দ্রকিরণ যত মধুর বোধ হয় অন্য কোনো সময়ে তেমন হয় না।'

'তিনি যে কল্পতরু। তাঁর কাছে লোকে যা চায় তাই পায়।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একদিন একটি গল্প বললেন ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে।

'এক পথিক পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষনিম্নে আশ্রয় নিল। সেই বৃক্ষটি ছিল কল্পতরু। পথিক কিন্তু তা জানতো না।

ক্লান্ত পথিক বসে বসে ভাবতে লাগল, আহা! যদি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো, প্রাণটা জুড়াতো। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই মলয় বাতাস প্রবাহিত হলো। শ্রান্ত পথিকটির ক্লান্তি দূর হলো। তখন তার স্নান ও আহারের বাসনা জাগল। অকস্মাৎ স্নানের জল এবং আহার্য দ্রব্যও এসে উপস্থিত হলো। কোথা থেকে এসব আসছে কিছুই বুঝতে পারল না সে। বিস্মিত হয়ে স্নান এবং আহার সমাপন করল। আহারের পর শয়নের ইচ্ছা হলো। উৎকৃষ্ট শয্যা দ্রব্যও সম্মুখে দেখতে পেল। দ্বিধা না করে শয্যা গ্রহণ করল।

শুভ্র শয্যায় শুয়ে শুয়ে পথিক ভাবতে লাগল এখন যদি একজন সেবাদাসী থাকত! সঙ্গে সঙ্গেই একজন সেবাদাসী এসে তার হাত-পা টিপে দিতে লাগল। মহানন্দে সে ভাবতে লাগল, মজা তো মন্দ নয় যা চাচ্ছি তাই পেয়ে যাচ্ছি। এত সুখ! এত আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনও দস্যু এসে মারধর করে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়—তবে তো বড়ই বিপদ হবে! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই একজন দস্যু এসে উপস্থিত হলো এবং পথিকটিকে মারধর করে সব কিছু কেড়ে নিয়ে চলে গেল।'

গল্প শেষে মা বেশ জোর দিয়েই বলছেন :

'তাইতো বলা হয় ভগবানের কাছে যদি কিছু চাইতে হয় তবে তাঁকেই চাইবে। কারণ তাঁকে পেলে সমস্তই পাওয়া যায়। নইলে মায়াজালে জড়িত হয়ে দুঃখ পেতে হয়। আর তাঁকে পেলে কিছুই হারাতে হয় না। মনে করো তুমি পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করছ, ঐ আকাঙ্ক্ষা করে যদি তুমি ভগবানকে চাও এবং পাও, তবে দেখবে যে সকলের পুত্রই তোমার পুত্র। এখানে নিজের পুত্র এবং পরের পুত্র বলে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এইরূপে ধন মান পদোন্নতি। কারণ ঐ সমস্তই ভগবানের মধ্যে আছে। তাই ভগবানকে পেলেই সব পাওয়া যায়।

তবে যদি বিষয় চাও, বিষয়ও পাবে। কিন্তু বিষয় তো বিষ। জহর। ওর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও আসবে। বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাই জীবকে বদ্ধ করে। বদ্ধ হওয়ার অর্থই নষ্ট হওয়া। বদ্ধ জলেই কীট জন্মে। তাই বদ্ধ জল পানের অযোগ্য। কিন্তু এই জলই যদি ফিলটার করে নেওয়া যায় তবে পান করা যেতে পারে। তখন আর ঐ জলে বদ্ধ জলের দোষ থাকে না। বদ্ধ জলও জল কিনা, তাই শুদ্ধ হলে জলের গুণ পায়। জীবাত্মা আর পরমাত্মা সম্বন্ধও সেইরূপ। পরমাত্মা আবদ্ধ হয়েই জীব হয়েছেন। ঐ আবরণ কেটে গেলে যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মা।

তাইতো সর্বভাবে ভগবানকে দেখতে অভ্যস্ত হও। যদি মনে করতে পারো, 'ভগবান, যে সুখ পাচ্ছি তা তোমারই দান। যে দুঃখ পাচ্ছি তাও তোমারই দান। তুমি ভাব ও অভাবরূপে আমার কাছে আসছ।' তখন দেখবে যে, জগতে কিছুই তোমাকে অশান্তি দিতে পারবে না। তুমি সর্বরূপে ভগবানকে পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করবে। এবং জানতে পারবে তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই।

তিনি যে প্রাণের প্রাণ। মহাপ্রাণ। সর্বদা তাঁর সঙ্গ কর। শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রেখে নাম করে যাও। এতে সব পাবে। সৃষ্টি স্থিতি লয়, জ্ঞান কর্ম ভক্তি সবই এর মধ্যে আছে। রূপ রস গন্ধ, জীব জগৎ দেবতা সগুণ নির্গুণ—সমস্তই এর মধ্যে। প্রাণরূপে, তরঙ্গরূপে জগতের প্রকাশ। ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির উর্ধ্বে যেতে হয়। যেমন তরঙ্গকে ধরলে তরঙ্গ-পূর্ণ জলকেও যুগপৎ পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের সাধন করেও মহাপ্রাণের খোঁজ পাওয়া যায়। সকল অবস্থাতেই এই প্রাণের সাধন চলতে পারে। প্রাণরূপে ভগবান প্রত্যক্ষ। প্রাণায়াম ছাড়া কিছুই যে হবার উপায় নেই। ঘরে যে কপাট দিয়ে থাকবার কথা বললাম এও তাই-ই। ভোগের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে

উঠিয়ে আনাই হলো ঘরে কপাট দেওয়া। তা না হলে শুধু দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলে কি হবে। এ শরীরটা বলে পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে তোমরা খাও। তাহলেই বেশী খেতে পারবে।'

—পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়া কি ?

'জপ ধ্যান সৎসঙ্গ সদ্গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি একটার পর একটা নিয়ে থাকলেই এদিকে বেশী সময় দিতে পারবে।

ভগবানের দিকে মন রাখতেই হবে, তিনি যে ভাবেই রাখুন। ভগবানেতে মন রাখলেই জগতের কোনো অভাব অভিযোগ মান অপমানের প্রশ্ন উঠবে না। সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, ভগবানেতে মন যত বেশী থাকবে ততই অনুভব করবে। ভগবৎ কথা নিয়ে আলোচনায় সহজ খাওয়া-পরার ভিতর দিয়ে নিজেকে তৈয়ার করতেই হবে। যখন যেমন তখন তেমন। তাহলেই শান্তি ও শান্তভাবের আশা। ভগবৎ ভাব নিয়ে সময় কাটানো। এই তো যাত্রা। পথ চলা।'

—'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।'

'ভগবানই যে ইষ্ট—ইহা ভুল করিয়া সকলে বিষয়কে ইষ্ট করিয়া নেয়। ভগবান ছাড়া অপরকে ভাবা তাহাতে 'দু-ইষ্ট'—আসিয়া গেল—'দুষ্ট'।'

'কর্তব্যবুদ্ধি হইতে আধ্যাত্মিক কাজ করিতে হয়।' হেসে হেসে মা বলছেন ভক্তদের।

আরও বিশদ করে শ্রীশ্রীমা বলছেন ঃ

'কোনো দিকেই উদ্যম নাই। উৎসাহ নাই, ইহা তো জড়ের অবস্থা। জড় ভাব লইয়া থাকাই কি ভাল ? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করা তা কর্তব্যবুদ্ধি থেকে করতে হয়। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করতে হয় না। কর্ম করলে ফল পাওয়া যায়ই। এক পয়সা এক পয়সা করে জমালেও সময়ে এক টাকা হয়। সকল কাজেরই একটা ফল আছে। কেবল কাজ করা কেন ? কিছু দেখা, কিছু স্পর্শ করা,—সমস্ত জিনিষেরই একটা প্রভাব আছে। এই সব কারণে সৎসঙ্গের এবং স্থান-মাহাত্ম্যের কথা আসে। আবার এই সব

কারণেই সাধক তার আসন কাপড় বিছানা ইত্যাদি অনেককে ছুঁতে দেয় না। আমরা যা আহার করি বা চিন্তা করি উহার গুণ আমাদের মধ্যে এসে পড়ে এবং উহাও আমাদের পরিবর্তিত করে।

জগতে আমরা যা কিছু দেখি, উহা যদি কেবল আমাদের সুখ দুঃখের দিক থেকেই দেখি তবে উহা শুধু আমাদের বন্ধনের সৃষ্টি করে। গাছ পাহাড় ফুল ইত্যাদি দেখে যদি ভাবি, 'বাঃ এগুলি কেমন সুন্দর!'—তবে ঐ সব বস্তুর গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তা থেকে নূতন নূতন সংস্কার সৃষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু ঐসব দেখে যদি ঐগুলিকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে গ্রহণ করতে পারি, যদি ভাবতে পারি ভগবানই এই সুন্দর ফুলরূপে, ফলরূপে আছেন তবেই আমাদের মধ্যে শুদ্ধভাব পুষ্টিলাভ করবে। তাই ভোগ বাসনা করে কিছু দেখতে নেই বা করতে নেই। কারণ ঐ বাসনা থেকে যে সব সংস্কার সৃষ্ট হবে তা থেকে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। অবশ্য ভগবানের কৃপায় সমস্ত বাসনার বীজ এক মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে কথা আলাদা। আমাদের ক্রমোন্নতির পথেই চলা ভাল। সেই হিসাবে সাধ্যমত নাম জপ ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধভাবের পুষ্টি সাধন করতে হয়। এই পথে কাজ করে কোনো ফল পাওয়া যায় না দেখে নিরাশ হতে নেই। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আমাদের মধ্যে আবর্জনার স্তূপ সৃষ্টি করে রেখেছে। উহা শেষ না হলে ভগবদ্ ভাব ফুটে ওঠবার উপায় নেই। অবশ্য এরূপ দেখা যায় যে কেহ কেহ অল্পদিন কাজ করেই কিছু কিছু অনুভব করতে থাকে! এ সব ক্ষেত্রে মনে করতে হবে, তারা ভাল সংস্কার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সহজেই তাদের পথ খুলে যাচ্ছে। কাজ করে গেলে ফল পাওয়া যাবেই,—এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। কারো যদি গুরু না থাকে তাতেও কোনো বাধা নেই। কারণ গুরু সকলের মধ্যেই আছেন। কাজ করে গেলে তিনি আপনিই জেগে উঠবেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে গুরুর আশ্রয় নিয়ে কাজ করা ভাল।'

মা আবার বলছেন :

'তাইতো বলা হয় এই ক্ষণভঙ্গুর অহং আমিত্বকে সেই নিত্য মহান আমিত্বতে অর্পণ করার জন্য এইটি কল্যাণের দিক। এই পরমার্থদিক সর্বক্ষণ যাতে মনস্থির থাকে সেইজন্য অনুকূল ক্রিয়া, সদ্গ্রন্থপাঠ, স্মরণ ইত্যাদিতে নিজেকে ব্রতী রাখা। কোন শুভ মুহূর্তে যে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ প্রকাশ হবে, এই জীবনেই। এদিকে তাকাতে নেই। কেবল নিজ বাঞ্ছা পূরণের ক্রিয়ায়

নিজেকে দৃঢ় ভাবের বন্ধনে রাখা।'

'সত্যানুসন্ধান ঠিক ঠিক যেখানে, সেখানে কখনও বিফল হয় না।'

'ধর্মপথে কর্তব্যপালন করা চাই। জনরূপে জনার্দন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তোমার সেবা পাবার জন্য। নারীর কাছে পতি পরমপতিই রূপ। সেই জ্ঞানে তাঁর সেবা করো। গৃহস্থাশ্রমটা যে একটা সেবাক্ষেত্র। সব সেবাতেই ভগবানের পূজা বোধ করতে পারা চাই। তাহলে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল হবে।

যতক্ষণ পারা যায় নাম নিয়ে থাকার চেষ্টা করা। জাগতিক বন্ধুর সঙ্গ করলে যেমন তার সব কথা জানতে পারো,—সেইরূপ পরমবন্ধুর সঙ্গ করলে তিনিও তাঁর তত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করে দেবেন। সমুদ্রের ঢেউ দেখে কি তুমি স্নান করা বন্ধ করে দাও? ঢেউয়ের মধ্যেই তো ঝাঁপ দিয়ে স্নান সেরে ফেলো। তেমন সাংসারিক ঝড়-ঝাপটা disturbance-এর মধ্যেও তাঁকে সর্বদা স্মরণ ও জপ নিয়ে থাকার চেষ্টা করা।'

একজন ভক্ত মাকে প্রশ্ন করছেন, মা, আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ সৎসঙ্গ করছি, কিন্তু তবু মনে শান্তি পেলাম না। ঘানির বলদের মতন ঘুরে মরছি। কিসে শান্তি পাব?

প্রত্যুত্তরে মা বললেন, 'সৎসঙ্গ করেছ বটে, কিন্তু মনন করো নি। সদ্‌বাণী শুনেছ, কিন্তু মহাত্মাদের উপদেশ অনুযায়ী ক্রিয়া করো নি। মনন করো নি। নিদিধ্যাসন করো নি। কি করে গুরুকৃপা লাভ হবে?'

—কেন মহাত্মারা কি নিজেদের রোজগার থেকে আমাদের কিছু দিতে পারেন না?

মৃদু হেসে মা বললেন, 'জমিদারী ভোগ করতে চাও বুঝি? যতদিন না মনন করবে, ক্রিয়া শুরু করবে, ততদিন রাস্তা খুলবে কি করে? নিজ নিজ অধিকার ও সংস্কার অনুযায়ী সাধন ক্রিয়া অবলম্বন করলে আত্মশক্তি বাড়ে, develop করে। ভগবান প্রাণের প্রাণ আত্মা। একই প্রাণ একই আত্মা। তাঁকে পাবার জানবার জন্য যে ক্রিয়া নিজের ভিতর থেকে ভাল লাগে, তা অবলম্বন করা চাই। তার জন্য কি করছ? সংসারের জন্য তো কত কাজ করলে, কত কষ্ট করলে। কিন্তু তুমি যে আত্মাস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, ভুলে বসে আছো, তার জন্য কি চেষ্টা করেছ? তাঁকে প্রকাশ করবার জন্য এবার একটা ক্রিয়া শুরু করে দাও। 'ভগবান আমাকে অতিরিক্ত সময়টুকু অন্ততঃপক্ষে দাও।

এই প্রার্থনা করো। আর দুনিয়ার সমস্ত কাজ তাঁর পায়ে অর্পণ বুদ্ধিতে করো। এই সংসারে ম্যানেজারের মতন থাক। মালিক হয়ে নয়। ম্যানেজার হয়ে জনরূপী জনার্দনের সেবা করো। ঘরে গৃহলক্ষ্মী আছেন, কুমারী দেবী আছেন, বাল গোপাল আছেন। তাঁদের সেবা করো। অবহেলা কোরো না। শান্তি পাবে। ভগবানের দিব্যরূপ স্মরণ-চিন্তনে লাগাও। তাঁর পূজা করো। আজই শুরু করে দাও। আর time (সময়) বরবাদ (নষ্ট) কোরো না।'

আবার বলছেন :

'পুরুষকারের দ্বারা পরমপুরুষকে পেতে হবে। পুরুষোত্তমের প্রকাশের জন্য যে ক্রিয়া তাই হলো ঠিক ঠিক পুরুষকার। ভগবৎ কৃপার দ্বারা ভাগ্যও বদলানো যায়। যে ভক্ত বিশ্বাস করে ভগবৎ কৃপায় প্রারব্ধ বদলানো যায়, তার জন্য তাও সম্ভব। ভগবানের রাজ্যে নিয়ম আছে বটে, কিন্তু তার কাছে অসম্ভব কিছুই নয়। তুমি যদি মানো যে ভগবৎ কৃপাও ভাগ্য নির্দিষ্ট, তবে তোমার জন্যই তাই ঠিক। কিন্তু যদি ভাগ্য থেকে ভগবানকে বড় বলে মানো তবে তিনি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারেন। তিনি ভক্তের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন।'

'স্ব-মা। তিনি স্বয়ং ময় হয়ে রয়েছেন—আছেন। তাঁকে যে ব্যাকুল হয়ে ঠিক ঠিক ডাকে তখনই তিনি প্রকাশিত হন। মা জানেন ছেলের আসল কান্না—যে কান্নায় মা সব কাজ ফেলে ছুটে আসেন।'

'কর্মজগতে অনেক তো হলো। এখন শুধু ভগবানের দিকে মনটা দেওয়ার চেষ্টা করা। অমূল্য সময় নষ্ট করতে নাই! যারা ভগবৎ চিন্তা এবং নিজেকে পাওয়ার দিকে না যায় তারা আত্মঘাতী। শ্রেয়ঃ গ্রহণ প্রেয় ত্যাগ।'

'পরমার্থের দিক হলো যোগ। আর জগতের ক্রিয়ার দিক হলো ভোগ। ক্রিয়া যোগের পথে যিনি চলেন তিনিই মুক্তির পথে। যিনি যে ধারা পান, সেই ধারায়ই নিত্যযুক্ত হয়ে ঐ ক্রিয়াদিকে ক্রিয়া মুক্তির চেষ্টা করেন। নিত্য মুক্ত,

অতীত যেখানে সেইখানে প্রশ্নই ওঠে না। প্রথম ক্রিয়াযুক্ত হও। একনিষ্ঠ হয়ে যে ধারায়ই হোক, তবে তো ক্রিয়ামুক্ত। যোগী মানে নিত্যযুক্ত। আর নিত্যযুক্ত যেখানে, এই মুক্তিও সেখানে।'

'কিন্তু রস ভিতরে না গেলে জাগরণ হয় না।' রহস্য করে মা বলছেন ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে।

এই প্রসঙ্গে হেসে হেসে গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীমা বলছেন :

'একদিন বৃন্দাবনে এ শরীরটা বসে গল্প করছে। তখন দেখি যে বাবা (অর্থাৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী) বসে বসে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছেন। ঘুম—কি ঘুম! ডাকলেও সাড়া নাই। নিকটেই ছিল রসগোল্লা।

একজনকে বললাম, বাবার মুখে একটা রসগোল্লা দাও। তাই করা হলো। তবুও বাবা জাগলেন না। ঐ রসগোল্লার রস যখন বাবার গলার মধ্যে প্রবেশ করল তখনই বাবা জেগে উঠলেন।

তাইতো বলা হয় :

'রস ভিতরে না গেলে জাগরণ হয় না।' মার সাথে সাথে স্বামীজীও হাসলেন ভক্তরা হেসে উঠলেন! পরিহাসচ্ছলে কঠিন তত্ত্বকথা মা সরস করে বলছেন।

মা আরও বিশদ করে বলছেন :

'ঘুমই বল আর তমোগুণই বল এর মোহ কাটে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রসের আস্বাদন না হয়। তিনি যে রস স্বরূপ। রসই বল, আনন্দই বল বা জ্যোতিই বল, তাঁর স্বরূপই ঐ। জাগতিকভাবে দেখলে আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দ আছে। যেমন অন্ধকার ভিন্ন আলোর জ্ঞান হয় না। দুঃখ ভিন্ন সুখ বুঝা যায় না। সেইরূপ আনন্দ বললে নিরানন্দের আভাস তোমাদের থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে যখন তাঁকে আনন্দ স্বরূপ, সুখ স্বরূপ বলা হয়, তখন কিন্তু উহার মধ্যে নিরানন্দ বা দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। এখানে শুধু আনন্দই আনন্দ অথবা এখানে আনন্দ বা নিরানন্দ তাহা কিছুই বলা চলে না।

তাইতো বলা হয় পরমানন্দ লাভ করতে হলে পরমার্থ পথের অনুকূল যে রূপ ও ভাব ভাল লাগে সেই মত ও পথ অনুসরণ করা। অন্তর্গুরুর যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পরমস্থিতির দিক কোথায়? ভগবানেতে মানুষের প্রেম হওয়া। তাহলেই শান্তি—আনন্দ।'

'এইজন্যই অভ্যাসযোগের কথা বলা হয়। পরে ভগবানের কৃপাতেই সব

হয়ে যায়। ভগবানের কৃপাও দুইভাবে হয়। অনুকূল কৃপা এবং প্রতিকূল কৃপা। যারা প্রবৃত্তিমার্গে চলে তাদের উপর প্রতিকূল কৃপাই দেখা যায়। আঘাত দিয়ে ভগবান তাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনেন। তা না হলে জীব কখনও তাঁর দিকে ফিরতে পারত না। আর ভগবানের এমনই সুন্দর বিধান এই যে তাঁর দিকে যতই লোক অগ্রসর হয় ততই তার মধ্যে অণিমা লঘিমা ইত্যাদি ভগবানের যে সব ঐশ্বর্য আছে তা করলে আবার পতন হয়। এ পতনও কিন্তু তাঁরই কৃপা। তিনি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন যে ঐসব নিয়ে খেলা করতে নেই। ঐগুলি গোপন করতে হয়। তবে গোপন করতে গিয়ে যদি কিছু automatically (আপনা আপনি) বের হয়ে পড়ে তাতে দোষ নেই। আবার মজা দেখো ভগবান সকল দিক দিয়েই পূর্ণ কিনা তাই ভোগের পথে থাকলেও যে দুঃখ ইত্যাদি হয় তাও পূর্ণভাবেই হয়। যে কাজের যে ফল হচ্ছে তা পূর্ণভাবেই হচ্ছে।'

—এই ভগবৎ রস আস্বাদনের বাধা কি ?

'মায়া মোহ-আবরণ। মানুষ মায়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে রয়েছে।'

আবার এই মায়াটাও তো তিনি। কেবলমাত্র তাঁর কৃপাতেই এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়। মোহাচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে মানুষ হয় মুক্ত। ভক্তির হিমকণা তার অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলে। সাধারণ মনুষ্যদেহ রূপান্তরিত হয় ভাগবতী তনুতে। কৃপা করে তিনি তখন ছোট্টটি হয়ে ধরা দেন। ছোট্ট না হলে ভক্তের বুকের মধ্যে ধরবে কেমন করে ? ভক্তের কাছে ভগবান আসেন মধুর হয়ে। কোমল হয়ে। স্নেহলাবণ্য পুঞ্জিত হয়ে। বালগোপাল হয়ে।

তাইতো মা বলছেন :

'চেষ্টা করিয়া কেহ মায়া কাটাইতে পারে না।'

এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীমা :

'এক ছিল ভক্ত পরিবার। স্ত্রী ছিল খুবই ভক্তিমতী। স্বামী-স্ত্রীতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত গোপালের সেবা নিয়ে। গোপালকে স্নান করান, খাওয়ান, আরতি করা, শয়ন দেওয়া ইত্যাদি কাজই ছিল তাদের ধ্যান জ্ঞান জপ মন্ত্র। এই ভাব নিয়ে তারা শান্তিতেই ছিল। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের স্বামীটি মারা গেল।

ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটি মুষড়ে পড়ল এবং মনে মনে চিন্তা করল, আমি এত

করে গোপালের সেবা করলাম আর তার প্রতিদানে আমার এই বৈধব্য ?

অবশেষে সে গোপালের সেবা করা বন্ধ করল। নাওয়া খাওয়া ভুলে দিবারাত্র স্বামীর জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল। এইভাবে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতে লাগল। অবশ্য মাঝে মাঝে যে তার গোপালের কথা মনে হতো না এমন নয়, তবে সে গোপালের প্রতি অভিমান ছাড়তে পারল না।

কিছুদিন পর হঠাৎ সে দেখল গোপাল নেই। গোপাল চুরি হয়ে গেছে।

প্রতিবেশীরা কেউ কেউ জানাল তারা দেখেছে, গোপাল তার বিছানা থেকে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

এই সংবাদে সে আরও মর্মাহত হলো এবং স্বামী শোক ভুলে গোপালের শোকে অধীর হয়ে উঠল। দিবারাত্র চীৎকার করে গোপালকে ডাকতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, হায়, আমি গোপালকে অনাদর করেছি বলেই গোপাল আমাকে ছেড়ে গেল।

কোনো সান্ত্বনাতেই তার মন আর শান্ত হলো না। গোপালকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে তীব্রতর হলো। এইভাবে আরও কিছুদিন অতিক্রান্ত হলো।

হঠাৎ একদিন সে দেখল তার গোপাল তার বিছানায় শুয়ে আছে। ঠিক সে যেমনভাবে শুইয়ে রেখেছিল তেমন ভাবেই আছে। বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে স্ত্রীলোকটি তার গোপালকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। হারানিধিকে পেয়ে সে সব শোক ভুলে গেল। আবার সে গোপাল সেবায় মনোনিবেশ করল। গোপাল আবার তার ধ্যান জপ মন্ত্র হয়ে উঠল। স্বামী শোক যে একেবারেই ভুলে গেল তা নয়—তবে পূর্বের মতন শোকাবহ অবস্থা আর রইল না।'

গল্প শেষে মা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। ধ্যান মৌন অবস্থা। ভক্তবৃন্দরাও নীরবে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন গল্পটির মর্মার্থ।

অবশেষে মা বলছেন :

'তাইতো বলা হয়, মহামায়ার মায়া কেহ চেষ্টা করিয়া কাটাইতে পারে না সবকিছুই তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ।'

'মোহমায়া যতক্ষণ ততক্ষণ মহামায়া। বাদল হটলে সূর্য প্রকাশ হবেই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী—তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন, মোহমায়া নষ্ট করেন জ্ঞানসূর্য বাদলে ঢাকা, বাদল হটলেই সূর্যের পূর্ণ প্রকাশ। অবিদ্যার নাশ বিদ্যার প্রকাশ।'

শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন :

'পাত্র উল্টা রাখ তো বয়ে যাবে। সিধা রাখ তো রয়ে যাবে। চলা ফিরা, কাজ কর্ম চিন্তা, ভাবনা সবই তো তাঁর শক্তিতে হয়। সেই শক্তির প্রকৃত প্রয়োগ আবশ্যক। যোগীত্ব, সাধকত্ব, যা তোমার মধ্যে আছে তা তুমি জাগ্রত করো। তোমার তীব্র ইচ্ছাতেই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব। ভগবানকে মেনেছ, ভাল কথা, কিন্তু তাঁর কৃপা বিনা কিছুই হবে না। এ তো তাঁরই কৃপা। তাঁর কৃপার স্মরণ, এও তাঁরই স্মরণ। তীব্র ক্রিয়ায় আবরণ সরে যায়। প্রকাশ হওয়া না পর্যন্ত সুখ দুঃখ। প্রকাশ হবার জন্যই তাঁর কৃপা। তাঁর নাম। রূপ চিন্তা। যদি এক মুহূর্ত অন্য চিন্তা বিষয় চিন্তা হয় তবে তা মৃত্যু চিন্তা। তাঁর কৃপার স্মরণ, নাম স্মরণ, রূপ স্মরণ, অনুক্ষণ তাঁর স্মরণই অমৃতত্ব। মন রাজ্যের সবটুকু ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও। উহা না করাই আত্মঘাতী। তুমিই অমৃত। আত্মা।—মৃত্যু তোমায় স্পর্শ করতে পারে না। অন্তরের বাদল তোমাকে হটাতেই হবে।'

'নেই বললে কিছুই নেই, আর আছে বললে সবই আছে। ছাখো না কেউ বলছে জগৎ মিথ্যে আবার কেউ বলছে সত্যি। অনেকে বলে দেবদেবীর কোনো সত্তা নেই। আবার কেউ বলে নিশ্চয়ই আছে। এমন কি ডাকাডাকিতে এঁদের দর্শনলাভও হয়। এঁদের কথাও কানে শোনা যায়। শিশুর কাছে মাটি বা রবারের পুতুল জীবন্ত মানুষের মতন সত্যি, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সে দৃঢ় ধারণা অসত্যে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই দেখা যায় প্রত্যেকের সাময়িক ভাবের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিষয়ের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হয় নিরূপিত। প্রকৃতভাব যখন একমুখী হয়ে জম্‌তে জম্‌তে ঘনীভূত হয়, তখন কারো কারো চিত্তে সংস্কার বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মহৎভাব প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং প্রকাশ পায় বাণীরূপে। একনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্তগৃহে এসব নৈমিত্তিক উৎসব মাত্র। অধ্যাত্মপথে চল্‌তে চল্‌তে ঈশ্বরচিন্তার প্রবাহ ধরে যখনই আপনাকে হারানো যায়, তখনই এরূপ খণ্ডবিভূতির স্বতঃসিদ্ধ দর্শনলাভ ঘটে। এরা সহায়কসূচক হলেও কখনও সাধকের শেষ লক্ষ্য নয়। জল থেকে বাষ্পাকারে মেঘ জন্মে, কিন্তু এ মেঘের কোনো সার্থকতা নেই, যে পর্যন্ত না

বর্ষিত হয়ে জগৎকে তৃপ্ত করে। তদ্রূপ মহাসত্তায় ডুবে পূর্ণস্থিতি লাভ করা অবধি সাধনার পূর্ণাহুতি হয় না।'

'চাই ভাবের গভীরতা। ডুব দিতে হবে যে। শুধু ভেসে বেড়ালে হবে কেন? ভেসে বেড়ালে শক্তির ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হয় না। বহুজন্মের সংস্কারগুলি বট-অশ্বত্থের শিকড়ের মতন দেহ-মনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের উৎপাটন করতে হলে ভিতরে বাইরে কঠোর কুঠারাঘাতের দরকার। রোজ রোজ যতক্ষণ পারো বহিরিন্দ্রগুলিকে অন্তর্মুখীন করে তাতে একটু লেগে থাকবার চেষ্টা করো দেখি।'

সাধনার গূঢ়তত্ত্ব সরল করে শ্রীশ্রীমা বলছেন ভক্তদের।

আবার বলছেন:

'মানুষের জগতের দিকেই বিপথ বিপদ। সেই বিপদ হতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় নিজেতে নিজে প্রকাশ হওয়া।'

'তোমার মধ্যে যে মহাজন নিত্যস্থিত। মহাজন কোনো লোক নন। বাইরের কেউ নন। যিনি তিনিই। ভিতরের মহাজন যাঁকে মহাজন বলে মানে তাঁর পথ অনুসরণ করো। মহাজন যে স্বয়ং প্রকাশ। তিনি কে বলে দিতে হয় না। তোমার ভিতরে যে মহাজন আছেন তাঁর প্রকাশ তুমি পাও কি? তবে প্রশ্ন কেন? যেটা প্রত্যক্ষ সেটা বল। তোমার ভিতরে যে মহাজন রয়েছেন তাঁর প্রকাশ হওয়া দরকার। আমি যন্ত্র, তিনি চালাচ্ছেন তা যদি বল তবে ঠিক। মহাজনের উপলব্ধি হলে প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তাঁকে ধরতে না পারলে বাইরের মহাজন দরকার। মুনিদের মধ্যে যিনি মহান্ মুনি, যিনি মহাপুরুষ বা অবতার ইত্যাদি তিনি যা বলেন যে পথে যান, সেই পথ। গুরু ধারণ কেন করতে হয় জান? গুরু যে অন্তর্যামীরূপে রয়েছেন, তাঁকে ধরবার জন্য বাইরের গুরু বরণ দরকার। তেমনই তোমার মহাজন ধারণ। যদি বল তাঁকে চেনা যায় কি করে? যখন সময় হয় তখন ধরা দেন। ব্যাকুলতা থাকলে তিনি চিনিয়ে দেন বুঝিয়ে ধরা দেন। অবশেষে কি হলো? তোমাকেই তুমি পাচ্ছ? তোমার ভিতরকার মহাজনের যখন প্রকাশ হয়। তখন বোঝা যায় যে 'আমার মহাজন এইরূপে প্রকাশিত।' তিনি স্বয়ং ধরা না দিলে ধরা যায় না।

একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। নীরব ও নির্লিপ্ত ভাবে যারা পরমপুরুষের সাধনা করতে চায়, হিমালয় তাদের পক্ষে বড়ই অনুকূল স্থান। চারিদিকে প্রকৃতি গুরুগম্ভীর ও শান্তশীল। এঁর ক্রোড়ে বসে অনন্তের চিন্তা

বা আত্মবিচার স্বভাবতঃই সহজ। ভাবকে লক্ষ্য করে যার সাধনা সমুদ্রতীর তার উপযোগী। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাবের হিল্লোল এসে ভাবময়ের সীমাতীত ভাবে তাকে ডুবিয়ে স্থির লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেবে। যার মন মাত্র সাধন পথের পথিক হবার জন্য উন্মুখ হয়েছে, কোনো নিভৃত রমণীয় স্থান তার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণ গৃহকর্মীর পক্ষে ঈশ্বর চিন্তার জন্য অন্ততঃ ঘরের কোণায় একটি নির্দিষ্ট শুদ্ধ স্থান করা আবশ্যক। যে ভগবৎ প্রেমে সর্বত্যাগী যার চোখে ভগবান সর্বময়, তার স্থান সর্বত্রই সুলভ। মনকে নিয়মিত করে সকল অবস্থার উপরে উঠবার চেষ্টা করো, তাহলে স্থান অবস্থানের দ্বন্দ্ব যাবে ঘুচে।

তোমরা সব সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কাকে বলে জানো? সন্ন্যাসী বলে তাকে, যার সদা শূন্যে বাস। যে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে আর নিত্য অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছে মাত্র। তাঁর নামে যার সব শূন্যে গেছে ভেসে সেই সন্ন্যাসী। যতক্ষণ ঘর বাড়ী ট্যাকে পয়সা, শরীরে আরাম, মনে ভোগ বাসনা প্রতিষ্ঠা প্রশংসা ইত্যাদির জন্য আগ্রহ থাকবে ততক্ষণ গৃহে থাকাই নিতান্ত উচিত। এ পথের পথিক একেই তো কম। যারা সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়, তারা যদি সকল রকমে নিঃস্বার্থপর হয়ে না চলে অথবা বিহিত আচারে আচারবান না হয়, তাহলে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সন্ন্যাসীর ভাব নিয়ে গৃহী হওয়া যতদূর প্রশংসার বিষয় সন্ন্যাসী না হয়ে সন্ন্যাসীর ভেক্ নিয়ে বের হওয়া তার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধের কথা। এতে শুধু যে নিজের ক্ষতি হয় এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের পবিত্র আদর্শকেও খাটো করা হয়।'

তাইতো এ শরীরটা বলে :

'ঝাঁপিয়ে পর। নিরাশ্রয়ের মতন। তোর আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না। মনে রাখিস্, অঘা না হলে ভগাকে পাওয়া যায় না।'

'ডাকার মতন ডাকলে, ডাক মাত্র একটি! সেই ডাকটির জন্যই নানাজাতির ভিতর রয়েছে নানা ব্যবস্থা। যেদিন কারো সে ডাকটি আসে সেদিন আর তার ডাকাডাকি থাকে না।

যে রকম নিশির নিস্তব্ধতায় দেব-মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্টরূপে শোনা যায়, সেই রকম তাঁর প্রতি অনন্যভাব ভক্তির দ্বারা বিষয় বিক্ষুব্ধতা শান্ত হলে সে ডাকের প্রতিধ্বনি এসে পূর্ণরূপে প্রাণে বাজে। তখনই বের হয় খাঁটি ডাক।'

—কবে আসবে সেই শুভলগ্ন? সেই শুভমুহূর্তটি?

আনন্দময়ী মা বলছেন:

'মন তৈরী হলে। মনটাকে তৈরী করবার ব্যবস্থা করো। দেখবে ডাকবার ভাবটি প্রাণে আসবেই আসবে। কেবল তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তদনুযায়ী কর্ম ও অভ্যাস চাই। একলক্ষ্যে কর্ম করতে করতে কর্মসিদ্ধির কৌশল আপনা হতেই জানা হয়ে যায়।'

'সৎসঙ্গ শুদ্ধভাব সদালোচনা প্রভৃতির দ্বারা মনের অন্তর বাহির পুষ্ট করো, তাহলেই ধীরে ধীরে মন তাপশূন্য হয়ে পরমপদে বিশ্রাম লাভের উপযোগী হবে। যেরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের চেষ্টা অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আয়োজন করা হয়, সেইরকম শুভ কর্মাদিতে মনকে বিবেক ও বিচারের পরিখার ভিতর বিশেষ সাবধানে রাখতে হয়। যাতে ভোগতৃষ্ণারূপী বহিঃশত্রু একে হয়রাণ করতে না পারে। মনের শত্রু বা বন্ধু মনই। মনকে দিয়েই দূর করতে হবে মনের অজ্ঞানতা। তাইতো এ শরীরটা বলে, মনকে নির্মল করবার সহজ উপায় সাধুসঙ্গ ও অবিরাম ভগবৎ নাম কীর্তন।

মনকে দিতে হবে শুদ্ধ ভোজন। মনকে শুদ্ধ ভোজন দিলে নিজের যে স্বাভাবিক গতি আছে, নিজের যে যথার্থ স্বরূপ আছে অর্থাৎ আপনাতে যে আপনি তার প্রকাশ হবে। তুমি গতিতে চল অর্থাৎ স্বভাবে চল। অভাবেতে দুঃখ পাচ্ছ। দুনিয়াতে যা কিছু সামগ্রী দেখো, খাওয়া, পান করা, রূপ রস গন্ধ শব্দ ইত্যাদির পিছনে শান্তি পাওয়া যায় না। যদি মন—বাচ্চাকে শান্ত করতে চাও তো সৎসঙ্গ করো। স্বরূপ প্রকাশের জন্য মহাত্মারা উপদেশ দেন। তাঁকে নিয়েই চল। তা না হলে শান্তি হতে পারে না। সেই উপদেশ বাণীগুলিকে অনুশীলন করবার চেষ্টা করো। নিত্য নব নব ভগবৎ রস পাবে; তাঁর স্বভাব তিনি না দিয়ে থাকতে পারেন না। অনুভব রূপেও দর্শন হয়। খণ্ড দর্শনে ব্যাকুলতা বাড়ান। যেমন করবে তেমন পাবে। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ক্রিয়া করো। ভগবৎ প্রাপ্তিই যে মূল লক্ষ্য। যতটা করবে ততটা পাবে। নিরাবরণ দর্শন করার চেষ্টা কর। সাকার আকার নিরাকার, জল আর বরফের মতো একই।

মানুষ কেবল বাইরের সুযোগ সুবিধে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কেউ বোঝে

না যে বাইরের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে যতক্ষণ ভাবনা চিন্তা ততক্ষণ বাইরেই থাকা হয়। বাহির হলো দেহ ধন জন গৃহ ইত্যাদি আর ভিতর হলো আত্মচিন্তা। সকল চিন্তার ভিতর তাঁকে সম্মুখে রাখতে চেষ্টা করা। দেহের আরাম মনের আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতে চলতে শুধু বাইরের ভাবগুলিই পুষ্টিলাভ করে। ভিতরটায় ধরে মরিচা। এই জন্য চিত্তের মলিনতা পরিষ্কার করতে করতেই জন্ম-জন্মান্তর চলে যায়। যতদিন বাহির সরাতে না পারো ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিকেও লক্ষ্য রাখো। আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করো। নিত্যানন্দের ধ্যান করো। শুভমুহূর্ত উদয় হলে দেখবে, সকল ধ্যান একমুখী হয়ে বাহির ভিতর দিয়েছে এক করে।'

'শুভ সৎ আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির দিক্। সৎ শুভ বুদ্ধি এবং সৎ ক্রিয়ায় নিত্য ব্রতী রাখা, ধৈর্যের আশ্রয়।'

আবার শ্রীশ্রীমা প্রাণবন্ত ভাষায় সহজ করে বলছেন :

'অরুণোদয়ে বৈরাগী এসে ঘরে ঘরে হরিনাম করে গেল, শুনলো হাজার লোক, কিন্তু মনে রইলো ক'জনার ?'

—এর কারণ কি ?

'কান তো সকলেরই আছে ; তবে আপাত মনোরম সংসারের সুরগুলি অধিকাংশ লোকের এমন ভাল লেগে গেছে যে, ধর্মের সুর সহজে তাদের কানে বাজে না।

এর একমাত্র প্রতিবিধান এই যে রোজই 'হরি' বা যে কোনো ঈশ্বর-বাচক নাম জপ করতে হবে। দশটি হোক আর দশ হাজার হোক। তা না হলে প্রত্যহ কিছুকাল উপাসনা বা আত্মবিচার সাধুসঙ্গ, সদালাপ প্রভৃতিতে কাটাতে হবে। এরূপে ক্রমে ক্রমে দেহ যন্ত্রটি ধর্মসঙ্গীত গ্রহণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হবে। প্রত্যহ মনোযোগ না দিলে যেমন কোনো বিদ্যাই অর্জন হয় না, আত্মতত্ত্বও তদ্রূপ সাধনার বিষয়, এই ধারণা রাখা আবশ্যক। ঘড়িতে দম দেওয়ার মতন মনের কলে ভগবদ্ ভাবের চাবিটি অন্ততঃ দিনে একবার ঘুরিয়ে নিলেও চিত্তশুদ্ধির অনেক সহায়তা হয়।'

মা আবার বলছেন :

'শূন্য হলে সাদা হওয়া যায়। কিংবা সকলের ভিতর হারিয়ে গেলেও সাদা হওয়া যায়। সাদা সকল রূপ নিয়ে অরূপ হয়ে আছে। অরূপের রূপই যে সাদা।

সাদা হতে হলে সিধা থাকতে হয়। সত্য ও সরলতার আশ্রয়ে বাইরে ভেতরে দুধের মতন সাদা হওয়ার চেষ্টা করো। তাহলে নিজে তো সুখে থাকবেই অন্যেরাও তোমার কাছে এসে সুখ পাবে। ত্যাগী হওয়াই সাদা বা সরল হওয়ার লক্ষণ। আত্মাভিমান শূন্য হয়ে জগতের ভিতর ছড়িয়ে পড়। দেখবে তোমার শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্য সকলে ব্যস্ত হবে এবং তোমার আদর্শ কর্মে ও ধর্মে সর্বত্র মঙ্গল বিধান করবে। এই ভোগ বিলাসের দিনে ত্যাগপূত সরলতাই মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ ত্যাগের নামই পূর্ণ ভোগ।'

—ধন দৌলত কিসের জন্য ?

'নিজের জীবন ধারণ ও পুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য। পুত্র পরিবার কার জন্য ? সরলভাবে জবাব দিলে বলতে হবে আমার জন্য। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয়—এই আমি কে ? তাহলে তার জবাব নেই। এই তো হলো বুদ্ধির দৌড়। আমি কে ? একবার বেশ ভাল করে চিন্তা করে দেখো দেখি, তখন দেখবে যে সব পুঁথিপত্র স্কুল কলেজে বসে এতদিন যা চর্বিতচর্বণ করেছো আর কর্মক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছো তার ভিতর এই প্রশ্নের জবাব নেই। আমি ও আমার সন্ধান পেতে হলে আধুনিক চিন্তার ধারা বদলে সেই এক তত্ত্বের সাধনায় মনোযোগ দিতে হবে। যখন চিত্ত চঞ্চল হবে দৃঢ়তার সঙ্গে সরিয়ে এনে তাকে 'আমির' মূলে আকৃষ্ট রাখতে হবে। ইহাই হলো আত্মদর্শন।'

'তাইতো এ শরীরটা বলে, উর্ধ্বে চাইবার অভ্যাস করো। দৃষ্টি সর্বদা উর্ধ্বে না থাকলেও অন্ততঃ সমান সমানেও স্থির থাকতে তো পারে। উর্ধ্বে উঠবার সাহস বা যোগের নামই উৎসাহ। দেহ চলছে কিন্তু মন চলছে না, আবার মন চলছে কিন্তু দেহ নড়ছে না এরকম অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। তখন জোর করে ক্রিয়াশীল হতে হবে। নতুবা পতন অনিবার্য। সকল কাজে সাহস চাই। সাহসই তো শক্তি।

যেখানে আনন্দ, উৎসাহ উদ্যম সেইখানেই মহাশক্তি বর্তমান। মানুষের শুভ চেষ্টার অন্তঃস্থলে ঈশ্বরকে দর্শন করতে শেখ। তাহলে স্থূল কর্মতত্ত্বের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে অগ্রসর হয়ে পরমানন্দ লাভ করতে পারবে।'

'মূলে সবই এক। এক হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। হিমালয় যে দেখেনি সে নাম শুনে মনে করবে হিমালয় মাত্র একটি পর্বত। কিন্তু হিমালয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কত শত শত পাহাড় লক্ষ লক্ষ গাছ পালা, সহস্র সহস্র জীবজন্তু, স্রোত-প্রস্রবনাদি নিয়ে কত যোজন ব্যেপে এই গিরিরাজ হিমালয় দাঁড়িয়ে আছেন। সেইরকম সাধনার রাজ্যে যে যত নিকটে আসবে, যে যত ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে, সেই দেখবে একই বহুরূপে রয়েছেন অথবা বহুই এক। আমরা সর্বদা এক নিয়েই চলি অথচ ভুলে থাকি বহুতে। এক পা করে হাঁটতে হাঁটতে শেখা হয় হাঁটা। এক এক গ্রাস খেতে খেতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। এক একটি দিন গণনা করে মাস এবং এক একটি মাস পরিণত হয় বৎসরে।

প্রকৃতপক্ষে জগতে এক ভিন্ন আর কিছুই নেই। রূপ রস গন্ধাদি নিয়ে জগৎ। এরা প্রত্যেকে যদিও বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির মহিমা প্রকাশ করছে, কিন্তু এক হয়েই এদের আবির্ভাব! আবার একেই লয়। এবং একের পূর্ণতার জন্যই সকলের সার্থকতা। এক লক্ষ্যের দ্বারা এক রূপ এক রস এক গন্ধ এক স্পর্শ অথবা একটি শব্দে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করো। তখন দেখবে এই একের মধ্যে সবগুলিই সম্মিলিত রয়েছে। এর পরেই উপলব্ধি হবে একই সব। সবই এক। এবং সেই এক ব্যতিরেকে আর কোনো অস্তিত্বই নেই।'

বললেন, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ভক্তদের।

শ্রীশ্রীমা বলছেন:

'জ্ঞানমার্গের 'আমি,' ভক্তিমার্গে 'তুমি' এবং যোগ বা কর্মমার্গের আমি ও তুমি এই তিনের মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। যারা পুরুষকারের সঙ্গে তাঁকে সকল কর্মের ও ভাবের অগ্রদূত করে, আমি ও তুমির সমন্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তারা সকলেই এক মহাসমুদ্রেই ডুবে যাবে। ভেসে থাকা পর্যন্তই সাম্প্রদায়িক ও লৌকিক ভেদাভেদ।'

'যে কোনো উপায়ে ডুব দিতে পারলেই দেখা যায় পরমতত্ত্ব মাত্র এক। সত্য ভাবও এক।'

'কন্যাকুমারীর সমুদ্র-কূলে দাঁড়ালে দেখা যায় যে ঢেউয়ের উপর-ঢেউ উঠছে

ভাঙছে এবং ভেঙ্গে কোন অনন্তে সে মিশে যাচ্ছে তার নিরাকরণ নেই। এই জগৎটিও মহাসমুদ্র বিশেষ। কত বস্তুর পলে পলে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। এবং বিনাশ হয়ে কোথায় যে যাচ্ছে তা মানব বুদ্ধির অগম্য। প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ বুঝিয়ে দেয় যে, জন্ম মৃত্যু বলে কিছু নেই। পরমপুরুষই নানাভাবে নানারূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র। প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখ, তার নিরপেক্ষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করো, তাহলে যিনি সকল কারণের বিধাতা তাঁর চিন্তা আপনা থেকে জাগ্রত হয়ে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই প্রমাণ করে দেবে। মানুষ মাকড়সার মতন জালের উপর জাল তৈরী করে অনন্তকালের জন্য আপনাকে ঐ জালে জড়িত রাখতে চায়। ভোগ মোহাদির ভ্রমে পড়ে একবার ভেবে দেখে না যে বার বার জন্ম মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাত কি যন্ত্রণাদায়ক! বর্তমান জীবনেই কর্ম বন্ধন শেষ করতে হবে, এই অটুট সঙ্কল্প নিয়ে সেনাপতির মতন আপনার শক্তিবলে মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করো, অথবা অবরুদ্ধ সৈন্যদলের মতন বিশ্বপিতার নামে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকো, তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন।'

'ভগবানের নাম সর্বদা স্মরণ করতে করতে এই সংসার কারাগারের দিন কেটে যাবে। অন্তরে যদি ভালবাসা থাকে, ভক্তি থাকে তাহলে আর ভয় নেই। যুদ্ধ নয়। সংগ্রাম নয়। আত্মসমর্পণ। ভগবৎ ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ। সকলই যে তাঁর ইচ্ছা। ভগবৎ ইচ্ছায় অবিচারে আত্মসমর্পণ করাই শুদ্ধ প্রেমিকের ধর্ম। এরূপে এমন সময় আসবে, যেদিন তোমার ইচ্ছা বলে আর কিছুই থাকবে না। সকলেই কেবল এক শক্তিময়ের খেলা বলে বাইরে ভিতরে অনুভূতি হবে। বস্তুতঃ এই বিচিত্র জগতটির কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না, যদি না বুঝতে পারো যে আমরা সকলেই তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে অভেদরূপে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হচ্ছি পলে পলে।'

আনন্দময়ী মা'র ভাষায়ঃ

'ত্রাণ পেতে হলে 'ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী' বলে প্রাণে কেঁদে কেঁদে মাকে ডাক্‌তে হবে। সংসারের জন্য যতটুকু কাঁদিস্ তার চেয়ে যে ঢের বেশী কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে যখন বাহির ও অন্তর এক হয়ে যাবে তখন দেখ্‌বি, যাঁকে একদিন এমন করে খুঁজেছিস তিনি সকলের প্রাণরূপে অতি নিকটেই বিরাজিত রয়েছেন।'

তাইতো বলা হয় ঃ

'যাঁর ইঙ্গিতে জগত চলছে, তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করা, বিষয় ভোগের তৃষ্ণা আপনা হতেই ছেড়ে যাবে।'

মাতৃরূপিণী মহামায়া সৃষ্টির আদি। তাঁর যখন লীলা করবার ইচ্ছা জাগল তখন তিনি নিজেকে দ্বিধা ভাগ করে মা ও মায়ারূপে জগৎ নাট্যশালাতে প্রকাশিত হলেন আর বহুরূপে মায়ার ভিতর লুকিয়ে গেলেন। কালের কুঠারাঘাতে যখন কোনো জীবের চৈতন্য উদয় হলো, মায়াই যে 'মা' এই বুদ্ধিতে সে মায়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলো। সে মায়ের কৃপায় সাধনার জোরে তাঁর আদিরূপ মহামায়ার সন্ধান লাভ করে কৃতার্থ হলো। এইখানেই শেষ নয়। মহামায়ার বিরাটত্ব দেখে সে আত্মহারা হয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গেল মিশে।

আনন্দময়ী মা বলেন ঃ

'সংসারে যার নাম মোহ বা মায়া, অধ্যাত্মপথে তাঁরই নাম মহামায়া। দুইয়ের ক্রিয়া প্রকাশতঃ বিভিন্ন হলেও, উভয়ে মূলতঃ এক। সংসারের পথে খেলা করো মহানন্দ পাবে। ছাড়িয়ে দিলেও ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। আর ধর্মপথে সেও দেখবে মহানন্দের হাট। তবে প্রথমটি ক্ষণস্থায়ী আর দ্বিতীয়টি নিত্য। উভয়েরই সার্থকতা রয়েছে কেন না যিনি সকল খেলার খেলোয়াড় তিনি যখন যার যা আবশ্যক তাকে তাই দিয়ে তৈরী করে নেন এবং ক্রমে ক্রমে শেষ লক্ষ্যে টেনে নিয়ে মোহ-মায়া ও মহামায়ার দ্বন্দ্ব দেন ঘুচিয়ে।

যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বদাই রয়েছেন তবুও ভাবে ও কর্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার। কেন না জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারগুলি এমনভাবে মানুষকে বদ্ধ করে রেখেছে যে তাঁর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। আগুনের তাপে যেমন ভিজে কাঠও শুকিয়ে আগুনের স্বরূপ ধারণ করে আগুনের ইন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভগবৎ স্মৃতির তীব্রতায় বিষয়-বৃত্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকলে হৃদয়ে ক্রমশ চিদানন্দের আভাস দেখা দেয়। কথাটা হচ্ছে এই ধনজন প্রতিষ্ঠার

উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিও অন্ততঃ একটু রাখতে চেষ্টা করো। সংসারটাকে ভেঙে আমি কাউকে বনে জঙ্গলে যেতে বলি নে। তোমরা সকলে ধর্মের সংসার করো এই আমি চাই তোমাদের কাছে। অর্থবিত্তশূন্য কোষাগারের যেরূপ কোনো মাহাত্ম্য নেই, তদ্রূপ ধর্মহীন মনুষ্য জীবনের কোনও মূল্য নেই।'

'যা হবার তা হবে—সম্পূর্ণ সত্য কথা! নিজের জীবন ও পরের জীবনের ইতিহাস উল্টিয়ে দেখলে দেখতে পাবে যে মানুষ নিজেই বা কতটুকু করতে পারে এবং অলক্ষ্য শক্তির অদৃশ্য বিধানেও বা কতখানি সংঘটিত হয়! জগৎটা সেই পরম পিতার ইচ্ছায় সুচারুরূপে নিয়মিত এবং 'তিনি যে অবস্থায় আমাকে রাখবেন বা আনবেন তাই আমি বরণ করবো', এ সিদ্ধান্তে যতই পারবে স্থির হতে, ততই দৃঢ় হবে নির্ভরের ভাব। এবং ঐশী শক্তি প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে উন্মীলিত হবে প্রেমচক্ষু।'

ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন:

'তাইতো বলা হয় সময় থাকতে থাকতে ভিতরের আলো জ্বালবার চেষ্টা করা। মনের চুল্লীতে আত্মবিচার বা নামের আগুন ধরিয়ে দেওয়া। সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা উপাসনাদির বাতাস দিয়ে সে আগুন সতেজ রাখো। ক্রমশ এর জ্যোতি স্থির হয়ে যাবে। তখন সে আলোতে ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে আত্মদর্শনে পথ সুগম করে তুলবেই।

একতারায় ওঠে একসুর আর হারমোনিয়ম গায় সপ্তসুর। হারমোনিয়ম যখন বাজে সাধারণ শ্রোতারা আনন্দ লাভ করে বটে কিন্তু ভাবুকের কানে একঘেয়ে 'একতারাই' মধুর শোনায়, কেননা একসুর ভেঙেই তো সাতসুর। দেহখানা 'একতারা' করতে চেষ্টা কর্! মনটিকে তার করে দিবারাত্রি কেবল বাজাতে থাক—'জয় জগদীশ হরে'। এই রকম করতে করতে এই এক গান ছাড়া তোদের আর কিছুই লাগবে না ভাল"।

আসলে নিজেকে জয় করতে না পারলে, জগৎ জয় করলেও মুক্তির পথ দুর্লভ। সূর্য চন্দ্র বা বাইরের আলো দিয়ে আর ক'দিন চালাতে পারবে? ভিতরের আলো জ্বালানো দরকার। অন্তর আলোকিত না হলে ঈশ্বরকে দেখবে কেমন করে?

অন্তরে ঈশ্বরানুরাগটি না থাকলে মনুষ্য জন্মই যে ব্যর্থ। নিজে সুন্দর হয়ে সুন্দর হৃদয় আননে চিরসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সবই সুন্দর দেখতে

পাবে। ভগবান যে প্রেমময়। প্রেমের ঠাকুর। চিত্তের অন্ধকার দূর হলে পরম সুন্দরের মোহনরূপ আপনা হতেই উঠবে ফুটে। চিত্তে বিরাজিত হবে পূর্ণ শান্তি। অপ্রমত্ত শান্তি। অখণ্ড শান্তি।'